ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ

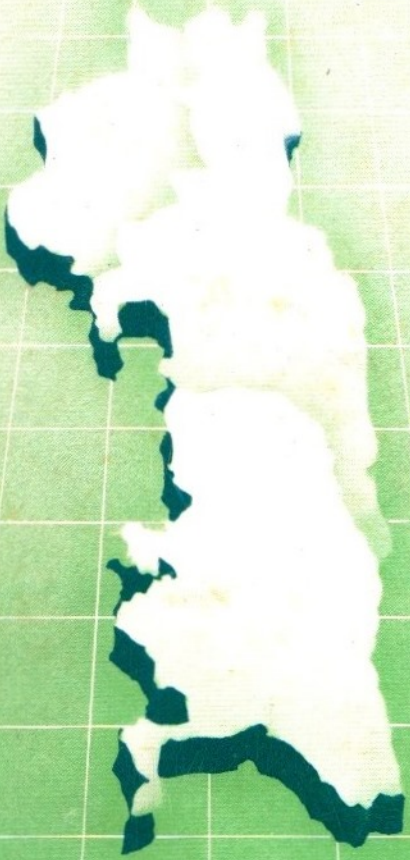

জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে
পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ

রচনা ঃ
জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা
সদস্য
স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটিঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ পারিজাত কুসুম চাকমা
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

আহ্‌বায়ক ঃ জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা
সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সদস্য ঃ এ. এস. এম. শহীদুল্লাহ
সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সদস্য ঃ এ, কে, এম হারীজ
সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সদস্য ঃ চিংকিউ রোয়াজা
সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সদস্য ঃ রুবায়েত আক্তার আহমেদ
সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

www.pathagar.com

প্রকাশনায়ঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ
অরুনেন্দু ত্রিপুরা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশকালঃ
প্রথম সংস্করণঃ ২রা জুলাই, ১৯৯১ইং
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণঃ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
বিন্যাস
৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি।

মূল্যঃ
একশত দশ টাকা মাত্র
(চার মার্কিন ডলার)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে দু'টি কথা

পার্বত্য জেলা সমূহে প্রথমবারের মত প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার উপর রচিত এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরই বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, কূটনৈতিক মিশন এবং স্থানীয় প্রশাসন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে বইটির সংখ্যা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহল, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক মিশন এবং বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বইটি সরবরাহের জন্য পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে উপর্যুপরি অনুরোধ আসতে থাকে। কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও অনেকের কাছেই বইটির প্রয়োজনীয় কপি সরবরাহ সম্ভব হয়নি।

মূলতঃ সৌজন্য কপি হিসাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে বইটির প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছিল। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং পুনঃপ্রকাশের অনুরোধ থাকায় বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয়ভাবে এবং দেশের অন্যত্র, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী মহলে বইটির চাহিদার ব্যাপকতা লক্ষ্য করে পরিষদ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশনার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হয়েছিল। ফলে, বইটির প্রথম সংস্করণে কিছু তথ্যগত ত্রুটি এবং ভাষাগত দুর্বলতা ও জটিলতা থেকে যায়। এছাড়া, পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি ও জনজীবনে সেসব কার্যক্রমের প্রভাব, কাপ্তাই বাঁধ এবং পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে এর প্রভাব এবং সর্বশেষ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' সৃষ্টি ও এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আলোচনা বইটির প্রথম সংস্করণে স্থান পায়নি। বর্তমান সংস্করণে উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করে বইটির অসম্পূর্ণতা এবং তথ্যগত ত্রুটি ও ভাষাগত দুর্বলতা এবং জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। তথাপি অসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য ত্রুটি শতকরা একশ ভাগ দূর করা সম্ভব হয়েছে–তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না।

www.pathagar.com

কতিপয় নূতন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সংস্করণে বইটির কলেবর তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বইটির কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গুনগতমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। আলোচিত বিষয়গুলি ঘটনার কালানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। বইটিতে কিছু পরিবর্তন এবং তথ্যগত সংশোধন ও কলেবর পরিবর্ধন সত্বেও এর মূল বক্তব্য এবং পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে পরিষদের মূল অবস্থানের কোন পরিবর্তন এতে হয়নি। কলেবর বৃদ্ধি এবং আনুসঙ্গিক পরিবর্তনের কারণে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও বইটিতে তথ্যগত ভুল, মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন প্রায় ঠিক তখনই অত্রাঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে বিগত ২০শে মে' ৯২ তারিখে রাঙ্গামাটিতে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনার প্রতিবাদে অত্র পরিষদের নির্বাচিত প্রথম চেয়ারম্যান জনাব গৌতম দেওয়ান তাৎক্ষনিকভাবে পদত্যাগ করেন। জনাব গৌতম দেওয়ান তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় পরিষদের কার্যক্রমে সাময়িকভাবে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। জনাব গৌতম দেওয়ান নিজে পদত্যাগ করেও পার্বত্য অঞ্চলের স্বশাসন ব্যবস্থার মাইলফলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সচল রাখার ও একে সযত্নে লালন করার জন্য সৎপরামর্শ দিয়ে এই পরিষদের সকল সদস্যকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রানিত করেছেন। পার্বত্য অঞ্চলের এই স্বশাসন ব্যবস্থাকে লালন করার কাজে জনাব গৌতম দেওয়ানের পরামর্শে অনুপ্রানিত হয়ে এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ও পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অনুরোধে আমি বিগত ১৭ই জুন' ৯২ইং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমরা এই পরিষদে জনাব গৌতম দেওয়ানের তিন বছরের কার্যকালের ভূমিকা এবং অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। এই পরিষদে তাঁর অবদান আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা এবং এই অঞ্চলের প্রশাসনে পরিষদগুলির ভূমিকা ও অবদান জনগণের বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে "তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা"-নামে বইটি প্রকাশ করা হয়েছিল। বর্তমান সম্পাদনা পরিষদ বইটির নাম আংশিক সংশোধন করে "ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য

www.pathagar.com

স্থানীয় সরকার পরিষদ" নামে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নূতন কিছু বিষয় সংযোজন ছাড়া বইটির প্রথম সংস্করণের মূল বিষয়বস্তুর তেমন কোন পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। আশাকরি, নামের এই আংশিক পরিবর্তনের ফলে বইটি সম্বন্ধে পাঠকবর্গের মনে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না।

আশার কথা, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পার্বত্যাঞ্চলে বিরাজমান দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য, সম্মানজনক ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রচেষ্টা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে মনে করি। পার্বত্যাঞ্চলে বিরাজিত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের এ প্রয়াস কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করি।

পারিজাত কুসুম চাকমা
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন তথা স্বশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত বিরাজমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের ন্যায় একটি ছোট অথচ জনবহুল দেশে এ ধরনের স্বশাসন ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। বলাবাহুল্য, পার্বত্য অঞ্চলে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ বাংলাদেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকারগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক শক্তিশালী। এই পরিষদগুলি নিজস্ব গন্ডিতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান স্থানীয় সরকারগুলি জেলা পর্য্যায়ের মূল প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় এক একটা স্তর মাত্র। এগুলি সরকারের একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন বিশেষ কার্যাদি কল্যাণ বিভাগ দ্বারা সরাসরি রাষ্ট্রপতি কতৃক নিয়ন্ত্রিত।

স্থানীয় সরকার পরিষদ নামের স্বশাসিত পরিষদগুলি বাংলাদেশের প্রশাসন পদ্ধতিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তাই এই ব্যবস্থার কার্যকারীতা এবং সাফল্যের ব্যাপারে অত্র অঞ্চলের এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের মনে সন্দেহ ও সংশয় থাকা স্বাভাবিক। পার্বত্য অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি উপজাতীয় জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে এই অঞ্চলের একটি বিশেষ মহল থেকে জোর মত প্রকাশ করা হয়েছিল। এই মহল মনে করে যে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানতো নয়ই এমনকি এই অঞ্চলের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে এই পরিষদগুলি কোন ভূমিকাই রাখতে পারবে না।

বিরুদ্ধবাদীদের সকল বিরূপ মন্তব্য এবং ভবিষ্যৎবানীকে উপেক্ষা করে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ তাদের অস্তিত্বের তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে। বিগত দু' বছরে চেঙ্গী এবং কর্ণফুলী নদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে। স্বদেশে-বিদেশে এই পরিষদগুলির বিরুদ্ধে আজও বিশেষ মহল থেকে প্রচার অব্যাহত রাখা হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই এই পরিষদগুলি সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশের জনগণ নিজেরাই পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীনতা উত্তরকালের

www.pathagar.com

ঘটনাপ্রবাহ এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা এবং পরিস্থিতি কূটনৈতিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরা হলেও বাংলাদেশের জনগনের কাছে তা তুলে ধরার কোন চেষ্টাই বাংলাদেশের অতীতের সরকারগুলি করেননি। পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই অঞ্চলের সঠিক অবস্থা বাংলাদেশের জনগণের কাছে তুলে ধরার দায়িত্বও এই পরিষদগুলি উপর বর্তেছে।

বিগত ছয়মাসে দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক বিজয়ের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তণ ঘটেছে। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গনতান্ত্রিক সরকার। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা, পেক্ষাপট এবং বর্তমান অবস্থা বাংলাদেশের জনগণের বিশেষতঃ জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই পুস্তিকা প্রকাশনার আয়োজন। এই পুস্তিকা পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান সমস্যা, এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি, সমাধানের পথে বর্তমান পর্যায় এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরার লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। সময়ের স্বল্পতা, দেশে এবং অত্র অঞ্চলে বিরাজমান পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক তথ্য এবং ঘটনাবলী এই পুস্তিকায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অনেকেই এই পুস্তিকার কিছু কিছু বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করবেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণই সচেতন। তবুও এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত তথ্যাদি এবং ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক বিন্যাস পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা এবং তা সমাধানের বর্তমান প্রয়াসকে মূল্যায়নে বাংলাদেশের জনগণকে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিচারের ভার জনগণের।

গৌতম দেওয়ান
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ	পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমিঃ জেলা সৃষ্টি–জেলা থেকে মহকুমা, সার্কেল এবং মৌজা–স্বাধীন পাকিস্তানে এর প্রশাসনিক মর্যাদা, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম সাধারণ নির্বাচন, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনা, পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব।	১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কৃষিঃ জুমচাষ–নদী অববাহিকা ও নিম্নভূমির কৃষি।	১৩
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	কাপ্তাই বাঁধ ও কাপ্তাই কৃত্রিম জলাশয়ঃ বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা–পুনর্বাসন প্রকল্প–অতিরিক্ত পুনর্বাসন প্রকল্প–পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক জীবন ও অর্থনীতিতে কাপ্তাই বাঁধের প্রভাব।	১৭
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	মাটি ও ভূমি ব্যবহার জরিপঃ	৩৮
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পঃ মহা পরিকল্পনা–প্রকল্পের উদ্দেশ্য–ফসল উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রকারভেদ–বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ–অর্জিত ফলাফল।	৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামঃ উপজাতীয় প্রধান ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা–উপজাতীয় রাজাকার, সিভিল আর্মড ফোর্স ও মুজাহিদ বাহিনীর ভূমিকা–মংরাজা ও চাকমা রাজ পরিবারের সদস্যের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ –বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের উপজাতি বিরোধী ভূমিকায় উপজাতীয়দের মনে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি।	৪৫
সপ্তম অধ্যায়ঃ	জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও জনসংহতি সমিতির উত্থানঃ শান্তিবাহিনী–জুমিয়া থেকে জুম্ম–উপজাতীয়দের চার দফা দাবীনামা–জনসংহতি সমিতির জন্ম–উপজাতীয়দের দাবী জনসংহতি সমিতির দাবীতে পরিণত–১৯৭৩ সালের	৪৮

www.pathagar.com

সাধারণ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সাফল্য–মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার বাকশালে যোগদান।

অষ্টম অধ্যায়ঃ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগঃ ৫৫
আওয়ামী লীগ আমল– প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমল– প্রেসিডেন্ট সাত্তারের আমল–
পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিতকরণ–সমাধানের লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন–ট্রাইবেল কনভেনশনের জন্ম–জনসংহতি সমিতি ও ট্রাইবেল কনভেনশন নেতাদের বৈঠক–কনভেনশন নেতাদের প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ–স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ–কনভেনশন নেতাদের সাথে সরকারের মত বিরোধ–সমস্যা সমাধানকল্পে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসন–প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে উপজাতীয় নেতাদের স্বায়ত্বশাসন দাবী–সন্তু লার্মার মুক্তি–পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিন জেলায় বিভক্তিকরণ।

নবম অধ্যায়ঃ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেনারেল এরশাদের উদ্যোগঃ ৬৬
খাগড়াছড়িতে উপজাতীয় নেতাদের সাথে বৈঠক, জনসংহতি সমিতির নেতাদের সাথে উপজাতীয় নেতাদের বৈঠকের উদ্যোগ গ্রহণ–বৈঠক–জনসংহতি সমিতির মধ্যে মতবিরোধ ও পার্টির দ্বিধাবিভক্তি–একটি অংশের অস্ত্র সংবরণ।

দশম অধ্যায়ঃ জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার সরকারী উদ্যোগঃ ৬৯
ট্রাইবেল কনভেনশনের পুনরুজ্জীবন–শান্তিবাহিনী কর্তৃক বিদেশী নাগরিক অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়–মুক্তিদান–যোগাযোগ উপ–কমিটিকে পূর্ণাংগ কমিটিতে রূপান্তর–যোগাযোগ কমিটি কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন–সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈঠকের প্রস্তুতি–প্রথম দফা বৈঠক।

একাদশ অধ্যায়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী)ঃ প্রেক্ষাপট, ৭৩
পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কৌশল সন্ধানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক জরিপ দল ও

www.pathagar.com

পরামর্শক দল নিয়োগ। পরামর্শক দলের সুপারিশ সমূহ-সুপারিশ সমূহের বিবরণ-অষ্ট্রেলীয় সরকারের সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমঃ ১০৯
রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র মূল অধ্যাদেশ-পরামর্শক কমিটি-যৌথ খামার প্রকল্প-ঋণদান প্রকল্প-বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী)-পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ পুনর্বাসিত বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাতঃ ১৪৩
সাম্প্রদায়িক সহিংসতা পুনর্বাসিত বাঙালী এবং উপজাতীয়দের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ-পুনর্বাসিত বাঙালীদের উপর শান্তিবাহিনীর হামলা-বাঙালীদের পাল্টা হামলা-উপজাতীয়দের দেশ ত্যাগ ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ-উপজাতীয় শরণার্থী সমস্যা।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপজাতীয় নেতাদের উদ্যোগঃ ১৫১
উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ-মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের কয়েক দফা রাংগামাটি সফর-জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যোগাযোগ কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ-জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ কমিটির বৈঠক-পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে ঘোষণা প্রদান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন-উপজাতীয় নেতাদের সাথে জাতীয় কমিটির একাধিক বৈঠক।

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সংলাপঃ ১৫৬
দ্বিতীয় বৈঠক-তৃতীয় বৈঠক-চতুর্থ বৈঠক-ভবিষ্যৎ বৈঠকের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি-সরকার ও জনসংহতি সমিতির সংলাপের অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটির বৈঠক-সরকার ও জনসংহতি

www.pathagar.com

সমিতির মধ্যে পঞ্চম বৈঠক ও অচলাবস্থার সৃষ্টি–উপজাতীয় নেতাদের ভারতে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ঃ উপজাতীয় নেতাদের সাথে জাতীয় কমিটির সংলাপঃ আলোচনার প্রেক্ষাপট–প্রস্তুতিমূলক বৈঠক–আনুষ্ঠানিক বৈঠক–বাঙালী পুনর্বাসন ও প্রত্যাহার প্রশ্ন–দ্বিতীয় বৈঠক–আঞ্চলিক পরিষদ গঠন প্রশ্ন–তৃতীয় বৈঠক–তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে সরকারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর–তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত–সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৭ম বৈঠক বর্জন–তিন পার্বত্য জেলার আলোচকদল ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের যৌথ বৈঠক–পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘোষণা–স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে উত্থাপন ও অনুমোদন–স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন ও পরিষদ গঠন। ১৬২

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগঃ আইনের বিভিন্ন দিক, ত্রুটিসমূহ–কতিপয় কর্তৃপক্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা–উপজাতীয় পুনর্বাসন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক তৎপরতা–স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিরোধীতা–বিরোধী পক্ষের পরিচয়–বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থান ও সাধারণ নির্বাচনকালে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি। ১৭৭

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবী এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনাঃ ১৯০

উপসংহার ১৯৪

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ৯ই জুন, ১৯৯১ইং তারিখের পরবর্তী অবস্থা ১৯৭

পরিশিষ্ট–ক = সংলাপ কমিটি ২২০

পরিশিষ্ট–খ = তথ্য নির্দেশ ২২২

পরিশিষ্ট–গ = জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি জেলা সংলাপ কমিটির মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক। ২২৬

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট–ঘ = পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যগণের তালিকা। ২৩২

পরিশিষ্ট–ঙ = মংরাজা মংপ্রু সাইনের নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপজাতীয় প্রতিনিধিদল ১৫/২/৭২ ইং তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের কাছে পেশ করার জন্য প্রণীত এবং পরে তার জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে দাখিলকৃত চার দফা দাবীনামা। ২৩৫

পরিশিষ্ট–চ = পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নিকট সরকার প্রদত্ত প্রস্তাবের রূপরেখা। ২৩৬

পরিশিষ্ট–ছ = তিন পার্বত্য জেলায় সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা এবং এসকল ঘটনার শিকার হয়ে নিহত, আহত এবং অপহৃত ব্যক্তিগণের খতিয়ান। ২৩৭

পরিশিষ্ট–জ = বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র। ২৩৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমি

এলাকা পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ভেঙ্গে তিনটি পার্বত্য জেলায় যে পৃথক পৃথক স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়, সেই তিন জেলা পরিষদকে "স্থানীয় সরকার পরিষদ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে তিনটি পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয় সেগুলি হল, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

জেলা পরিচিতি

১। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

আয়তনঃ- ৬০৮৯ বর্গ কিলোমিটার (২৩৫১ বর্গ মাইল)

জনসংখ্যাঃ- ৩,৯৭,৭১৩ জন (১৯৯১ ইং সালের লোক গণনা অনুসারে)

উপজাতি জনসংখ্যাঃ- ২,২১,০৭৩ জন।

অউপজাতি (বাঙ্গালী)ঃ- ১,৭৬,৬৪০ জন।

জেলায় বসবাসকারী উপজাতিগুলির নামঃ

১) চাক্‌মা, ২) মারমা, ৩) ত্রিপুরা, ৪) তন্‌চংগ্যা, ৫) লুসাই, ৬) পাংখো, ৭) খিয়াং এবং ৮) মুরুং।

জেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বা বর্তমান তিনটি পার্বত্য জেলার মধ্যভাগে এই জেলা অবস্থিত। আয়তন এবং লোকসংখ্যার দিক থেকে এটা তিনটি জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ। রাঙ্গামাটির উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলা, দক্ষিণে বান্দরবান জেলা, পূর্বে ভারতের মিজোরাম এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা।

বনভূমির পরিমানঃ

(ক) সংরক্ষিত বনভূমিঃ- ২৩১৮ বঃ কিলোমিটার (৮৯২ বঃ মাইল)

(খ) অশ্রেণীভূক্ত বনভূমিঃ- ২২৭১ বঃ কিঃ (৮৯০ বঃ মাইল)

থানার সংখ্যা ও নামঃ ১০

যথা, (১) রাঙ্গামাটি সদর, (২) কাউখালী, (৩) নানিয়ারচর, (৪) লংগদু, (৫) বাঘাইছড়ি, (৬) বরকল, (৭) জুরাছড়ি, (৮) রাজস্থলী, (৯) বিলাইছড়ি এবং (১০) কাপ্তাই।

www.pathagar.com

ইউনিয়নের সংখ্যাঃ- ৪৬
মৌজা সংখ্যাঃ- ১৬৪

স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য সংখ্যা- ৩০ জন।
সম্প্রদায় ভিত্তিক সদস্য সংখ্যাঃ-

(১) চাক্‌মা	ঃ-	১০ জন
(২) মারমা	ঃ-	৪ জন
(৩) তন্‌চংগ্যা	ঃ-	২ জন
(৪) ত্রিপুরা	ঃ-	১ জন
(৫) লুসাই	ঃ-	১ জন
(৬) পাংখো	ঃ-	১ জন
(৭) খিয়াং	ঃ-	১ জন
(৮) বাঙালী	ঃ-	১০ জন
	মোট =	৩০ জন

জেলার বৈশিষ্ট্যঃ
১৯৫৮-৫৯ সালে কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণের ফলে যে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়, তার আয়তন ৮৯৭ বর্গ কিলোমিটার, যার অধিকাংশ এলাকা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মধ্যে অবস্থিত।

২। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাঃ
(ক) আয়তনঃ- ২৫৯০ বর্গ কিলোমিটার (১০০০ বর্গ মাইল)।
(খ) লোকসংখ্যাঃ- ৩,৪০,০৯৫ জন।
(গ) উপজাতি জনসংখ্যাঃ- ২,৩৮,৭০২ জন।
(ঘ) অউপজাতি (বাঙালী)ঃ- ১,০১,৩৯৩ জন।

থানার সংখ্যা ও নামঃ ৮
যথা, (১) খাগড়াছড়ি সদর, (২) দীঘিনালা, (৩) পানছড়ি, (৪) মহালছড়ি, (৫) মাটিরাঙ্গা, (৬) মানিকছড়ি, (৭) রামগড় এবং (৮) লক্ষীছড়ি।

ইউনিয়নের সংখ্যাঃ-৩৫
মৌজার সংখ্যাঃ- ১১৮

বনভূমির পরিমানঃ
(ক) সংরক্ষিত বনভূমিঃ- ১০৩ বঃ কিঃ মিঃ (৪০ বঃ মাইল)
(খ) অশ্রেণীভূক্ত বনভূমিঃ- ১০৯৪ বঃ কিঃ মিঃ (৪৬২ বঃ মাইল)

www.pathagar.com

জেলায় বসবাসকারী উপজাতিগুলির নামঃ
১) চাক্‌মা, ২) মারমা এবং ৩) ত্রিপুরা।

জেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ
তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার এবং বর্তমান তিন পার্বত্য জেলার সর্বোত্তরে অবস্থিত। খাগড়াছড়ি জেলার উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলা, পূর্বে মিজোরাম এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম জেলা।

স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য সংখ্যাঃ- ৩০ জন।

সম্প্রদায় ভিত্তিক সদস্য সংখ্যাঃ-

(১) চাক্‌মা	ঃ-	৯ জন
(২) ত্রিপুরা	ঃ-	৬ জন
(৩) মারমা	ঃ-	৬ জন
(৪) বাঙালী	ঃ-	৯ জন
	মোট =	৩০ জন

জেলা সৃষ্টিঃ- ১৯৮৩ সাল।

৩। বান্দরবান পার্বত্য জেলাঃ
(ক) আয়তনঃ- ৪৫০২ বঃ কিলোমিটার (১৭৩৮ বঃ মাইল)
(খ) লোকসংখ্যাঃ- ২,২৯,৬১২ জন।
(গ) উপজাতি জনসংখ্যাঃ- ১,২৩,৭৫৯ জন।
(ঘ) অউপজাতি (বাঙালী)ঃ- ১,০৫,৮৫৩ জন।

থানার সংখ্যা ও নামঃ ৭
যথা, (১) বান্দরবান সদর, (২) রুমা, (৩) রোয়াংছড়ি, (৪) থান্‌চি, (৫) নাইক্ষ্যংছড়ি, (৬) আলীকদম এবং (৭) লামা।

ইউনিয়নের সংখ্যাঃ- ২৮
মৌজা সংখ্যাঃ- ৯৬

বনভূমির পরিমানঃ
(ক) সংরক্ষিত বনভূমিঃ- ৭৫১ বঃ কিঃ মিঃ (২৮৯ বঃ মাইল)
(খ) অশ্রেণীভূক্ত বনভূমিঃ- ২১২৫ বঃ কিঃ মি (১১১১ বঃ মাইল)

জেলায় বসবাসকারী উপজাতিগুলির নামঃ
১) মারমা, ২) মুরুং (মো), ৩) ত্রিপুরা, ৪) তন্‌চংগ্যা, ৫) বম, ৬) চাক,

www.pathagar.com

৭) চাক্‌মা, ৮) খিয়াং, ৯) খুমি, ১০) লুসাই এবং ১১) পাংখো।

জেলার ভৌগলিক অবস্থানঃ

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পার্বত্য অঞ্চলের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তনের দিক দিয়ে এই জেলার স্থান তিন জেলার মধ্যে দ্বিতীয়। কিন্তু লোকসংখ্যার দিক দিয়ে এর স্থান তৃতীয়। এর উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলা, দক্ষিণে বার্মা, পূর্বে বার্মা এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য সংখ্যাঃ- ৩০ জন।

সম্প্রদায় ভিত্তিক সদস্য সংখ্যাঃ-

(১) মারমা ও খিয়াং	ঃ-	১০ জন
(২) মুরুং (ম্রো)	ঃ-	৩ জন
(৩) ত্রিপুরা ও উচাই	ঃ-	১ জন
(৪) তন্‌চংগ্যা	ঃ-	১ জন
(৫) বম, পাংখো ও লুসাই	ঃ-	১ জন
(৬) চাক্‌মা	ঃ-	১জন
(৭) খুমী	ঃ-	১ জন
(৮) চাক্‌	ঃ-	১ জন
(৯) বাঙালী	ঃ-	১১ জন
	মোট=	৩০ জন

জেলা সৃষ্টিঃ- ১৯৮১ সাল।

ক: বৃটিশ আমলঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনিকভাবে চট্টগ্রাম জেলারই একটা অংশ ছিল। ১৮৬০ সালে সর্বপ্রথম বর্তমান রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলাকে নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটা নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়। নতুন জেলা হিসাবে যে কয়টি আইন দ্বারা এটা শাসন করা হত সেগুলি হল ১৮৬০ সালের ২২ নং আইন, ১৮৬৩ সালের ৪ নং আইন (বিসি), ১৮৭৩ সালের ৩ নং বিধি এবং ১৮৮১ সালের ৩ নং বিধি। জেলার শাসনকর্তার পদবী ছিল সুপারিনটেনডেন্ট। প্রথমে জেলার সদর দপ্তর ছিল কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমান চন্দ্রঘোনায়।

নতুন জেলা গঠিত হওয়ার সাত বছর পর ১৮৬৭ সালে শাসনকর্তার নাম সুপারিনটেনডেন্ট থেকে পরিবর্তন করে ডেপুটি কমিশনার করা হয়।

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কারণে জেলার সদর দপ্তর ১৮৬৮ সালের নভেম্বর মাসে চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করা হয়।

১৮৯১ সালে লুসাই পাহাড় (বর্তমান মিজোরাম) বৃটিশ নিয়ন্ত্রনাধীনে চলে আসার পর শাসকদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক গুরুত্ব কমে যায়। তখন এটাকে একজন সহকারী কমিশনারের শাসনাধীনে একটা স্বতন্ত্র মহকুমায় রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৮৯২ সালের বিধানাবলী মোতাবেক শাসন করা হয়। ১৯০০ সালের মে মাসে CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION (REGULATION NO.1 OF 1900) নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় একটা নতুন আইন চালু করা হয়। উক্ত আইন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন সংক্রান্ত ১৮৬০ সালের ২২ নং আইন এবং ১৮৬৩ সালের বেংগল আইন নং ৪ রহিত করা হয়। CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার একটি জেলায় উন্নীত করা হয় এবং শাসনকর্তার পদবী পুনরায় সুপারিনটেনডেন্ট করা হয়।

মহকুমা, সার্কেল এবং মৌজাঃ

চাক্‌মা, মং এবং বোমাং রাজার শাসনাধীন এলাকার ভিত্তিতে তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে রাঙ্গামাটি, রামগড় এবং বান্দরবান নামে তিনটি মহকুমায় ভাগ করা হয়। ১৯২০ সালে CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION সংশোধন করে জেলার শাসনকর্তার পদবী পুনরায় ডেপুটি কমিশনার করা হয়। দ্বৈত শাসন পদ্বতি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসনভার এককভাবে বাংলার গর্ভনরের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। EXCLUDED AREA হিসাবে EXECUTIVE COUNCIL এই জেলার শাসন কাজে গভর্নরকে সাহায্য করতেন।

এই জেলার শাসনকাজ পরিচালনার নিমিত্তে CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION এর অধীনে বেশ কিছু বিধি বিধান তৈরী করা হয়। এসব বিধি বলে পূর্বে বলবৎ সব আইন রহিত হয়ে যায়। ঐসব বিধি বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পূর্বোক্ত তিনটি মহকুমাকে তিনটি সার্কেলে ও প্রত্যেক সার্কেলকে বেশ কয়েকটি মৌজায় ভাগ করা হয়। এসব নতুন বিধি বলে তিন সার্কেলের শাসনভার এই জেলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বের অবস্থার ন্যায় চাক্‌মা, বোমাং এবং মং রাজাদের কাছে রেখে দেওয়া হয়। ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট মৌজার বাসিন্দা এবং সার্কেল প্রধানের (রাজা) সাথে পরামর্শ করে মৌজা হেডম্যান নিযুক্ত করতেন। মৌজা হেডম্যানগণ সার্কেল প্রধানদের নিয়ন্ত্রনাধীনে নিজ নিজ মৌজা থেকে জুম ও জমির খাজনা আদায় করতেন, যা তারা আজও করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

১৭৮২ সাল পর্যন্ত বর্তমান রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার অন্তর্গত পার্বত্য অঞ্চল দু'জন উপজাতীয় প্রধান (স্থানীয়ভাবে রাজা বলা হত) শাসন করতেন। তাঁরা পরস্পর থেকে স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা হলেন চাক্‌মা এবং বোমাং রাজা। উল্লিখিত বছরেই বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্ভূক্ত এলাকাকে নিয়ে মং সার্কেল নামে আরো একটা নতুন সার্কেল সৃষ্টি করা হয়, যে এলাকাকে নিয়ে পরবর্তীকালে রামগড় মহকুমা গঠন করা হয়।

CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION এর অধীনে জেলার স্থানীয় বাসিন্দা নহে এমন ব্যক্তি অথবা অন্য জেলা থেকে আগত ব্যক্তিদের কাছে ভূমি বন্দোবস্ত বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং ভূমি বন্দোবস্ত এবং ইজারা প্রদানের বিষয়টি দেখাশুনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সময় দেওয়ানী আদালত ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION, 1900 অনুসারে ডেপুটি কমিশনার দেওয়ানী মামলা বিচার নিষ্পত্তি করতেন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা এবং দায়রা জজ হিসাবে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলার আপীল আবেদন বিচার নিষ্পত্তি করতেন। CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION –এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত বিধিবিধান বা HILL TRACTS MANUAL এর উদ্দেশ্য ছিল উপজাতীয় জনগণের অধিকার এবং স্বার্থ, সামাজিক রীতিনীতি, অভ্যাস, তাদের স্থানীয় অথবা জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কারাদি সংরক্ষণ করা। অন্ততঃ শাসকগোষ্ঠি উপজাতীয় জনগণকে তা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন(INDIAN ACT.1935) আইনেও তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের EXCLUDED AREA এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

খ: স্বাধীন পাকিস্তানে পার্বত্য চট্টগ্রামঃ

যে ফর্মূলার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের এলাকাসমূহ নির্ধারণ করা হয়, সে ফর্মূলা অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ স্বাধীন ভারতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয় জনগণের বিরোধীতা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে পাকিস্তান গঠিত হওয়ার সাথে সাথে কিছু উপজাতীয় নেতা দেশ ত্যাগ করেন। কিছু উপজাতীয় নেতা কর্তৃক পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়ার কারণে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে সমগ্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠিকে পাকিস্তান বিরোধী শক্তি হিসাবে শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়। পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্যের বিষয়ে সব সময় সন্দেহ করা হত। ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের EXCLUDED AREA এর মর্যাদা সংরক্ষণ সহ CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION, 1900 এই অঞ্চলের শাসনবিধি হিসাবে বলবৎ রাখা হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধানে তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক মর্যাদা EXCLUDED AREA থেকে পরিবর্তন করে TRIBAL AREA করা হয়। ১৯৬৩ সালে উক্ত সংবিধানের এক সংশোধনী আইন বলে (১৯৬৪ সালের আইন নং- ১) ১৯৬৪ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় এলাকার (TRIBAL AREA) মর্যাদা বাতিল এবং CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION রহিত করা হয়। উপজাতীয় প্রধানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংবিধানের উপরোক্ত সংশোধনী পাকিস্তান আমলে কার্যকরী করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION বলবৎ করা না হলেও নির্বাহী আদেশ বলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ করা হয়।

গ: পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনাঃ

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলে শাসনভার এককভাবে বাংলার গভর্ণরের উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি একটি নির্বাহী কাউন্সিলের সাহায্যে এই জেলার শাসন কাজ চালাতেন। এই বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার কারণে বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পল্লী অঞ্চলে কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। বৃটিশ ভারতের অন্যত্র স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা জেলা বোর্ড ছিল না। এমনকি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের যে ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। বাংলার ঐ প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন আসন বরাদ্ধ করা হয়নি এবং নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়নি। [Socio-political History of Bengal, chapter II, Bengal Between Two world wars (1920-1939) by Kamruddin Ahmad]

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন পাশ করে এবং ঐ বছরের ২রা আগষ্ট তা আইনে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

উক্ত আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল, (১) গভর্ণর শাসিত প্রদেশসমূহ, এবং ফেডারেশনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ভারতীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠন এবং (২) প্রতিটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশে নির্বাচিত আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ প্রাদেশিক সরকার গঠন করা। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকা হিসাবে এর শাসনভার সম্পূর্ণরূপে গভর্ণরের দায়িত্বে থেকে যায়।

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি জারী হওয়ায় তৎকালীন বাংলার সরকার তিন উপজাতি প্রধান তথা তিন রাজাকে নিয়ে একটা জেলা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। সাধারণ প্রশাসন এবং রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করা এবং শিক্ষার প্রসারে এবং স্বাস্থ্য ও জনগণের অবস্থার উন্নয়নে এর প্রভাব খাটানোর জন্য এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৬০ সালে জেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত উপজাতি প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত এই উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী ছিল। (Bangladesh District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts, 1975)।

ঘঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম সাধারণ নির্বাচনঃ

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নানা টালবাহানা করে নির্বাচন বিলম্ব করতে থাকে। গণ দাবীর মুখে শেষ পর্য্যন্ত ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। উক্ত নির্বাচনে অমুসলমানদের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ২টি বরাদ্ধ করা হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের এই নির্বাচনই পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে ১জন এবং তফসিলী সম্প্রদায়ের আসন থেকে ১ জন প্রার্থী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তারা হলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান এবং তফশিলী সম্প্রদায় থেকে বাবু বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা। তারা দুজনই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বৌদ্ধ আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত উপরোক্ত দুজন সদস্যই বর্তমানে প্রয়াত। উল্লেখ্য যে, প্রাদেশিক পরিষদের উক্ত নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন। অন্য দিকে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল ২২৩টি। এছাড়া অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে যুক্ত

www.pathagar.com

ফ্রন্ট সমর্থনে ১০ জন প্রার্থীও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এতে যুক্ত ফ্রন্টের মোট আসন দাঁড়িয়েছিল ২৩৩টি।[(২২৩+১০) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংবিধান, আবদুল মোতালিব]।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হওয়ার ফলে ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রের অধীনে পাকিস্তানে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় আইনসভার কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জেনারেল আইয়ুব, ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ নামে একটি আইন জারী করে একটি নতুন স্থানীয় সরকার পদ্ধতি দেশে চালু করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রের ৫টি স্তর ছিল। যথা, ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল এবং প্রাদেশিক উপদেষ্টা কাউন্সিল বা পরিষদ। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে ইউনিয়ন কাউন্সিল সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ১৩ই জানুয়ারী প্রেসিডেনসিয়াল (নির্বাচন এবং সংবিধান) আদেশ, ১৯৬০ সালে জারী করে জেনারেল আইয়ুব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনী কলেজ গঠন করার আইনগত ভিত্তি রচনা করেন। ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত 'হ্যাঁ', 'না' ভোটে জেনারেল আইয়ুব ৮০ হাজার, মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে থেকে ৭৫,২৮২টি ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার ম্যান্ডেন্ট লাভ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। উক্ত সংবিধানে প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। নতুন সংবিধানে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী কলেজ গঠন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এদিকে ১৯৬৪ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ইউনিয়ন

www.pathagar.com

কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে ৪৯,৯৫১টি বা শতকরা ৬২.৬টি ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বলে দাবী করা হয়। (Pakistan Affairs by Mizanur Rahman Shelly & Khamruzzaman Chowdhury).

ঙ: পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনাঃ

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩৯ টি ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং ১১টি থানা কাউন্সিল গঠিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের মোট ২৭০ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ১৩৫ জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। থানা কাউন্সিলসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন (সকলে মনোনীত)। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কাউন্সিল গড়ে ১৩.০৬ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। প্রত্যেক ইউনিয়নের গড় জনসংখ্যা ছিল ৯৭০০ জন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহে দেশের অন্যান্য ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের ন্যায় সালিশী আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। মৌজা হেডম্যান এবং উপজাতীয় প্রধানগণ উপজাতীয় সামাজিক বিরোধসমূহ বিচার নিষ্পত্তি করতেন বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে যে ৩৯টি ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হয় সেগুলিই হল পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫৯ সালের আগে কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ছিলনা। পরে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাঙ্গামাটিতে একটা টাউন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান এবং ৬ জন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৭৪ সালে রাঙ্গামাটি টাউন কমিটিকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয়। (প্রাগুক্ত Bangladesh District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts, 1975)।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মোট সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ১৫৬ জন। এদের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে মোট ৬টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ৭৮টি করে নির্ধারণ করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যাও ১৫৫টি হিসাবে বরাদ্ধ করা হয়। এর মধ্যে ৫টি

www.pathagar.com

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এই শাসনতন্ত্র ছিল এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক। এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রবল আপত্তি তুলে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অচিরেই এ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করে দেয়।

৬.১: ১৯৬২ সালের জাতীয় পরিষদঃ

এই বিক্ষোভ আন্দোলনের মুখে ১৯৬২ সালের ২৮ শে এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ই মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন আলাদা আসন বরাদ্ধ করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলার একটা অংশের সাথে জুড়ে দিয়ে একটা আসন বরাদ্ধ করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামেরও প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হন।

৬.২: ১৯৬২ সালের প্রাদেশিক পরিষদঃ

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক পরিষদেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা আসন বরাদ্ধ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রামের একটা অংশের সাথে জুড়ে দিয়ে একটা আসন বরাদ্ধ করা হয়েছিল। তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পিই-১৫০, চট্টগ্রাম-১০ নং আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন (Proceedings of East Pakistan Provincial Assembly, First session, 1962)।

৬.৩: জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ১৯৬৫ সালঃ

১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম আসনে চট্টগ্রাম জেলা থেকে জনাব গিয়াসউদ্দীন আহম্মদ নির্বাচিত হন। জনাব ফরিদ আহম্মদকে পরাজিত করে জনাব গিয়াসউদ্দীন আহম্মদ জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন।

৬: ৪: প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৬৫ঃ

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পিই-১৫০ চট্টগ্রাম-১০ আসনে বোমাং রাজা মংশৈ প্রু চৌধুরী সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর পরই তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর তার আসন শূণ্য হয়। তার উক্ত শূণ্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চাক্মা রাজা ত্রিদিব রায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। (Assembly Proceedings, East Pakistan Provincial Assembly. Budget session, 1965-66)।

www.pathagar.com

ঙ: ৫: জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০ঃ

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন এবং মহিলাদের জন্য ৭টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্ধ করা হয়। ১৬২ টি সাধারণ আসন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি আলাদা আসন বরাদ্ধ করা হয়।। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন।

ঙ: ৬: প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ঃ

১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দুটি আসন বরাদ্ধ করা হয়। ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে একটি আসনে রাঙ্গামাটি থেকে মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা এবং অপর আসনে বান্দরবান থেকে অংশৈ প্রু চৌধুরী নির্বাচিত হন। এরা ২জনই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন।

চ: পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ঃ

শাসন বহির্ভূত গর্ভণর শাসিত এলাকা হিসাবে একটি বিশেষ আইন দ্বারা শাসিত এলাকায় স্থানীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলে প্রদত্ত ডেপুটি কমিশনারের একক ক্ষমতাকে বহাল রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে জন প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধান একেবারে সাধারণ ব্যাপার ছিলনা। পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা খুব একটা খর্ব না হলেও ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব উপজাতীয় প্রধান এবং মৌজা প্রধানদের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হয়েছে বলা যায়।

এই প্রক্রিয়াকে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ধারার বিজয় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশের ধারা কিভাবে এগোচ্ছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়ার জন্যই বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন সেগুলির অন্যতম। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনগুলিতে উপজাতীয় প্রধানদের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব অক্ষুন্ন থাকলেও স্থানীয় নির্বাচনগুলির দ্বারা উপজাতীয় সমাজে ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্বের বাইরেও সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে একটা নেতৃত্ব গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কৃষি

বর্তমান তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে সৃষ্ট তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকা ছোট বড় এবং উঁচু নীচু অসংখ্য পাহাড়ে পরিপূর্ণ। তুলনামূলকভাবে সমতল ভূমির পরিমাণ খুবই কম। কেবলমাত্র নদী অববাহিকাসমূহে কৃষি কাজের উপযোগী কিছু সমতল জমি রয়েছে। তাই পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মূল জনগোষ্ঠির সবাই সমতল ভূমির কৃষির পরিবর্তে পাহাড়ী জমিতে এক ধরণের কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে এই কৃষি পদ্ধতিকে জুম চাষ বলা হয়।

ক: জুম চাষঃ

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মূল জনগোষ্ঠি উপজাতীয়রা কয়েক শতাব্দী যাবত জুম চাষ নামে একটি বিশেষ কৃষি পদ্ধতিকে জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে। নিজ পছন্দমত পাহাড়ের একটা ঢালু অংশকে নির্বাচন করে তাতে একটা চিহ্ন দেওয়া হয়। পৌষ-মাঘ মাসে জংগল কাটা হয়। ঝোপ-ঝাড় শুকিয়ে গেলে চৈত্র মাসের শুরুতে তাতে আগুন দেওয়া হয়। আগুনে পুড়িয়ে ফেলার পর ঝোপ-ঝাড়ের অবশিষ্ট অংশ বিশেষতঃ গাছ-বাঁশের টুকরা, মূল-কান্ড ইত্যাদি সরিয়ে ফেলে জমি পরিস্কার করা হয়। সম্পূর্ণ জমি পরিস্কার করার পর বৈশাখ মাসের শুরুতে ধান, তিল, তুলা এবং নানা জাতের শাক সব্জির বীজ একই সাথে বুনা হয়। বীজ বুনার পর ফসল পাকার সময় শ্রাবন-ভাদ্র মাস পর্যন্ত তিন-চারবার জমির আগাছা পরিস্কার করতে হয়।

শাক-শব্জি ছাড়া জুম থেকে প্রথম যে ফসল পাওয়া যায় তা হল ধান, যা শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পাকে। এর পর কার্তিক মাসে তুলা এবং তিল তোলা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতের শিম, আলু এবং কচুর চাষও একই জমিতে করা হয়। অগ্রহায়ন মাস নাগাদ জুমের ফসল তোলা শেষ হয়। জুমের জমির পরিমাণ হিসাব করা হয় বীজ বুনার পরিমাণ হিসাবে, একর হিসাবে নয়। ১ মন বীজ বপন করে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ মণ ধান পাওয়া যেত। শাক-শব্জি, তিল এবং তুলা একই জমিতে উৎপাদিত অতিরিক্ত ফসল হিসাবে পাওয়া যেত। এক সময় প্রচুর পরিমাণে তিল এবং তুলা

www.pathagar.com

জুমে উৎপাদিত হত। সেসব অর্থকরী ফসল থেকে যে আয় হত, তা দিয়ে একটা পরিবার স্বচ্ছলভাবে এবং স্বচ্ছন্দে চলতে পারত।

এক সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় যে, এক সময় ১০২,৪৬৮ একর বা পার্বত্য অঞ্চলের ৪.৩ শতাংশ এলাকায় জুম চাষ করা হত। জুম চাষের উপযোগী পাহাড়ী জমির দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৮ হাজার একর জমিতে ফসল উৎপাদন করা হয়। একই সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় যে, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ২৪৬৭ বর্গমাইল এলাকা জুম চাষ ও বনজ সম্পদ আহরণের জন্য পাওয়া যেত। প্রতিবছর ২৬ হাজার পরিবার ১২০ বর্গমাইল এলাকায় জুম চাষ করত। সব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত।

প্রতিবছর একই জমিতে জুম চাষ করা যায়না। গাছ-পালা এবং ঝাড়-জঙ্গল বেড়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কমপক্ষে ১০/১২ বছর সময় দিতে হয়। তাই জুম চাষীদেরকে প্রতি বছর নতুন জমির সন্ধানে একাধিক মাইল দূরে যেতে হয় এবং অন্তত এক বছরের জন্য সেখানে সপরিবারে বসবাস করতে হয়। এক বা কয়েক পরিবারের পক্ষে মূল জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নিরাপদ নয় বলে পুরা একটা গ্রামকে চলে যেতে হয়। জুম চাষের জন্য পুরা জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যাযাবর জীবন যাপন করতে হত। ফলে স্থায়ী জনবসতি গড়ে তোলা বেশ কঠিন ছিল। এক সময় অবশ্য স্থায়ী গ্রামের পত্তন হয়েছিল। তবে সেক্ষেত্রেও প্রত্যেক পরিবারের একটা অংশকে গ্রাম থেকে দূরে অবস্থিত জুম এলাকায় বছরের একটা সময় পর্যন্ত বসবাস করতে হত। জুম চাষ স্থায়ী জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জুম কৃষির একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, জুম চাষের জমি কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিলনা। জুম চাষের জন্য কোন জমি বন্দোবস্ত বা ইজারা নিতে হতনা। মৌজা প্রধান এবং গোত্র প্রধানগণই জুম চাষের জমি নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে বিলি বন্টন করতেন। তবে একটা জমি একবার চাষ করলে সে জমির উপর তার একটা অধিকার বর্তায়। পরবর্তীকালে সেটা জুম চাষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উর্বর এবং উপযোগী হলে সেখানে তার দাবী অগ্রাধিকার লাভ করে। শতাব্দী কাল যাবত এই নিয়ম অনুসরন করার ফলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে ভূমি মালিকানার একটা নীতিমালা গড়ে উঠে।

কাল পরিক্রমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ নীতি আরোপ ও কড়াভাবে প্রয়োগের কারণে জমির উর্বরতা এবং পরিমাণ দ্রুতগতিতে কমে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার

www.pathagar.com

কারণে একই জমি কম সময়ের ব্যবধানে চাষ করতে হত। এতে জমির উর্বরতা বাড়তে পারতনা। ফলে উৎপাদন কমে যায় –এক সময় জুম চাষ অলাভজনক পেশায় পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশকে আজও জুম চাষ পেশা আঁকড়ে থাকতে হচ্ছে। বিকল্প পেশা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এমন এক সময় ছিল যখন একটি জমি একবার জুম চাষ করার পর ১০/১২ বছর পতিত রাখা হত। এভাবে প্রায় এক যুগ পতিত রাখার পরই একটি পাহাড়ী জমি দ্বিতীয় বার জুম চাষ করা হয়। এতে জমি উর্বরতা ফিরে পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর সরকারী হিসাব মতেই, ৩৫০ বর্গমাইল এলাকা বছরের কোন না কোন সময় কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদের পানিতে পুরাপুরি অথবা আংশিকভাবে ডুবে যায়, যার শতকরা ৮০ শতাংশ জুম চাষোপযোগী পাহাড়ী জমি। এতে জুম চাষের জমির উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। জমির স্বল্পতা হেতু একটা জমি ৩/৪ বছর পতিত রাখার পর পুনরায় চাষ করতে হচ্ছে। গাছ-পালা এবং ঝোপ-ঝাড় বৃদ্ধির সময় না পাওয়াতে জমির উর্বরতা তথা ফসল উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে ফেলছে। তাই জুম চাষ আর জীবিকার অবলম্বন নয়।

খ: নদী অববাহিকা ও নিম্ন অঞ্চলের কৃষিঃ

প্রধানতঃ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় উপজাতীয়দের একটা অংশ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জুম চাষের পরিবর্তে নদী অববাহিকার নিম্ন ও সমতল জমি আবাদ করে চাষাবাদ শুরু করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথমে উপজাতীয় প্রধানগণই পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলা থেকে বাঙ্গালী নিয়ে এসে নদী অববাহিকার সমতল ভূমিতে চাষাবাদ আরম্ভ করেন। এসব বাঙ্গালীদের কাছ থেকে চাষাবাদ জেনে নিয়ে উপজাতীয়দের একটা অংশ এই কাজে এগিয়ে আসে। উপজাতীয় প্রধানগণ বিশেষতঃ চাকমা প্রধান নিজে সমতল জমিতে চাষাবাদ শুরু করলেও উপজাতীয়দেরকে এই চাষাবাদের কাজে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কারণ এতে একদিকে, উপজাতীয় প্রধানদের রাজস্ব আয় হ্রাস পায়, অন্যদিকে তাদের প্রভাব খর্ব হয়। জুম চাষ থেকে রাজস্ব বা পারিবারিক কর হিসাবে যে আয় হয়, তার সিংহভাগ উপজাতীয় প্রধানরাই পান। সমতল জমি চাষাবাদ থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার সবটাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিতেন। তাছাড়া উপজাতীয়রা এ ক্ষেত্রে খাজনা উপজাতীয় প্রধান বা মৌজা হেডম্যানের কাছে না দিয়ে সরাসরি ডেপুটি কমিশনারের কাছে জমা দিতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই উপজাতীয় প্রধানগণ এবং মৌজা হেডম্যানগণ বৃটিশ সরকারের এই পরিকল্পনার বিরোধীতা করেন। একাজে বৃটিশ

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। "Collections from the correspondence on the revenue history of Chittagong Hill Tracts (From 1868-1887)" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

একই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ সালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উপজাতীয়দেরকে সমতল ভূমিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। এই সময়ে তারা উপজাতীয়দেরকে ৩৮,১০০ টাকা ঋণ প্রদান করেছিল। প্রধানতঃ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং বনজ সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সমতল ভূমিতে চাষাবাদ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উপজাতীয় প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদের বিরোধীতা সত্বেও ১৮৭২ সাল নাগাদ ৪২৫৬ একর সমতল জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৯০৬-০৭ সালে আবাদকৃত সমতল কৃষি জমির পরিমান বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় দাঁড়ায় ২০,০০০ একর। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী, চেঙ্গী, কাচালং, মাইনী, শংখ এবং মাতামুহুরী নদী অববাহিকার সম্পূর্ণ সমতল জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ণফূলী প্রকল্প ইতিহাস

১.ক: ভারত বিভাগ পূর্ব অনুসন্ধান ঃ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী, জনাব খাজা আজিম উদ্দীন কর্তৃক প্রণীত Karnafully Multipurpose project (1952) নামক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কর্ণফুলী নদীকে মানবজাতির কল্যানে ব্যবহার এবং অববাহিকার নিম্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণহীন সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি বিগত অর্ধশতাব্দী যাবত বিবেচনাধীন ছিল। জানা গেছে যে, ১৯০৬-৭ সালে সর্বপ্রথম নদীতে বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯২২ সালে মিঃ গ্রিভ্স পুনরায় নদীতে অনুসন্ধান চালান। তবে ১৯৪০ সালের আগে বিস্তারিত কোন প্রস্তাব তৈরী করা হয়নি। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মিঃ ই, এ, মুর ঐ বছরই কর্ণফূলী প্রকল্পের উপর তার প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেন। (The project for harnessing the river Karnaphully to the services of mankind and to check its uncontrolled devastating floods in the lower reaches of the valley seems to have been under the contemplation for almost half a century. It is said that the river was first examined in 1906-07 and later investigation were carried out by Mr. Grieves in the year 1922. However definite proposals, in some details did not come to drawn up till, 1940, when Mr. E.A. Moore superintending Engineer submitted his preliminary report on the karnaphuly scheme).

খাজা আজিম উদ্দীনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মূলতঃ কর্ণফুলী নদীকে মানব কল্যানের কাজে লাগানো এবং এর নিম্নাঞ্চলে সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে ভারত বিভাগের পূর্বেই এতে বাঁধ দেওয়ার জন্য তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করছিলেন।

বরকলে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাবঃ

জনাব ই, এ, মুর তার উল্লিখিত প্রাথমিক প্রতিবেদনে বরকল থানা সদরে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাব মতে, বাঁধের উচ্চতা নদীর

www.pathagar.com

তলদেশ থেকে ১০০ ফুট এবং ১৬৮.৫ ফুট উচ্চতায় বাঁধের দৈর্ঘ্য হবে ১২০০ ফুট। বাঁধ এলাকা থেকে নদীর পানি সঞ্চয় এলাকার আয়তন হবে ১৫৬৮ বর্গমাইল এবং বার্ষিক পানি প্রবাহের পরিমাণ ধরা হয় ২১,৭৮০ কোটি ঘনফুট। বাঁধ নির্মাণের ফলে যে কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি হবে এর ৮৫ ফুট উচ্চতার তলদেশে পলিমাটি সঞ্চয়ের পরিমান ধরা হয়েছিল ৫৪৫ কোটি ঘনফুট এবং নদীর তলদেশ থেকে জলাশয়ের ১৫০ ফুট উচ্চতার মধ্যে ২০৪৪০ কোটি ঘনফুট। অবশ্য শেষোক্ত পরিমান পলিমাটি শুষ্ক মৌসুমে ভেসে উঠা জলাশয়ের জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত বাঁধের শীর্ষবিন্দু ধরা হয়েছিল নদীর তলদেশ থেকে ১৬৮.৫ ফুট। উল্লিখিত পরিমাণ পলিমাটি ধারণ করেও বাঁধটি ১০০ বছর টিকে থাকবে বলে জনাব মুর তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

জনাব মুর ১৯২৯ সালে যে বন্যা হয় তাতে কর্ণফুলী অববাহিকায় সবচেয়ে বেশী পরিমান পানি প্রবাহিত হয়েছিল বলে হিসাব দিয়েছিলেন। সেই বন্যায় কর্ণফুলী নদীতে পানি প্রবাহের পরিমাণ ধরা হয়েছিল প্রতি সেকেন্ডে ১৭৪,৭০০ ঘনফুট। তাই প্রস্তাবিত বাঁধে প্রতি সেকেন্ডে ২,৩৩,০০০ ঘনফুট পানি প্রবাহের প্রয়োজন হতে পারে এমন বড় ধরণের বন্যা মোকাবেলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। জনাব মুরের প্রস্তাবে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, বরকলে এই বাঁধ নির্মাণের ফলে ভবিষ্যতে কর্ণফুলী নদীর নিম্নাঞ্চলে বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা দূরীভূত হবে।

২.খ: চিলাক ধাক বাঁধঃ

বলাবাহুল্য, বরকলে বাঁধ নির্মাণের প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছিল ভারত বিভাগের পূর্বে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পুনরায় প্রকল্প প্রনয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালে প্রকল্প প্রনয়ন কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫০ সালের জুন মাসে এই কাজ সমাপ্ত হয়। বরকলে বাঁধ নির্মাণের জন্য ইতিপূর্বে যে প্রস্তাব রাখা হয়, তা শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়। ভারত বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর বরকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে যেখানেই বাঁধ নির্মাণ করা হোক না কেন, ভারতের কোন জমির যাতে ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম জলাশয়ের উচ্চতা ১০৮ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯৪৭ সালে যে বন্যা হয় সে আকারের বন্যায় জলাশয়ের ১০৮ ফুট উচ্চতার পানি মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত বড় হরিনাতে ১১৭ ফুট উচ্চতায় উঠে যাবে, যা ঐ এলাকার মূল উচ্চতা থেকে এক ফুট উপরে।

www.pathagar.com

তাই বরকলে বাঁধ নির্মাণ করলে জলাশয়ের পানির উচ্চতা অত্যন্ত কম রাখতে হয়। অথচ কম উচ্চতার জলাশয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কম। তাছাড়া এ ধরণের কম পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জলাশয় নদীর নিম্নাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনা। বরকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলি বিবেচনা করে বাঁধ নির্মাণের স্থান, রাঙ্গামাটি জেলা সদর থেকে ৯ মাইল অদূরে এবং বর্তমান সুবলং বাজার থেকে সিকি মাইল পশ্চিমে চিলাক ধাক নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বাঁধের উচ্চতা ধরা হয় নদীর তলদেশ থেকে ১২০ ফুট এবং বাঁধের উপরিভাগের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট, যার উচ্চতা হবে ১৩০ ফুট। নদীর পানি আহরণ এলাকার আয়তন (Catchment area) ধরা হয়েছিল ৩২০০ বর্গমাইল। নদীতে যে পরিমান পানি জমা হয় তার তুলনায় ব্যবহারের পরিমান অনেক কম হবে বিধায় বাঁধ এলাকায় বাৎসরিক কি পরিমান পানি জমা হবে তা নির্ধারিত হয়নি। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের অতিরিক্ত পানি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ ছেড়ে দিয়ে তারপর থেকে জলাশয়ে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বাঁধ নির্মাণের ফলে যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হবে তার পলিমাটি ধারণ ক্ষমতা হিসাব করা হয়েছিল ২১৮০ কোটি ঘনফুট, যা জমতে সময় লাগবে ১৭৫ বছর। হ্রদে সঞ্চিত পানির মধ্যে থেকে কাজে লাগবে মাত্র ৩৯২০ কোটি ঘনফুট। ১৯৪৬ সালের বন্যাকে সর্ববৃহৎ বন্যা হিসাবে গণ্য করে চিলাক ধাক এলাকায় পানি প্রবাহের পরিমান প্রতি সেকেন্ডে ১৮১,০০০ ঘনফুট ধরে Spill way-র দ্বারা নিষ্কাশনের পরিমান হিসাব করা হয় প্রতি সেকেন্ডে ২৫০,০০০ থেকে ২৭০,০০০ ঘনফুট। তবে সে আকারের একটা বন্যায় হ্রদের পানির উচ্চতা ১৩০ ফুট পর্যন্ত উঠার আশংকা থেকে যায়। অথচ বাঁধের উচ্চতাই নদীর তলদেশ থেকে ১৩০ ফুট।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ধরা হয়েছিল ৪০,০০০ কিলোওয়াট। প্রতি সেকেন্ডে ৪৫০০ ঘনফুট পানি প্রবাহের মাধ্যমে ৭০ ফুট পানির উচ্চতায় এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা এতে রাখা হয়। বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের খরচ বাদে প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৩ কোটি টাকা। আর প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হিসাব করা হয়েছিল ৪ পাই।

www.pathagar.com

২.গ: প্রস্তাব সংশোধনের কারণ সমূহঃ

জনাব আজিম উদ্দীনের প্রতিবেদন মতে-চিলাক ধাকে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাবের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, বাঁধের দ্বারা যে পরিমাণ পানি হ্রদে জমা হবে, তা পুরাপুরি দেশের কাজে লাগানো যাবে কিনা অথবা বর্তমান মুহূর্তে হিসাব করা হয়নি এমন কোন সম্ভাবনা এবং সুযোগ যদি আসে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে কিনা-এই মৌলিক বিষয়টি তাতে বিবেচনা করা হয়নি।

কর্ণফুলী নদীর অববাহিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে, এই নদীর তলদেশ মোহনা থেকে বরকল পর্য্যন্ত প্রায় সমতল। কর্ণফুলী নদীর বহিরাকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে এই নদী ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। তৎকালীন পাকিস্তানী সীমান্ত থেকে নিম্নাঞ্চলের দিকে কর্ণফুলী নদী তিনটি শৈল শ্রেণী অতিক্রম করেছে, যাতে বাঁধ নির্মাণ করা সুবিধাজনক। এই তিনটি সুবিধাজনক স্থানগুলি হল বরকল, চিলাক ধাক এবং শিলছড়ি (কাপ্তাই এর নিকটে)। উপরোক্ত তিনটি শৈল শ্রেণীর যে কোন একটাতে বাঁধ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু একবার বাঁধ নির্মাণ করার পর এর নিম্নাঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করে নদী অববাহিকা উন্নয়নের কোন সুযোগ থাকেনা। কারণ নিম্নাঞ্চলে নির্মিত ক্ষুদ্রাকারের একটি বাঁধও নদীর উজানে নির্মিত বাঁধকে নিমজ্জিত করে দেবে। আর বাঁধের পানি দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন তো আছেই। কারণ এই বাঁধের দ্বারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের অঞ্চল বিশেষ প্লাবিত হওয়ার পুরা সম্ভাবনা বিদ্যমান।

এটা খুব স্বাভাবিক যে, বাধেঁর উচ্চতা যত বাড়ানো হবে হ্রদের পানি ধারণ ক্ষমতা ততই কমে যাবে, যার ফলশ্রুতিতে এর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব প্রাকৃতিক এবং বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে নদী থেকে যে পরিমান পানি পাওয়া যাবে চিলাক ধাক বাঁধ দ্বারা এর একটা ন্যায্য অংশও কাজে লাগানো যায় না। হ্রদের কার্যপদ্ধতি থেকে সেটা বুঝা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে পুরা বর্ষা মৌসুমের পানি Spill way বা লৌহ নির্মিত দরজা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে দরজা বন্ধ করে জলাধারে পানি জমা করা হবে। অর্থাৎ জলাধারে সঞ্চিত বিপুল পরিমান পানি বর্জ্য পদার্থ হিসাবে Spill way দিয়ে বাইরে চলে যাবে। অথচ উক্ত বিপুল পরিমান পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও চিলাক ধাক বাঁধ ত্রুটি পূর্ণ বিবেচিত হয়। Spill way-র পানি নিস্কাশন ক্ষমতা ধরা হয়েছিল প্রতি

www.pathagar.com

সেকেন্ডে ২,৫০,০০০ ঘন ফুট (২৫০০০০ কিউসেক)। কিন্তু এ ধরণের বন্যার ক্ষেত্রে জলাধারের উচ্চতা বাঁধের সর্বোচ্চ উচ্চতায় অর্থাৎ ১৩০ ফুটে উঠে যাবে, যা জলাধারের পানির মূল উচ্চতা থেকে ২৫ ফুট উপরে এবং Spill way-এর (লৌহ নির্মিত দরজার) শীর্ষ বিন্দু থেকে ৪৫ ফুট উপরে। এটাও আশংকা করা হয় যে, বন্যার পানির গতির প্রচন্ডতা সর্বোচ্চ প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ ঘনফুট পর্যন্ত উঠতে পারে, যা বেড়ে গিয়ে চট্টগ্রামে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৪২৫,০০০ ঘনফুট পর্যন্ত উঠবে। যদি এই বন্যার প্রচন্ডতা শতকরা ২৫ ভাগও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলেও পানি প্রবাহের পরিমান হবে প্রতি সেকেন্ডে ৩৪০,০০০ ঘনফুট, যার গতির প্রচন্ডতা ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের অনিয়ন্ত্রিত বন্যার প্রচন্ডতা থেকেও অধিক। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দুটি বন্যায় পানি প্রবাহের পরিমান ছিল যথাক্রমে প্রতি সেকেন্ডে ২৫৬,০০০ এবং ২৪৪,০০০ ঘনফুট। হিসাব করে দেখা গেছে যে, যদি ভবিষ্যতে এ ধরণের বন্যা হয়, তাহলে রাঙ্গামাটিতে পানির উচ্চতা ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের বন্যার পানির উচ্চতার চেয়ে ৭/৮ ফুট উপরে উঠবে। আর চট্টগ্রামে এই উচ্চতা সহজেই ৫ থেকে ৬ ফুট বেড়ে যাবে। এই ধরণের একটা বন্যা স্মরনাতীতকালের অকল্পনীয় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তাছাড়া এধরণের বন্যায় বাঁধের ১০ থেকে ১২ ফুট উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হবে। এধরণের একটা অবস্থা মোকাবেলা করতে পারে এমন মজবুত কাঠামো খুব একটা আশা করা যায় না। অথচ প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ ঘন ফুট অথবা ততোধিক পরিমান পানি প্রবাহিত হতে পারে এধরণের বন্যাও যে ভবিষ্যতে হতে পারে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমানাদি থেকে তা বলা যায়।

প্রকৌশলী খাজা আজিমউদ্দীনের প্রতিবেদনে সর্ববৃহৎ এবং প্রচন্ডতম বন্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ফর্মূলা অনুমোদন করা হয়, তা এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে সংঘটিত অসংখ্য বন্যার প্রচন্ডতার ভিত্তিতেই প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে পানি প্রবাহের সর্বোচ্চ পরিমান ধরা হয়েছে প্রতি সেকেন্ডে ৪৭৫,০০০ ঘনফুট।

উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে চিলাক ধাক বাঁধের আর একটা ত্রুটি হল নির্মান কাজের সমস্যা। চিলাক ধাকের গিরিখাত বেশ সংকীর্ণ, যার উভয় পার্শ্বে রয়েছে উঁচু পাহাড়। অথচ গিরিখাত মাটির বাঁধ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। তাতে বন্যা কোথায় কি পরিমান প্রচন্ডতা লাভ করে তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়। তাই বাঁধের যে নক্সা গ্রহণ করা হয় তা হল কংক্রিট দ্বারা নির্মিত ঠেস দেওয়ালের অনুরূপ। এই বাঁধ নির্মাণের জন্য যেধরণের মোটা পাথর (জমাট বদ্ধ) দরকার সে ধরণের পাথর বাঁধ

www.pathagar.com

এলাকার কাছে পাওয়া যায় না। এসব পাথর সিলেট অথবা ময়মনসিংহ থেকে আনতে হবে। অথচ সিলেট এবং ময়মনসিংহ থেকে চিলাক ধাকের দূরত্ব ৪০০ থেকে ৬০০ মাইল। যদি বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথরের পরিমান ১ কোটি ঘনফুট হয়, তাহলে তৎকালে নির্ধারিত নারায়নগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রতি মাইলে প্রতি মণ ৪২ পাই হিসাবে প্রতি ঘনফুট পাথরের পরিবহন খরচ পড়ে ১ টাকা। এই হিসাবে ১ কোটি ঘনফুট পাথরের শুধুমাত্র পরিবহন খরচ পড়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, যা টাকার অংকে একেবারে নগন্য নয়।

বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা রয়েছে। এই অসুবিধাগুলি হল, পানির উচ্চতার তারতম্য, যার পরিমান প্রায় ৫০ ফুট এবং যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাঁধ নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান দূরে অবস্থিত। নদীর তীর খাড়া এবং দুর্গম, যার জন্য বাঁধ নির্মানের স্থলে এবং এর আশেপাশে নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি পরিবহন কষ্টসাধ্য হবে। অধিকন্তু পানি প্রবাহের জন্য যে বিকল্প খালের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা ধীর গতিতে প্রবাহের এবং মাত্র ৬ মাসের জন্য। এর অর্থ হল 'জলরোধক আঁধার মেরামত, পলিমাটি অপসারণ ইত্যাদির সময় বাদ দিয়ে নদীর অংশে নির্মাণ কাজ করার যে সময় পাওয়া যাবে তার বার্ষিক গড় চার মাসের বেশী হবেনা। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, উপরোক্ত কারণগুলি নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সময়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব ফেলবে। অর্থাৎ ১৯৬০ সালের আগে বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।

একই প্রতিবেদন অনুসারে মূল সমস্যা হল, প্রকল্পের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা। উপরে বর্ণিত গতি অনুসারে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে ৯ বছর সময় লাগে। অথচ সে আকারের নির্মান কাজ সম্পাদন করতে স্বাভাবিক অবস্থায় ৩ থেকে ৪ বছর সময় লাগে। এ ধরণের প্রকল্পে নির্মাণ কাজের গতি আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ পার্থক্য ঘটায়, এই বিলম্বের ফলাফল টাকার অংকে হিসাব করলে তা সহজে বুঝা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কয়লা এবং তেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় পানি থেকে এর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা ছয় পয়সা বেশী হবে, যার অর্থ হল, ৫ থেকে ৬ বছর অতিরিক্ত সময়ে বার্ষিক ২৭·৫ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা প্রায় ১০ কোটি টাকা লোকসান দিব, যার পরিমাণ প্রস্তাবিত চিলাক ধাক প্রকল্পে ব্যয়ের সমপরিমাণ।

সর্বশেষ সমস্যা হল, পাওয়ার হাউজের পানি নদীর মূল গতির দিকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে নদীতে ফিরে আসবে। বাঁধে বাধাপ্রাপ্ত পানি দ্রুত গতিতে

www.pathagar.com

বিপরীত দিকে আছড়ে পড়বে, যদিও তা খুব একটা সমস্যা সৃষ্টি করবেনা। তবে বাঁধের মধ্য দিয়ে মালামাল পারাপারের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে। পানির প্রবল স্রোত ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করবে এবং বাঁধ থেকে ছেড়ে দেওয়া গাছ ও বাঁশের চালি তাতে আটকা পড়বে। এতে পানির প্রবাহে প্রবল বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে গাছ এবং বাঁশের চালিগুলিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বাঁধের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন ৪০ হাজার ঘনফুট গাছ ও শন জাতীয় ঘাস এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার বাঁশ জাতীয় বনজসম্পদ চলাচল করবে। এই পরিমাণ মালামাল ঘূর্ণাবর্তে আটকা পড়ে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবে। অধিকন্তু, বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার দরুন বাঁধের উপরে এবং নীচে কোন দেশীয় নৌযান চলাচল করতে পারবে না।

এসব বিষয়গুলি বিবেচনা করেই পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রকৌশল কর্তৃপক্ষ কর্ণফুলী নদীর নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত কোন একটা গিরিখাতে, তথা শিলছড়িতে বাঁধ নির্মাণের স্থান অনুসন্ধানের সুপারিশ করেছিলেন। বিশ্ব ব্যাংকের তৎকালীন কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গ্রুইস, প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে কর্ণফুলী নদীর সর্বনিম্ন অঞ্চলের গিরিখাতে বর্তমান স্থানে বাঁধ নির্মাণের পক্ষে মত দেন।

২.ঘ: কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারন ও যুক্তিসমূহঃ

কর্ণফুলী নদীকে সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহারের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শেষ পর্যন্ত শিলছড়ি গিরিখাতকে বাঁধ নির্মাণের সর্বোত্তম স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়। কর্ণফুলী নদী এই গিরিখাতের ১০ থেকে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রীর কথা বিবেচনা করে বাঁধটি মাটি দ্বারা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ গাঁথুনী দ্বারা কাঠামো নির্মাণের জন্য যে ধরণের শক্ত পাথরের প্রয়োজন হয় সে ধরণের পাথর কাছাকাছি কোন স্থান থেকে যথেষ্ট পরিমানে এবং কম পরিবহন খরচে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ বাঁধটি যেহেতু মাটি দ্বারা নির্মাণ করা হবে সেহেতু কাঠামোর কোন বিপদ সৃষ্টি না করে যে কোন ধরণের বড় বন্যা মোকাবেলা করার জন্য নির্মান স্থলের পার্শ্বে লৌহার গেট নির্মানের (Spillways) সুযোগ থাকা প্রয়োজন।। এছাড়া নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে নদীর পানি এমনকি স্বাভাবিক বন্যার সময়েও বিকল্প উপায়ে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। এই শেষোক্ত বিষয়টিই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে প্রায় সারা বছর বাঁধ নির্মাণ কাজ

www.pathagar.com

চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং তাতে নির্মাণ কাল ৪ বছর অথবা তার চাইতেও কমে যাবে। বাঁধ এলাকায় বনজ সম্পদ এবং দেশীয় নৌযান পারাপারের সুযোগ থাকাটাও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিলছড়ি গিরিখাতের মুখই একমাত্র স্থান যেখানে উপরোক্ত সকল সুবিধা যুক্তিসংগত খরচে পাওয়া যায়, যা কাপ্তাই থেকে তিন মাইল উজান স্রোতে অবস্থিত। এখানে বাঁধ নির্মাণ করে একদিকে বাঁধের নীচে অবস্থিত চিৎমরম বৌদ্ধ মন্দির এবং কাপ্তাই শৈল শ্রেণীর অন্তর্গত সংরক্ষিত সেগুন বন রক্ষা করা যায়।

এই বাঁধের তুলনামূলক তথ্যাবলী নীচে তুলে ধরা হলঃ

এটা একটি মাটির বাঁধ, যার উপরিভাগের উচ্চতা নদীর তলদেশ থেকে ১২৭ ফুট। বাঁধের দৈর্ঘ্য একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ২০০০ ফুট। বাঁধের এলাকায় পানি আহরণ (Catchment area) এলাকার আয়তন ৪২৫০ বর্গমাইল। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে গড়ে প্রায় ৪২,৫০০ কোটি ঘনফুট পরিমান পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রন করা যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় জলাধারের পানির উচ্চতা ৬০ ফুটের নীচে নামতে দেওয়া হবে না। জলাধারের পলিমাটি ধারণ স্থানের উচ্চতা হিসাব করা হয়েছে নদীর তলদেশ থেকে ৫৪ ফুট। এই উচ্চতার নীচে জলাধারের পলিমাটি ধারণ ক্ষমতা হিসাব করা হয়েছে ৩৩০০ কোটি ঘনফুট, যা সম্পূর্ণ ভরাট হতে সময় লাগবে ১৪৫ বছর। ১০৮ ফুট এবং ৬০ ফুট উচ্চতার মাঝখানে যে পরিমান জায়গায় পানি এবং পলিমাটি ধারণ করতে পারবে, তাহল ১৯৪০৭.৭ কোটি ঘনফুট। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে সংঘটিত বন্যার রেকর্ডকৃত পানি প্রবাহের পরিমান ছিল যথাক্রমে প্রতি সেকেন্ডে ২১৩,০০০ এবং ২০৩,০০০ ঘনফুট। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় বন্যার পানি সর্বোচ্চ প্রতি সেকেন্ডে ৫,২৫,০০০ ঘনফুট গতিতে প্রবাহিত হবে। বাঁধের নক্সা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যে, যদি প্রচন্ডতম কোন বন্যা হয় সেক্ষেত্রে লৌহার গেট দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে ২২৫,০০০ ঘনফুট বেগে পানি ছেড়ে দিয়ে বাকী সমস্ত পানি জলাধারে ধরে রাখা যাবে। সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ধরা হয়েছে ৬৫.৫ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা ইউনিট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ধরা হয়েছে ১৫০,০০০ কিলোওয়াট। যদি মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৬০ ভাগ ও ব্যবহার করা হয়, তাহলে উপরোক্ত পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সর্বোচ্চ পরিমান মূল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ২৪৬,০০০ ঘনফুট পানি প্রবাহের প্রয়োজন হবে। প্রতি

www.pathagar.com

ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ধরা হয়েছে ৫ পাই। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

২. প্রকল্প থেকে প্রাপ্য সুবিধাসমূহঃ

এই বহুমুখী প্রকল্প থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে সেগুলি পাঁচ প্রকারঃ- যথা (ক) বিদ্যুৎ উন্নয়ন, (খ) সেচ এবং পানি নিষ্কাশন, (গ) বন্যা নিয়ন্ত্রন, (ঘ) নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং (ঙ) বনজ সম্পদ আহরণে সুবিধা।

উল্লিখিত সুবিধাগুলি নিম্নে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হলঃ-

২.ক: বিদ্যুৎ উন্নয়নঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট। এর ৪টি ইউনিট থাকবে যার প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩০ হাজার কিলোওয়াট। চাহিদার পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলে ৩০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অতিরিক্ত ইউনিট স্থাপন করা হবে। উপরোক্ত ইউনিটটি কয়লা ও ডিজেলের দ্বারা চালানো হবে। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান হবে ৬৫.৫ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা জল থেকে এবং ৭.৫ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা কয়লা থেকে। জল এবং কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোওয়াট, যা পুরা চাহিদার সমান।

২.খ: সেচ এবং পানি নিষ্কাশনঃ

প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের বিস্তার অনুসারে ২৫০০টি বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি পাম্পের ক্ষমতা ধরা হয়েছে ১৮ কিলোওয়াট অথবা ২৪ অশ্বশক্তি যার প্রত্যেকটি গড়ে ৬ বর্গমাইল এলাকার জন্য বসানো হবে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে এই পাম্পগুলি বন্যার সময় ৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার ৪ ফুট গভীর পানি নিষ্কাশন করতে সক্ষম হবে। শুষ্ক মৌসুমে এই পাম্পগুলি নদী নালা থেকে পানি উত্তোলন করে জমিতে সরবরাহ করবে। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা পানি নিষ্কাশন এবং সময়ের ৭৫ শতাংশ ব্যয় করে পাম্পগুলি ১০ লক্ষ একর দ্বিতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে পানি সরবরাহ করবে।

২.গ: বন্যা নিয়ন্ত্রণঃ

চট্টগ্রামের উজানে অবস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ ৪৬৫ বর্গমাইল এলাকা প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে ঘন ঘন বন্যা কবলিত হয়। এই এলাকাটি ১৯২০

www.pathagar.com

সাল থেকে ১৯৫০ সালে সংঘটিত তিনটি বন্যায় ৯০ লক্ষ টাকা পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জলাধারের ১০৮ ফুট এবং ১১৯ ফুট উচ্চতার মধ্যে স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৭৩৫১.৬ কোটি ঘনফুট পানি জমা রাখার ব্যবস্থা প্রকল্পে রয়েছে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, সাধারণভাবে যে বন্যায় প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ঘনফুটের অধিক পানি প্রবাহিত হবে, সে ধরণের বন্যার পানি জলাধারে ধারণ করা সম্ভব হবে। বাঁধের নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবাহের এই মাত্রা অতিক্রম করতে দেওয়া হবেনা। এভাবে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে পৌনঃপৌনিক বন্যা থেকে রক্ষা করবে।

২.ঘ: নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিঃ

টারবাইনের মাধ্যমে অবিরাম পানি প্রবাহের দরুণ সমুদ্র থেকে বাঁধ পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে। চট্টগ্রাম জেটিতে পানির উচ্চতা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং নদীর উজানে বাঁধ এলাকা পর্যন্ত পানির গভীরতা ৫ থেকে ৬ ফুট বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বাঁধের উপরে ও নীচে মালামাল পারাপারের নিমিত্তে তালাযুক্ত জলাধার নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জলাধারের পানির উচ্চতা ৬৯ ফুটের নীচে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত সারা বছর এই তালাযুক্ত জলাধার খোলা থাকবে। তবে এরকম একটা সময় কদাচিৎই আসবে। ৪৫৬ মাসে মাত্র ২০ মাস জলাধার খোলা থাকবেনা। অর্থাৎ বছরে ১৫ দিন মাত্র এই দরজা বন্ধ থাকবে। নৌযান চলাচলে এ ধরণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রকল্পটি অবশ্যই কিছু কৃতিত্বের দাবীদার। হিসাব করা হয়েছে যে বছরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন মালামাল বাঁধের উপরে ও নীচে পারাপার করা হবে। প্রতি টন ২ টাকা হারে পারাপারের ভাড়া ধরে প্রকল্পের বাৎসরিক আয় হবে ৫ লক্ষ টাকা।

২.ঙ: বনজ সম্পদ আহরনঃ

বাঁধ নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের একটা বড় অংশ ছিল দুর্গম, যেখানে কোন সময় জন মানবের পদচিহ্ন পড়েনি। কর্ণফুলী নদী ছাড়া যোগাযোগের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিলনা বলে এ সকল বনাঞ্চলের সম্পদ এতদিন যাবত আহরণ করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে মানুষের বনজ সম্পদ আহরণের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। বর্ষা মৌসুমে কর্ণফুলী নদীর বড় বড় শাখা নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে কিছু পরিমান বনজ সম্পদ আহরণ করা হত। তবে বনজ সম্পদ আহরণের এই সময়কাল প্রবল বন্যার কারণে কমবেশী

www.pathagar.com

হত। এলাকার চরম পাহাড়ী প্রকৃতির কারণে নদী এবং শাখা নদী সমূহের তীরের খুব সামান্য পরিমান অংশে প্রবেশ করা যেত।

এই জলাধার নির্মাণের পর প্রতিটি ছড়া এবং নালায় পানি ছড়িয়ে পড়বে। এতে বনবিভাগ এসব বনাঞ্চলের একটা ব্যাপক এলাকা থেকে বনজ সম্পদ আহরণে সক্ষম হবে। আশা করা হয় যে, এই জলাধার ৩৮০ মাইল দীর্ঘ নৌপথ সৃষ্টি করবে যা বছরের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত চালু থাকবে এবং যা বনজ সম্পদ আহরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে। জলাধার নির্মাণের পর বনজ সম্পদ আহরণের পরিমাণ প্রায় দশ গুন বেশী হবে এরূপ একটা আশা পোষণ করাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বার্ষিক বনজ সম্পদ আহরণের পরিমান কম করে ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন। এই পরিমান বনজ সম্পদের মধ্যে শুধুমাত্র চন্দ্রঘোনা সরকারী কাগজ কলের চাহিদার পরিমান ধরা হয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কাগজকল নির্মাণ করা হচ্ছিল। তাই এই কাগজ কলের লাভ-লোকসান এই জলাধার আগেভাগে নির্মাণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৩: কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকসমূহঃ

কর্ণফুলী প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিক হিসাবে যে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে সে দুটি হল জলাধারে নিমজ্জিত জমির পরিমাণ, এর আর্থিক ক্ষতির অংক এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সম্ভাব্য ক্ষতি।

৩.ক: কৃত্রিম প্লাবন (Submergence) ঃ

বাঁধ দ্বারা সৃষ্ট জলাধারে যে পরিমান এলাকা ডুবে যাবে তার আয়তন হিসাব করা হয়েছে ২১৩ বর্গমাইল। এই এলাকার ৭২ শতাংশ বা ১৫৩ বর্গমাইল হল নদীর তলদেশ, এবং অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল। বনাঞ্চল ডুবে যাওয়ার ফলে যে ক্ষতি হবে এই জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে বন এলাকার সুবিধা অনেক বেশী হবে। বাঁধে নিমজ্জিত চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে মাত্র ৩২,০০০ একর। যদি ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের অর্ধেকও কৃষি কাজে ফিরে যেতে চায়, তাদের জন্য জমির প্রয়োজন হয় ১৬,০০০ একর বা ২৫ বর্গমাইল। শিলছড়ি জলাধারে পানি ধারণ ক্ষমতা হিসাব করা হয়েছে ২৩৭০৩.৭ কোটি ঘনফুট। আর চিলাক ধাক জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা হয় মাত্র ৬০৯৮.৪ কোটি ঘনফুট। এতে সম্ভাব্য নিমজ্জিত কৃষি জমির পরিমান হয় মাত্র ৯৬০০ একর।

www.pathagar.com

চিলাক ধাক জলাধারের ৬১০০ কোটি ঘনফুট পানি ধারণ ক্ষমতা শিলছড়ি জলাধারে মাত্র ৬৭.৫ ফুট উচ্চতায় অর্জন করতে পারে। শিলছড়ি জলাধারের এই উচ্চতায় এলাকা ডুবে যায় মোট ৯৫.৬ বর্গমাইল, যার মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৯২২৫ একর। চিলাক ধাক জলাধারে যেখানে ১১৩ বর্গমাইল নিমজ্জিত এলাকার ৯৬০০ একর কৃষি জমি পড়ে, তার চাইতে শিলছড়ি জলাধারের অবস্থা অনেক বেশী সুবিধাজনক- যেখানে চিলাক ধাক জলাধারের বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৭.৫ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা, সেখানে শিলছড়ি জলাধারে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫.৫ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা। ৪৮ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ থেকে যে পরিমান সুবিধা পাওয়া যাবে তার সাথে ২২,৪০০ একর অতিরিক্ত চাষযোগ্য জমি নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারটা কিছুই নয়।

৩.খ: চট্টগ্রাম বন্দরঃ

বাঁধ নির্মাণের ফলে কর্ণফুলী নদীতে সমুদ্রের জোয়ারের পানি প্রবাহের স্থান সঙ্কুচিত হবে। চট্টগ্রাম বন্দরে তার কি প্রভাব পড়বে তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদিও জোয়ারের প্রভাব বাঁধের ৩৪ মাইল উজানে বিস্তৃত তথাপি নিম্নাঞ্চলের তুলনায় বাঁধের উজানে তা অনেক কম। তাই জোয়ারের পানি প্রবাহের উপর এই জলাধারের প্রভাব খুব সামান্যই পড়বে। অন্যদিকে সারা বছর গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ১৬ হাজার ঘনফুট পানি অবিরামভাবে নিষ্কাশনের ফলে বাঁধ পর্যন্ত নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, এতে চট্টগ্রাম বন্দরে পানির উচ্চতা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়বে।

৪: বাঁধের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

(১)	পানি আহরণ এলাকা (Catchment area)	৪২৫০ বর্গমাইল।
(২)	পানি আহরণ এলাকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত-	৯৮ ইঞ্চি।
(৩)	বৃষ্টির মোট পরিমাণ-	৯৬,৭৬১.২ কোটি ঘনফুট।
(৪)	নদীতে প্রবাহিত পানির গড় পরিমাণ-	৫২০০০ কোটি ঘনফুট।
(৫)	পানির ব্যবহারের গড় পরিমাণ-	৪২,৫০০ কোটি ঘনফুট।
(৬)	বাঁধের উপরিভাগের উচ্চতা (সমুদ্র পৃষ্ট থেকে)	১২৭ ফুট
(৭)	জলাধারের উচ্চতা-সমুদ্র পৃষ্ট থেকে	১০৮ ফুট।

www.pathagar.com

(৮) প্রতি সেকেন্ডে ৫২৫,০০০ ঘনফুট বেগে পানি প্রবাহের মত সর্ববৃহৎ বন্যায় জলাধারের চূড়ান্ত উচ্চতা- ১১৯ ফুট।

(৯) স্মরনাতীত কালের সর্ববৃহৎ বন্যায় প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ঘনফুট বেগে পানি প্রবাহের সময় জলাধারের স্বাভাবিক পানির উচ্চতা হবে- ১১৪ ফুট।

(১০) নদীর তলদেশের উচ্চতা- সমুদ্র পৃষ্ট থেকে ৫ ফুট।

(১১) নদীর তলদেশ থেকে পানির গভীরতা- ১০৩ ফুট।

(১২) বাঁধের উপরিভাগের দৈর্ঘ্য- ২০০০ ফুট।

(১৩) জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা-

(ক) ১০৮ ফুট পানির উচ্চতায়- ২৩৭৬৩.৭ কোটি ঘনফুট

(খ) সর্বোচ্চ ১১৯ ফুট পানির উচ্চতায়- ৩১১১৫.৩ কোটি ঘনফুট

(গ) সর্বনিম্ন ৬০ ফুট পানির উচ্চতায়- ৪৩৫৬ কোটি ঘনফুট

(১৪) নিমজ্জিত হবে এরূপ এলাকার আয়তন- ২১৩ বর্গ মাইল।

(১৫) Spill way এর (গেটের তলদেশের) উচ্চতা-সমুদ্র পৃষ্ট থেকে- ৯৩ ফুট।

(১৬) স্পিলওয়ে (গেটের উপরিভাগের) উচ্চতা- ১০৮ ফুট।

(১৭) স্পিলওয়ের মোট দৈর্ঘ্যঃ

(ক) বাম পার্শ্বের স্পিলওয়ে- ১০৫৬ ফুট

(খ) ডান পার্শ্বের স্পিলওয়ে- ৬৫০ ফুট

(১৮) বন্যার পানি নিষ্কাশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা- প্রতি সেকেন্ডে ৫২,৫০০ কোটি ঘনফুট।

৫: ক্ষতিপূরণঃ

আবাদি প্রতি একর কৃষি জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫০/০০ টাকা। চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের জমির জন্য যে হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় সেই হারেই ক্ষতিপূরণের এই হার নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বাড়ীর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০০/০০ টাকা।

৬: শিলছড়ি বাঁধ থেকে কাপ্তাই বাঁধঃ

জনাব খাজা আজিম উদ্দীনের উল্লিখিত প্রতিবেদনে কাপ্তাই থেকে তিন মাইল উজানে শিলছড়ি গিরিখাতের মুখে বাঁধ নির্মাণ করার প্রস্তাব করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত কাপ্তাই খালের মুখের কাছেই বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে সমাপ্ত হয়। কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বাঁধটি কাপ্তাই বাঁধ নামে এবং উক্ত বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট জলাধার কাপ্তাই হ্রদ নামে পরিচিত হয়। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ নির্মাণসহ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুন অর্থাৎ ৪৮ কোটি টাকারও অধিক ব্যয় হয়েছিল।

৭: পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতিতে কর্ণফুলী প্রকল্পের প্রভাবঃ

ক: ক্ষতির পরিমাণ ঃ

কাপ্তাই জলাধারে নিমজ্জিত এলাকার আয়তন ধরা হয়েছে ২১৩ বর্গমাইল। বাস্তবে জলাধারে নিমজ্জিত এলাকার পরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল থেকে ৩৫০ বর্গমাইল। আবার অনেকের মতে সর্বোচ্চ ৩৬৫ বর্গমাইল। জলাধারে নিমজ্জিত হবে এরূপ নীচু এবং সমতল কৃষি জমির পরিমাণ প্রকল্পের প্রতিবেদনে ধরা হয়েছিল ৩২,০০০ একর। প্রকৃত নিমজ্জিত কৃষি জমির পরিমাণ ৫৪,০০০ একর যা মোট কৃষি জমির ৪০ শতাংশ।

প্রকল্পের প্রতিবেদনে বাঁধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়নি। বাঁধ নির্মাণের পর ১২৫টি মৌজার মোট ১৮ হাজার পরিবারে ১ লক্ষ লোকের কৃষি জমি অথবা বসতবাড়ী ডুবে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। এই ১৮ হাজার পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার পরিবার নদী অববাহিকার সমতল এলাকার চাষী এবং বাকী ৮ হাজার পরিবার জুমিয়া।

Bangladesh District Gazetteer Chittagong Hill Tracts, 1975 গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কাপ্তাই জলাধারে যে ৫৪,০০০ একর কৃষি জমি ডুবে যায় তার পরিবর্তে জলাধারের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতার উপরে মাত্র ২১,৫২২ একর জমি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কাচালং সংরক্ষিত বনের ৪০ বর্গমাইল এলাকা আবাদ করে ১০,০০০ একর পাওয়া যায়। উক্ত জমি ৩৭৩৪ টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বাকী কৃষি জমি চেঙ্গী নদীর অববাহিকা এবং জলাধারের আওতা বহির্ভূত তৎকালীন রামগড় এবং বান্দরবান মহকুমায় পাওয়া যায়। পুনর্বাসনের জন্য আবাদ করা ছাড়াও সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সাড়ে ২৯ বর্গমাইল এলাকা জলাধারে ডুবে যায়। আর জলাধারে নিমজ্জিত অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চলের পরিমানই হচ্ছে ২৩৪ বর্গমাইল।

www.pathagar.com

৭.খ: পুনর্বাসন প্রকল্প (১৯৫৭–৬৬) ঃ

কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে রাজস্ব বিভাগ, কৃষি বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রনে একটি পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের কাজ ছিল বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জমি, ঘরবাড়ী এবং বাগানের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদান এবং তাদের জন্য জমি উদ্ধার ও পুনর্বাসন –এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত Post-Harvest technologist B. Grimwood প্রনীত Agriculture and Horticulture in Chittagong Hill tracts" নামক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই প্রকল্পের অধীনে কাপ্তাই বাঁধ এলাকার বাইরে ২০৩২১ একর জমি দিয়ে ৭৩৯৮ টি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। জন প্রতি ১ একর হিসাবে পরিবারের সদস্য সংখ্যানুপাতে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ১০ একর পর্যন্ত জমি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৭৬৭৬টি কৃষক এবং জুমিয়া পরিবারকে হ্রদ এলাকার নীচু পাহাড়ে ১২,৬১৫ একর জমি প্রদান করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে এই পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুসারে এ ই প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৪,০২০০০ টাকা। অবশ্য District Gazetteer, Chittagong Hill tracts, 1975 (Chapter VI, Economic Condition) অনুসারে উক্ত পুনর্বাসন প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৪১৪,৯০৫৪১.০০ টাকা।

৭.গ: অতিরিক্ত পুনর্বাসন প্রকল্প (১৯৬৬–৭৫) ঃ

৬২৩৯টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে একটি অতিরিক্ত পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ৮০০ একর নদী তীরবর্তী উঁচু সমতল জমি আবাদ করা হয় এবং ৩০০০ পরিবারকে মাছ ধরার নৌকা এবং জাল দিয়ে হ্রদ এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৩০ শে জুন সমাপ্ত এই পুনর্বাসন প্রকল্পে ১,০৪৭৯,০৭৯'০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৭.ঘ: কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়নঃ

এটা মূলতঃ একটি বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যতীত এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত সুবিধাদি পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন। এছাড়া কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ দুর্গম এলাকার সাথে নদীপথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, যার

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে কৃষি সম্প্রসারণ এবং পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, কর্ণফুলী প্রকল্পের দ্বারা কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রে মাত্র আংশিক সুবিধা হয়েছে। অন্যদিকে এই বাঁধ নির্মানের দরুণ পার্বত্য অঞ্চলের শতকরা ৪০ ভাগ উৎকৃষ্টতম কৃষি জমি ডুবে গেছে, যেখানে জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ বসবাস করত। শুধু তাই নয়, এতে ১৮,০০০ পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অথচ ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে জমির উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর এই চাপ প্রকট আকার ধারণ করে। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে জমির উপর কি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা অনুমান করা যায়। তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালে বার্ষিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬ শতাংশ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ এই হার ছিল ৩.৪। অথচ ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার ছিল মাত্র ১.৬৩ শতাংশ। বাঁধ নির্মাণের দরুণ বিস্তীর্ণ এলাকা নিমজ্জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি-এই দুই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি জমির উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের একটা বড় অংশ জীবনধারণের জন্য অধিক পরিমাণে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বাঁধ নির্মাণের দরুণ এই জেলার আদিবাসীদের বৃহত্তর অংশ এখন জুম চাষ করতে বাধ্য হচ্ছে বিধায় জুম চাষের জমিতেও টান পড়ে। বাঁধ নির্মাণের আগে জুমিয়ারা যেখানে ১২ থেকে ১৫ বছরের ব্যবধানে একই পাহাড় চাষ করত সেখানে এখন তারা ৩/৪ বছরের ব্যবধানে চাষ করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে একদিকে ভূমি ক্ষয় বেড়েছে। অন্যদিকে জুমে ফসল উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

এই বাঁধের দ্বারা আর যে বড় ক্ষতি হয়েছে তা হল বাঁধের পানিতে পুনর্বাসন এলাকার জমি নিমজ্জন। কাপ্তাই বাঁধের দ্বারা বাস্তুচ্যুত জনগণের একটা বড় অংশকে কাচালং পুনর্বাসন এলাকায় পুনর্বাসন করা হয় এবং তাদেরকে ১০,০০০ একর কৃষি জমি দেওয়া হয়। এটা কাপ্তাই হ্রদ এলাকার বাইরে সবচেয়ে বড় বসতি এলাকা। এই এলাকায় বাঁধের দ্বারা বাস্তুচ্যুত জনগণের বৃহত্তম বসতি কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে। শুধু এই একটা

www.pathagar.com

এলাকাতেই পুনর্বাসিতদেরকে ১০,০০০ একর কৃষি জমি প্রদান করা হয়েছে যা হ্রদ এলাকা বহির্ভূত কৃষি জমির ৫০ শতাংশ।

বাস্তুচ্যুত লোকদের সেখানে পুনর্বাসনের পর দেখা যায় যে, হ্রদের পানি যখন সর্বোচ্চ ১০৮ ফুট পর্যন্ত উঠে তখন এই এলাকার ৭০ শতাংশ জমি ডুবে যায় এবং কয়েকমাস যাবত পানির নীচে থাকে। সেখানে বর্ষা মৌসুমে চাষ করা যায় না। অথচ এসব জমি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১২০ ফুটের উপরে অবস্থিত ধরে নিয়েই পুনর্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। হিসাবে এই ভুলের জন্য কাচালং পুনর্বাসন এলাকার বাসিন্দাদের বৃহত্তম অংশ তাদের জমিতে আমন চাষ করতে পারেনা। কেবল শীত মৌসুমে একটা ফসল পায়।

এ প্রসঙ্গে পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম, আই চৌধুরীর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "Before the dam was constructed a thorough study of the area likely to be submerged by water, was made. But as the survey sheets, which were available, were not accurate and reliable, it misled the engineers. Therefore, after the dam was constructed and water held, it was found that about double the area was submerged than calculated.

Moreover, after the lapse of a period of time, it was found that more area of rich tropical forest were affected by capillary water. And the area thus affected was considerable....

Along the river vallies- Myni, kasalong, and kamafully, a large tract of agricultural land was also submerged. The settlements of the tribal people, Chakma, Murung, kokis, Tipras etc. were badly disturbed and they migrated to other places and resettled. (kaptai dam and Hydro- Electricity," Bangladesh observer, May, 27, 1974).

খাজা আজীম উদ্দীনের প্রতিবেদনে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে, ১,২০,০০০ কিলোওয়াট। প্রথমে ৩০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম ৪টি ইউনিট বসানো হয়। ৩০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি অতিরিক্ত ইউনিট বসানোর ব্যবস্থা রাখা হয়।

www.pathagar.com

বিদ্যুতের চাহিদার পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌছলে এই পঞ্চম ইউনিট চালু করার কথা। এই পাঁচ ইউনিটে বার্ষিক মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৭৩ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা। বাঁধের পানির ১০৮ ফুট উচ্চতায় ২৩,৭৬৩.৭ কোটি ঘনফুট মজুত পানি থেকে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হওয়ার পর এ যাবত ৪টি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছিল। কর্ণফুলী হ্রদ পরিচালনা কমিটির ২১-৪-১৯৮৫ সালের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে ইতিপূর্বে ১০৬ ফুট পানির উচ্চতায় সর্বোচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হত। ইতিমধ্যে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে তৃতীয় জেনারেটার বসিয়ে পঞ্চম ইউনিট চালু করা হয় এবং রুলকার্ভ নতুন ভাবে তৈরী করে পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা ১০৯ ফুট এবং সর্বনিম্ন উচ্চতা ৭৬ ফুট নির্ধারন করা হয়। উক্ত সংশোধিত রুল কার্ভ অনুসারে ১লা নভেম্বর ১০৯ ফুট এবং ১লা জুন সর্ব নিম্ন ৭৬ ফুট পানি হ্রদে থাকার কথা।

হ্রদ পরিচালনা কমিটির উল্লিখিত তারিখের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গের উচ্চতা ৬৬ ফুট। বিদ্যুৎ উৎপাদন চালু রাখার জন্য হ্রদের পানি সুড়ঙ্গ থেকে কমপক্ষে ১০ ফুট উপরে থাকা প্রয়োজন। তাই হ্রদের পানির উচ্চতা সর্বনিম্ন ৭৬ ফুট ধরা হয়েছে। উক্ত কার্য বিবরণীতে দেখান হয়েছে যে, সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ২৮,০০০ ঘন ফুট পানি প্রবাহিত না হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। প্রকল্পের বর্তমান ব্যবস্থাপক গত ২০-১১-৯১ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় জানান যে, সর্বোচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য হ্রদের পানির গড় উচ্চতা ৮৭ ফুট থাকা প্রয়োজন।

৮: বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সমস্যাঃ

খাজা আজিম উদ্দীনের প্রতিবেদনে কাপ্তাই বাঁধের অববাহিকায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ধরা হয়েছে ৯৮ ইঞ্চি এবং এই পানির মোট পরিমাণ ৯৬৭৬১.২ কোটি ঘনফুট। কিন্তু বৃষ্টিপাতের এই পরিমাণ সব সময় ঠিক থাকে না। তারতম্যের কারণে হ্রদের পানির উচ্চতা নির্ধারিত রুল কার্ভ অনুযায়ী রাখা যায়না। কম বৃষ্টির দরুণ যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত

www.pathagar.com

হয় তেমনি অতিবৃষ্টির দরুন অসময়ে বন্যা হয় এবং হ্রদ এলাকার ফসল নষ্ট হয়।

কাপ্তাই বাঁধের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৬ সালের ৪ঠা জুন তারিখে পানির সর্বনিম্ন উচ্চতা দাঁড়ায় ৬৩ ফুট। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর এটা পানির রেকর্ড পরিমাণ সর্বনিম্ন উচ্চতা (দৈনিক সংবাদ, ৫ই জুন ১৯৮৬ ইং সংখ্যা)। ঐ একই বছর ১২ই মে হ্রদের পানির সর্বনিম্ন উচ্চতা ছিল ৬৫.৩০ ফুট। হ্রদের পানির উচ্চতা এরূপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়ার দরুণ দুটি জেনারেটারে গড় ১০ মেগাওয়াট থেকে ৩০ মেগাওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়নি। (দৈনিক সংবাদ ১৩ই মে, ১৯৮৬ ইং এবং Bangladesh Times, 13th may, 1986)। ১৯৭৪ সালে সর্ব প্রথম কাপ্তাই হ্রদের পানির সর্বনিম্ন উচ্চতা ৬৬ ফুট নেমে যায়। কাপ্তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বর্তমান সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হল ১৪২ মেগাওয়াট (প্রাগুক্ত পত্রিকাদ্বয়)। অনাবৃষ্টির দরুণই হ্রদের পানির উচ্চতা এমনভাবে কমে যায়।

হ্রদের পানি এরূপ কমে যাওয়ার ফলে হ্রদ এলাকার বাসিন্দারা সর্বনিম্ন উচ্চতার প্রান্তিক জমিগুলি চাষ করে। কিন্তু নিম্ন উচ্চতায় হ্রদের পানি ধারণ ক্ষমতা কম থাকে বলে সামান্য বৃষ্টিতে এবং সর্বপ্রথম এসব এলাকা ডুবে যায়। এতে ফসল পাকার সময় পাওয়া যায় না। ফসল পাকার আগে জমি ডুবে যায় বলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন হ্রদ এলাকার প্রান্তিক জমির চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তখন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে হ্রদের পানি কমানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। প্রায় প্রতিবছরই বাঁধ কর্তৃপক্ষকে এরূপ একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। হ্রদ পরিচালনা কমিটির ২১-৪-৮৫ ইং তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে ৯০ ফুটের নীচে অবস্থিত প্রান্তিক জমি চাষ করার ব্যাপারে চাষীদেরকে নিরুৎসাহিত করা হবে। এসব জমিতে চাষ করার পর পানি বাড়ার যে সময় থাকে তা ফসল পাকার জন্য যথেষ্ট নয়। জমির উচ্চতা যত নীচু সহসা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশী।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর থেকে বিগত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বাঁধের পানি আহরণ এলাকায় প্রত্যাশিত এবং নির্ধারিত পরিমাণ বৃষ্টি না হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি কর্ণফুলী নদীর ভাটিতে নাব্যতা কমে যাচ্ছে। "পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা তথ্য কেন্দ্রের গতকালের রিপোর্ট অনুযায়ী রাঙ্গামাটিতে ১৯৮৫-র মে মাসে বৃষ্টি হয়েছিল ১০২.৮ মিঃ মিটার। এ বছরের মে মাসে

www.pathagar.com

হয়েছে ৫০.৬ মিঃ মিঃ। গত ১৬ই মে রাঙ্গামাটিতে ২১.৬ মিঃ মিঃ ১৭ই মেঃ ৩.৬ মিঃ মিঃ এবং ১৮ই মে ৬.১ মিঃ মিঃ বৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৬-র ১৮ই মে তে ছিল ১৯.৭৬ মিঃ মিঃ ("কাপ্তাই এলাকায় কেন বৃষ্টি হচ্ছেনা"। দৈনিক সংবাদ, ১৯শে মে, ১৯৮৭)

দৈনিক সংবাদ, ৫ই জুন, ১৯৮৬ ইং পূর্ব উল্লিখিত সংখ্যার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গত এক দশকের (১৯৮৬ ইং এর পূর্বে) মধ্যে ১৯৭৬ ইং ১৪১.৩৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এটাই এই দশকের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। অথচ কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প স্বাভাবিকভাবে চালু রাখার জন্য বার্ষিক বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ১২০ ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন। কাপ্তাই বাঁধের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা ১০৯ ফুট নির্ধারিত হলেও গত কয়েক বছর (১৯৮৬ ইং এর পূর্বের) ধরে পানির উচ্চতা এক্শ ফুটের নীচে অবস্থান করছিল। (কাপ্তাই হ্রদে পানি নিম্নতম স্তরে, "দৈনিক সংবাদ ৫ ই জুন, ১৯৮৬ ইং)। বৃষ্টিপাতের এই অনিশ্চয়তা তথা খরা অবস্থার জন্য কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সারা বছর সমপরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছেনা। এক কথায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কোন বছরই অর্জন করা সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়া কর্ণফুলী নদীর ভাটিতে নাব্যতা বৃদ্ধি করাও সম্ভব হচ্ছেনা।

৯: পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতিতে কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবঃ

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ (১৯৬১ আদমশুমারীর সময় ৩৮৫,০০০)। এই জনসংখ্যার প্রায় ৮২ শতাংশ উপজাতীয় জনগোষ্ঠিভূক্ত। ১৯৫১ সালে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৮৭,২৭৪ জন। এরমধ্যে উপজাতীয় জনসংখ্যা হল ৯১ শতাংশ। আর ১৯৭৪ ইং সালে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫০৮০০০। এদের শতকরা ৭৩ ভাগ ছিল উপজাতীয় জনগোষ্ঠিভূক্ত। বলাবাহুল্য, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য জেলার লোক অবাধে বসতি স্থাপন করতে থাকে। তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই অধ্যায়ের অন্যত্র দেখান হয়েছে)। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাঁধ নির্মান জনিত কারণে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এই জেলার জনগণের বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয়দের দুর্দশা বেড়ে যায়। অথচ এক সময় তাদের অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল।

কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবনে যে দুর্দশা নেমে আসে, তা তারা নিশ্চয়ই সহজে মেনে নেয়নি। কিন্তু তৎকালে

www.pathagar.com

এই জেলায় কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক তৎপরতা ছিলনা বলে এই বাঁধের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৬৪ সালে লংগদু এবং বরকল ও বাঘাইছড়ি থানার কাচালং পুনর্বাসন এলাকা থেকে প্রায় ৩৫ হাজার উপজাতীয় লোক ভারতে চলে যায়। তারা প্রথমে মিজোরাম, পরে ত্রিপুরারাজ্য এবং আসামে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে তাদেরকে ভারতের বর্তমান অরুণাচল রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা বর্তমানে সেখানেই বসবাস করছে। এই বিপুল সংখ্যক উপজাতীয়ের দেশত্যাগ কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে তাদের একটা প্রতিবাদ বৈ কিছুই নয়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, বাঁধ নির্মানের পরও যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়ে গেছে তারা কাপ্তাই বাঁধ নির্মান পরবর্তী দুর্দশাকে অবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রতিবাদ করতে না পারায় তাদের মনে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটার ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বেড়ে যায়। তারা কাপ্তাই বাঁধকে উপজাতীয়দের মরণফাঁদ হিসাবে দেখতে আরম্ভ করে।

কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আরও একটা কারণ হল, জায়গা জমি এবং বাড়ীর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। কৃষি জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছিল একর প্রতি ২৫০/০০ টাকা এবং ঘরবাড়ীর জন্য গড়ে ৪০০/০০ টাকা। তখনকার দিনে উপজাতীয়রা বসতবাড়ীর ভিটা পর্যন্ত বন্দোবস্ত নিতনা বলে ক্ষতিপূরণ পায়নি। শুধু বাস্তভিটার আশেপাশে রোপিত গাছ-বাঁশের ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। কর্ণফুলী পেপার মিলের জন্য হুকুম দখলকৃত জমির জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে কাপ্তাই প্রকল্প এলাকার কৃষি জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছিল বলে কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্ণফুলী কাগজকল যেখানে স্থাপন করা হয়েছে সেখানে কোন কৃষি জমি ছিলনা। সুতরাং সেখানে কৃষি জমির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উপজাতি বিদ্রোহ শুরু হয় কাপ্তাই বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট অসন্তোষ, তার অন্যতম প্রধান কারণ।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মাটি ও ভূমি ব্যবহার জরিপ (১৯৬৪–৬৬) ঃ

কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি, বিশেষতঃ কৃষি জমির সংকট সৃষ্টি হয় তা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহসা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং তারা এই অঞ্চলের মাটি ও ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে একটি ব্যাপক জরিপ কাজ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ ধরণের একটি জরিপ পরিচালনার জন্য ১৯৬৪ সালে কলম্বো পরিকল্পনার অধীনে কানাডীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে কানাডীয় কোম্পানী FORESTAL FORESTRY AND ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED কে নিযুক্ত করে। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত জরিপ চালিয়ে উক্ত কোম্পানী ১৯৬৬ সালের মে মাসে "SOIL AND LAND USE SURVEY, CHITTAGONG HILL TRACTS" নামে মোট নয় খন্ডে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে।

Forestal এর প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে GEOMORPHOLOGY AND GEOLOGY শিরোনামের SOILS AND CAPABILITY উপ শিরোনাম অংশে মাটির আকৃতি, ব্যবহারের উপযোগিতা, উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিকে মোট ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যার একটি হল মিশ্র। ভূমির ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা A থেকে D পর্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান হারে বেড়ে যায় ("The system of land capability classification adopted for the hill Tracts places all lands in one of five capability classes; one of this is mixed class. The limitations in use become progressively greater from class A to class D").

'A' শ্রেনীর জমিঃ এই শ্রেণীর জমির ব্যবহারে তেমন সীমাবদ্ধতা নেই। এই শ্রেণীর অধিকাংশ জমি বিভিন্ন জাতের ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত এ ধরণের জমির ক্ষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। মাটির গভীরতা বেশী, ব্যবহার সহজ এবং পানি ধারণ ক্ষমতা ভাল। ধান উৎপাদন এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদনে এর ব্যবহার এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু এই অঞ্চলে ধান

www.pathagar.com

জমি সবচেয়ে বেশী মূল্যবান বিবেচনা করা হয়। এই কারণে সব ধান্য জমি 'A'শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। এই 'A'শ্রেণীর মোট জমির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে ৭৬,৪৬৬ একর যা জরিপকৃত জমির শতকরা ৩.২ ভাগ।

'B' শ্রেণীর জমিঃ এই শ্রেণীর জমি ব্যবহারে মাঝারি ধরণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে এই জমিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসল নির্বাচনের সুযোগ কম। এমনকি ভূমির অবস্থার অবনতি রোধ করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর ভূমির ব্যবহারের বাধাসমূহ হল, শতকরা ২০ ভাগ পর্য্যন্ত ঢালুত্ব এবং ভূমির ক্ষয় প্রবণতা। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ অথবা বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার অথবা গোবর জাতীয় সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর মোট জমির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬৭,৮৭১ একর।

'C' শ্রেণীর জমিঃ এই শ্রেণীর ভূমি ব্যবহারে কঠোর সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, যার প্রেক্ষিতে ফসল নির্বাচনের সুযোগ একেবারে কম অর্থাৎ বিশেষ এবং শক্তিশালী ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ভূমি ব্যবহারে অসুবিধাগুলি হল, শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত ঢালুত্ব, উচ্চ হারে ভূমি ক্ষয় প্রবণতা, নিম্নমানের আদ্রতা ধারণ ক্ষমতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গাছপালার শিখর স্থাপন এলাকার অগভীরতা। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ অথবা বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার এবং গোবর জাতীয় সার ব্যবহারের প্রয়োজন। এই শ্রেণীর জমির পরিমান হিসাব করা হয়েছে ৩৬৬,৬২২ একর (শতকরা ১৫.৫ ভাগ)।

C-D শ্রেণীর ভূমিঃ এই C-D শ্রেণীর জমিতে C এবং D শ্রেণী এলাকা অতি ক্ষুদ্র ইউনিটে বিদ্যমান থাকায় এই দুই শ্রেণীর ভূমিকে আলাদা আলাদাভাবে দেখান সম্ভব নয়। এই শ্রেণীর জমির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে ৩২,০২৪ একর (শতকরা ১.৪ ভাগ)।

D শ্রেণীর ভূমিঃ এই শ্রেণীর ভূমির ব্যবহার এত বেশী সীমাবদ্ধ যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসল নির্বাচনের সুযোগ নেই বললেই চলে। এই জমিকে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ পরিচর্য্যা প্রয়োজন। ফসল উৎপাদনে এই জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা রয়েছে সেগুলি হল, ভূমির চরম খাড়া অবস্থান, অধিক ক্ষয় প্রবণতা, নিম্ন মাত্রার আদ্রতা ধারণ ক্ষমতা এবং কোন কোন এলাকায় মাটির স্বল্প গভীরতা। উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ অথবা বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার এবং গোবর জাতীয় সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বৃক্ষ রোপনই 'D' শ্রেণীর জমির সর্বোত্তম ব্যবহার

www.pathagar.com

হিসাবে বিবেচিত হবে। এই জমির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৮১৬৯৯৩ একর (৭৭ শতাংশ)। উল্লেখ্য যে, ফরেষ্টাল কোম্পানি সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সম্পূর্ণ অশ্রেণীভূক্ত বন এলাকা, যার পরিমাণ ২,৩৫৯,৯৭৬ একর বা ৩৬৮৭.৪৬ বর্গমাইল, জরিপ করেছে। তবে কাপ্তাই হ্রদের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতায় যে পরিমাণ জমি ডুবে যায়, তা জরিপের আওতায় আনা হয়নি।

ফরেষ্টাল কোম্পানী জরিপের পর এই সিদ্ধান্তে আসে যে, যদি সরকারের পক্ষ থেকে পর্য্যাপ্ত সাহায্য প্রদান করা হয় তাহলে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক কৃষি উন্নয়ন বাস্তবে এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব। উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হতে হবে শ্রমশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, পাহাড়ী জমিতে অনাবৃষ্টি রোধক বৃক্ষের বাগান সৃষ্টি, নদীসমূহ এবং হ্রদের তীরে ধান ভিত্তিক একাধিক ফসল উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ, ভূমি ক্ষয় রোধ এবং পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার পদ্ধতির সর্বাধিক উন্নয়ন। ফরেষ্টাল কোম্পানীর প্রতিবেদনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি মালিকদের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে রাবার, কফি, কাজু বাদাম এবং এসব বাগানে আনারস ও কলাজাতীয় স্বল্প মেয়াদী ফসল উৎপাদনের সুপারিশ করা হয়েছে। ফরেষ্টালের প্রতিবেদনে, ক্ষুদ্র মালিকদের জমির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০ একর।

ফরেষ্টাল কোম্পাণীর প্রতিবেদন এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার তৎকালীন কৃষি উন্নয়ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প

১ঃ মহা–পরিকল্পনা

তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ফরেষ্টাল কোম্পানীর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮–৬৯ সালে এই মহা–পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। তবে ফরেষ্টাল কোম্পানীর সুপারিশ এই পরিকল্পনায় পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়নি। এই পরিকল্পনায় কাপ্তাই হ্রদ এলাকার ৫১টি মৌজার ৬৬,০০০ একর জমিতে ১১,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রস্তাব করা হয়। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮১,৯৬০০০ টাকা। পরিকল্পনা মতে, পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত এলাকায় বসানো এবং ফলের বাগান গড়ে তোলার জন্য প্রতি পরিবারকে ৬ একর জমি প্রদান করা।

মহা–পরিকল্পনায় যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় সেগুলি ছিল নিম্নরূপ–

"(১) উপজাতীয় জনগণ যাতে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার জনগণের সাথে সম পর্য্যায়ে থেকে প্রতিযোগিতা করতে পারে তজ্জন্য তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন,

(২) আস্তে আস্তে জুম চাষের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনা,

(৩) জুম চাষ বাদ দিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফলের চাষ করে শক্ত ভিত্তির উপর একটা উপজাতীয় অর্থনীতি তৈরী করা,

(৪) কর্ণফুলী বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন,

(৫) যাতে দ্রুত বর্ধমান স্থানীয় জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়, এমন পরিমাণ জমি প্রদান করা যায় এবং যাতে সমবায় বিপনন সংস্থার মাধ্যমে অভ্যন্তর ভাগে উৎপাদিত পন্যসমূহ লাভজনকভাবে বিপনন করা যায় তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অভ্যন্তর ভাগকে যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা এবং

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রামের অনাবিষ্কৃত বিপুল সম্পদকে আবিষ্কার বা আহরণ করা যা দেশের অর্থনৈতিক সম্পদকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করবে।"(উদ্ধৃতি বি, গ্রিমউডের)।

মহা–পরিকল্পনার অধীনে ৬ একর পরিমিত আদর্শ ফলের বাগান গড়ে তোলাই প্রকল্পের মূল কাজ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। এই আকারের

www.pathagar.com

ফলের বাগান ৬-সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়। দুবছর মেয়াদে একটি আদর্শ ফলের বাগান গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে নগদে এবং ফলের চারা ও সারের দাম বাবদে ৫৫০০/০০ টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। এই ঋণ ১০ টি সমান কিস্তিতে ১০ বছরে পরিশোধযোগ্য। তবে বাগান গড়ে তোলার সময় যে তিন বছর সময় লাগবে ঐ সময়ে ঋণের কোন কিস্তি শোধ করতে হবেনা।

২: অর্জিত ফলাফলঃ

ক. ১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত ৪৫টি মৌজায় এই প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণভার বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালে এই প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ নবগঠিত উদ্যান উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় চলে যায়।

১৯৬৮-৬৯ থেকে ১৯৭২-৭৩ সালে ১৭০২ পরিবারকে ১০,০৬১ একর জমিতে এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে নগদে ৩৯,১১,০০০/০০ টাকা এবং ৩২,৫৯,০০০/০০ টাকা চারা, সার ও অন্যান্য সামগ্রীর দাম বাবদে। এদের মধ্যে ৪১টি পরিবার তাদের বাগান ছেড়ে চলে গেছে। অর্থের অভাবে ১৯৭২-৭৩ সালের পর নতুন কোন বাগান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে বিদ্যমান বাগানগুলি গড়ে তোলার কাজ শেষ করা হয়েছে।

খ. প্রকল্পের সম্প্রসারণ সার্ভিসঃ বাগান মালিকদের পরামর্শ দানের জন্য প্রকল্পের অধীনে মৌজা উদ্যান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ৩ জন আঞ্চলিক সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এসব কর্মকর্তার তত্বাবধান করেন। তবে ৩৬০ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ এলাকায় গড়ে তোলা বাগান পরিদর্শন করার যানবাহনের সুযোগ সুবিধা প্রকল্পের সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পর্য্যাপ্ত নয়।

৩: সংশোধিত প্রকল্প ঃ

১৯৭৬ সালের জুন মাসে কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে একটি সংশোধিত প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব পেশ করা হয়। এতে শতকরা ৫

www.pathagar.com

টাকা হার সুদে ১০ বছর মেয়াদে ১০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য প্রতি পরিবারকে ৬৫০০/০০ টাকার একটি ঋণ প্রদানের প্রস্তাব রাখা হয়। এই ফলের বাগানও আগের নিয়ম মতে ৬ একর পরিমাণ পাহাড়ী জমিতে গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। বাগানকারীরা যাতে তাদের পূর্বের বাগান থেকে আনারস এবং কলার চারা নতুন বাগানে রোপন করতে পারে সেই জন্য ধাপে ধাপে বাগান গড়ে তোলার কর্মসূচী ও এতে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সালের ২০ শে অক্টোবর এক অধ্যাদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা এই অঞ্চলের যাবতীয় কর্মকান্ড এর উপর ন্যস্ত করা হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত এর কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে যায়।

৪: উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা মূল্যায়নঃ

১: অববাহিকা স্বল্প উচ্চতার সমতলভূমির কৃষিঃ

পার্বত্য অঞ্চলের সমতল এবং কম উচুঁ-নীচু জমিগুলি সম্পূর্ণরূপে পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং নদী অববাহিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই শ্রেণীর মোট জমির পরিমান হল ৭৬,৪৬৬ একর (শতকরা ৩.২ ভাগ)। এই শ্রেণীর সব জমি বর্তমানে ব্যাপকভাবে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনসংখ্যার ব্যাপক অংশের জন্য খাদ্যশস্যের যোগান দিচ্ছে। তাই কৃষির জন্য নতুন কোন জমি অবশিষ্ট নেই।

এই অববাহিকা এলাকায় ফসল উৎপাদন মূলতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ এবং ডিজেল চালিত পাম্প দ্বারা উত্তোলন করে এসব জমিতে পানি সেচ করা হয়। কিন্তু এই সেচ পদ্ধতি একটা অতি আদিম পদ্ধতি। তাই এসব জমিতে ফসল উৎপাদন প্রধানতঃ বর্ষা মৌসুমে এবং তৎপরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ধানই এসব এলাকায় উৎপাদিত প্রধান ফসল। সাধারণভাবে, ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কম। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ, সার ব্যবহার অথবা চারা সংরক্ষণ এবং জমি কর্ষন সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থাদি এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি।

কাপ্তাই হ্রদের পানি যখন এর সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে কম থাকে, (৩০ ফুট থেকে ৩৫ ফুট) তখন পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং গড় মানের থেকে কিছুটা উন্নতমানের ব্যাপক পরিমাণ চাষোপযোগী জমি ভেসে উঠে। এসব

www.pathagar.com

জমির কিছু অংশ ফসল উৎপাদনে বিশেষতঃ ধান উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। মাটির অবশিষ্ট আদ্রতা এবং শরতের বৃষ্টির ফলে এসব ফসলের বৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য কাচালং পুনর্বাসন এলাকায় হাতে এবং শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সেচ করা হয়। হ্রদ এলাকার কৃষি জমির পরিমাণ এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হ্রদ পরিচালনার উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। এক সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, হ্রদের পানি ৮০ ফুট এবং সর্বোচ্চ ১০৯ ফুট উচ্চতার মধ্যে ৪৩,৬২১ একর চাষোপযোগী জমি ভেসে উঠে।

Post-Harvest Technologist B Grim wood তাঁর পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে নির্ধারিত সময়ের আগে এবং ভবিষ্যতে হ্রদের পানির উচ্চতা হ্রাস করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধাদির সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস-জনিত ক্ষতির তুলনা করার জন্য হ্রদের পানি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উচ্চতার মাঝখানে বিভিন্ন স্তরে পার্শ্ব রেখা সম্বলিত মানচিত্র তৈরী করার সুপারিশ করেছেন।

৫: মধ্যম শ্রেণীর মাটিতে ফলের চাষঃ

উপ-পুনর্বাসন এবং উদ্যান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আলোচনা করা হয়েছে। এসব প্রকল্প মাত্র আংশিক সফল হয়েছে। বাগানকারীদের অল্পসংখ্যকই শুধু বাগানের ফসল বিক্রি করে তাদের পরিবার ভরণ পোষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

তাদের অধিকাংশই বেঁচে থাকার জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় রাস্তা নির্মাণ কাজে শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত এবং অতিরিক্ত পেশা হিসাবে জুম চাষে প্রবৃত্ত হয়েছে। সাধারণভাবে বাগানের উৎপাদন কম, সম্প্রসারণ সেবা অপ্রতুল। ঋণ এবং বিপনন সুবিধা বাস্তবে নেই বললেই চলে।

বহু বাগানকারী পাহাড়ের ঢালে ফলের চারা রোপনের মৌলিক নিয়মও অনুসরণ করেনি। অনেক বাগানে পাহাড়ের ঢালু অংশের উপর থেকে নীচের দিকে তৈরী করা আনারস এবং কলার চারা সারি দেখা গেছে।

মাটি কর্ষন অনেক ক্ষেত্রে খুব অগভীর এবং সার খুব কম পরিমানে ব্যবহার করা হয়েছে।

কলা এবং আনারস-এ দুটিই প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করা হয়েছে। কাজু বাদাম, কাঁঠাল এবং আমও ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় ছাত্র ও যুবকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা পোষন করে। কিন্তু তৎকালিন স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপজাতীয় ছাত্র এবং যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দান এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের সামিল করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাননি। কিছু উপজাতীয় ছাত্র এবং যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তাদের প্রতি স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এই ধরনের শীতল আচরণে অনেক উপজাতীয় ছাত্র এবং যুবক হতাশ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তবে চাকমা রাজ পরিবারের অন্যতম সদস্য কে, কে, রায় এবং মংরাজা মংপ্রুসাইন ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সাথে কোন যোগাযোগ না থাকার কারণে চাকমা উপজাতীয় প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আত্মগোপন বা দেশত্যাগ না করায় পরিস্থিতির শিকার হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা ছিলনা, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভকালীন সময়ে ভাবাবেগের রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ ছাড়া কোন পরিপক্ক রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ তখনকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ফলে পার্বত্যবাসীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উজ্জীবিত করার কোন বাস্তব পদক্ষেপও গৃহীত হয়নি। পাশাপাশি তৎকালিন পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পাকিস্তানী প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি জনিত কারণে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপজাতীয়দের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত করতে অনেকটা সন্দেহই প্রকাশ করেছিলেন। এ অবস্থায় তৎকালিন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়-এর পক্ষে সমগ্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি জড়িত হওয়ার আহ্বান জানানোর মতো দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিতে তৎকালিন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে স্থানীয় বাঙালীদের পরামর্শে ও অনুরোধে রাজা ত্রিদিব রায় পাক সেনাদের

www.pathagar.com

সাথে যোগাযোগ করেন। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে তৎকালিন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ রাজা ত্রিদিব রায়কে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কাজে ব্যবহার করেন। তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন, যদিও তিনি দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোন সক্রিয় ভূমিকা নেননি। এছাড়া তৎকালিন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ উপজাতীয় তরুণদের নিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করেন। তৎকালিন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের দিয়ে অনেকটা জোর করে উপজাতীয় যুবকদের দ্বারা এসব বাহিনী বিশেষতঃ রাজাকার এবং সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করা হয়েছিল।

তবে উপজাতীয় যুবকদের দ্বারা গঠিত এসব বাহিনী নারী ধর্ষন, লুটতরাজ ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়নি।

চাক্‌মা উপজাতীয় প্রধান রাজা ত্রিদিব রায়ের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা এবং উপজাতীয় যুবকদের একটি অংশ কতিপয় বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের অজুহাতে মুক্তিযোদ্ধারা পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন আসালং, বড়বিল, তাইন্দ্যং এবং তবুলছড়ি মৌজায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ফলে এসব এলাকার উপজাতীয়রা বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, খাগড়াছড়ি এবং মহালছড়ি উপজেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও নিজ নিজ ভিটা মাটিতে ফিরে যেতে পারেনি।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর যে দলটি মাটিরাঙ্গা উপজেলা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে (বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলা) প্রবেশ করে, সে দলটি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করার অভিযোগে বর্তমান পানছড়ি এবং দীঘিনালা উপজেলায় বেশ কয়েকটি উপজাতীয় গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় ও কিছু সংখ্যক উপজাতীয় পুরুষ ও যুবককে হত্যা, অসংখ্য উপজাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যথা, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মৌজা হেডম্যান এবং সরকারী কর্মচারীকে মারধোর করে। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের এ ধরনের উপজাতি বিরোধী সহিংস এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি হয়। তৎকালিন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী, বিশেষতঃ ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবী যে সকল বাঙালী যুবক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন সে সকল বাঙালী যুবকদের একটি অংশ এলাকায় ফিরে এসে উপজাতি বিরোধী এসব সহিংস তৎপরতায়

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দেন। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এধরণের সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে উপজাতীয়দের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের জায়গা জমি বেদখল করা। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর এই উপজাতীয় বিরোধী তৎপরতায় উপজাতীয়রা প্রাথমিকভাবে সন্ত্রস্থ ও হতচকিত হলেও তারা শীঘ্রই সম্বিত ফিরে পায়। আত্মরক্ষার তাগিদে কিছু উপজাতীয় যুবক নিজেরা সংগঠিত হয়ে উপজাতীয় রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সিভিল আর্মড ফোর্সের যে সকল সদস্য অস্ত্রসহ জংগলে পালিয়ে যায়, তাদেরকে সংগঠিত করে পরবর্তী কালে শান্তিবাহিনী গঠন করে।

উপজাতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব এবং সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ উপজাতি গ্রামে অগ্নিসংযোগ এবং উপজাতি নিধনের ন্যায় মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়। উপজাতীয় নেতাদের বিশেষতঃ নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয়তা বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের উপজাতি বিরোধী তৎপরতার জন্য কিয়দংশে দায়ী। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উপজাতীয় জনগণকে সংগঠিত করতে পারলে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধারা উপজাতি বিরোধী তৎপরতা চালানোর অজুহাত খুঁজে পেতনা। ভুল নেতৃত্বের মাশুল শেষ পর্যন্ত সাধারণ উপজাতীয় জনগণকেই দিতে হয়েছে। পাকিস্তান আমলে যেমন পাকিস্তান বিরোধী (ভারত পন্থী), তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশেও উপজাতীয়দের গায়ে বাংলাদেশ বিরোধী লেবেল এঁটে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও জনসংহতি সমিতির উত্থান

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে উপজাতীয় জনগণ আওয়ামীলীগ বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিল না। কেবল মাত্র কয়েকজন উপজাতীয় নেতা আওয়ামীলীগের এবং মুষ্ঠিমেয় উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া তৎকালিন পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠন হিসাবে আওয়ামীলীগের ভিত্তি ছিল দুর্বল। ১৯৭০ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলই এর প্রমান। সেই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে দুজন উপজাতীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং জাতীয় পরিষদে একজন উপজাতীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামীলীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের মার্চে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামেও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে। সাংগঠনিকভাবে আওয়ামীলীগ দুর্বল ছিল বিধায় স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতা এবং কর্মীরাও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা আওয়ামীলীগকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। জেলা আওয়ামীলীগ নেতা জনাব সৈয়দুর রহমান আওয়ামীলীগে তার নেতৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের উপজাতীয়দের আনুগত্যের প্রশ্ন তুলেন। স্থানীয় প্রশাসনের একটা অংশও মুক্তিযুদ্ধে এই অঞ্চলের উপজাতীয়দের কোন ভূমিকা দেখতে চাননি। তাই তারা উপজাতীয়দের ব্যাপক অংশকে মুক্তিযুদ্ধে সামিল করার পরিবর্তে তাদেরকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এহেন উপজাতি বিরোধী আচরণে স্বাভাবিকভাবেই উপজাতীয়দের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু কিছু এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপজাতি বিরোধী ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের (উপজাতীয়দের) পরিণতি সম্পর্কে উপজাতীয় নেতাদেরকে ভাবিয়ে তোলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকায় হতাশ এবং ক্ষুদ্ধ হয়ে কোন কোন উপজাতীয় নেতা ভবিষ্যৎ আত্মরক্ষার পন্থা খুঁজতে থাকেন। তাই মুক্তিযুদ্ধের সময় উপজাতীয় যুবকদের দিয়ে যখন মুজাহিদ এবং সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করা হয় তখন এসব উপজাতীয় নেতারা খুব একটা আপত্তি করেননি। এমনকি কোন কোন উপজাতীয় নেতা এসব

www.pathagar.com

বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য উপজাতীয় যুবকদেরকে পরোক্ষে ইংগিতও দিয়েছিলেন। এসব উপজাতীয় নেতারা চেয়েছিলেন যে, উল্লিখিত বেসামরিক বাহিনীসমূহে যোগ দিয়ে উপজাতীয় যুবকরা সামরিক প্রশিক্ষনের সুযোগ গ্রহণ করুক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন মুক্তিবাহিনী উপজাতীয় গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং আত্মসমর্পনকারী উপজাতীয় রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী এবং সিভিল আর্মড ফোর্সের সদস্যসহ উপজাতীয় নারী পুরুষকে হত্যা করতে থাকে, উপজাতীয় যুবকদের ঐসব বাহিনীতে যোগদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তখন উপজাতীয় ছাত্র এবং যুবকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। কতিপয় উপজাতীয় নেতা কর্তৃক উপজাতীয় যুবকদেরকে বাংলাদেশ বিরোধী বিভিন্ন বেসামরিক প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যোগদানে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করার মত ভুল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা উপজাতীয় জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক তৎপরতা চালানোর অজুহাত খুঁজে পেয়েছে বলে উপজাতীয় ছাত্র এবং তরুণরা তখন অভিযোগ করেছিল।

উপজাতীয় যুবকদেরকে বাংলাদেশ বিরোধী বিভিন্ন বেসামরিক বাহিনীতে যোগদানে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লগ্নে উপজাতীয় নেতারা উপজাতীয়দের বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হন, তার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য কতিপয় উপজাতীয় নেতা এবং ছাত্রনেতা অস্ত্রসহ আত্মগোপনকারী রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী এবং সিভিল আর্মড ফোর্সের সদস্যদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারা পাকবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করে নেয়। এভাবে তাদের ভান্ডারে যথেষ্ট পরিমান অস্ত্র জমা হয়। রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করায় আত্মগোপনকারী সশস্ত্র উপজাতীয় যুবকরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে উঠে।

ক: শান্তিবাহিনীঃ

পরবর্তীকালে এসব আত্মগোপনকারী উপজাতীয় যুবকরাই সমগ্র পার্বত্যাঞ্চলে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে শান্তিশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নেয়। তারা গ্রামাঞ্চলে সব চোর ডাকাত নির্মূল করে চুরি ডাকাতি বন্ধ করে। শান্তিশৃংখলা রক্ষা এবং গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তা বিধানে তাদের এই সাফল্যে খুশী হয়ে জনগণ তাদেরকে শান্তিবাহিনী নাম দেয়। তখন থেকে তারা শান্তিবাহিনী নামে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে।

খ: জুমিয়া থেকে জুম্ম্য ঃ

একসময় তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতীয় বাসিন্দা পাহাড়ের ঢালু অংশ পরিষ্কার করে বিশেষ এক ধরণের চাষ করতেন। এ ই

www.pathagar.com

বিশেষ ধরণের চাষকে স্থানীয়ভাবে জুম চাষ বলা হত। সকল উপজাতীয় বাসিন্দা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত বিধায়, পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলার বাঙালীরা জুমিয়া শব্দকে বিকৃত করে তাদেরকে 'জুম্ম' বলত। জুম্ম বলতে তারা সাধারণভাবে অশিক্ষিত এবং অনুন্নত জাতির মানুষ বুঝাত। উপজাতীয়রা অবশ্য জুম্ম কথাটা বিদ্রুপাত্মক এবং সে কারণে অবমাননাকর বলে মনে করত এবং তাদেরকে এই নামে আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। এমনকি অতীতে বাঙালীদের সাথে এ ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি এবং মারামারি পর্যন্ত ঘটেছে।

উপজাতীয় জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করার এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তাদের আনুগত্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হওয়ার কারণে তখন থেকেই উপজাতীয়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষালগ্নে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রতিহিংসামূলক তৎপরতা উপজাতীয়দের এই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করে।

উপজাতীয় জনগণকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস হিসাবে মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তু লার্মা এবং তাদের অনুসারী উপজাতীয় ছাত্রদের একটা অংশ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে মনে করে "জুম্ম" আখ্যা দেন। এককালে সব উপজাতির লোকেরা জুম চাষ করত বলে তাদের সকলের সাধারণ নাম হিসাবে এই "জুম্ম" শব্দকে সম্প্রসারিত করে পরবর্তীকালে 'জুম্ম জাতি' করা হয়।

গ: চার দফা দাবী নামাঃ

মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত প্রতিহিংসামূলক ঘটনার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় উপজাতীয় নেতা মংরাজা মংপ্রু সাইনের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তিনি জরুরী কাজে বাইরে থাকায়, প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। তবে তার জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে প্রতিনিধিদল ৪টি দাবী সম্বলিত একটি দাবীনামা রেখে আসে। প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা, জনাব কে, কে, রায়, মিসেস বিনীতা রায়, বর্তমান বোমাং রাজা, জনাব

www.pathagar.com

সুবিমল দেওয়ান এবং বর্তমান লেখক প্রতিনিধিদলে ছিলেন। উক্ত ৪ দফা দাবীনামার প্রথম দাবী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র এলাকা ঘোষণা করে এর জন্য স্বায়ত্বশাসন প্রদান (দাবীনামা পরিশিষ্ট-ঙ -তে দেওয়া হয়েছে)।

এদিকে ১৯৭২ সালের ২৯শে জানুয়ারী চারু বিকাশ চাক্‌মার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেন যে, সরকারী চাকুরীতে উপজাতীয়দের ন্যায্য অংশ প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব আরও আশ্বাস দেন যে, উপজাতীয়দের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরাপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। উপজাতীয়রা তাদের ভূমির অধিকার পূর্বের মতই ভোগ করতে থাকবেন।

ঙ: জনসংহতি সমিতির জন্মঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হয়ে মংরাজার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল রাঙ্গামাটি ফিরে আসে। ৪ দফা দাবীনামা আদায়ে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা উপজাতীয় জনগণকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালের ২৪শে জুন তারিখে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় নেতাদের একটা সম্মেলনের আয়োজন করেন। ঐ সম্মেলনে তিনি "জনসংহতি সমিতি" নামে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নবগঠিত জনসংহতি সমিতির অংগ সংগঠন হিসাবে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি নামে একটা ছাত্র সংগঠনও তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মপ্রকাশ করে। এই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির তৎকালীন নেতারাই পরবর্তীকালে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানেও তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা (স্বাধীন বাংলাদেশের) গণপরিষদের সদস্য হিসাবে খসড়া সংবিধান প্রনয়ন কমিটির কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা দাবী করেছিলেন। তিনি মূলতঃ ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের কাছে পেশকৃত ৪ দফা দাবীর আলোকে ১৯৭২ সালের ২৪শে এপ্রিল লিখিতভাবে বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা দাবী করেছিলেন। কিন্তু খসড়া সংবিধান প্রনয়ন কমিটি এবং গণপরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন বিশেষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মর্যাদা প্রদানে সম্মত হয়নি।

www.pathagar.com

চ: ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির বিজয়ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার দাবীকে সামনে রেখে মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জনসংহতি সমিতি তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনে ২ জন প্রার্থী দাঁড় করায় যাদের একজন স্বয়ং মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা। খসড়া সংবিধান প্রনয়ন কমিটি এবং গণপরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার দাবী নাকচ করার বিষয়টি এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ ইং রাঙ্গামাটিতে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের একটা উক্তিকে অপব্যাখ্যা করে জনসংহতি সমিতি উপজাতীয় জনগণের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়। শেখ মুজিবর রহমান তার উল্লেখিত ভাষণে বলেছিলেন যে, "আমরা এখন সবাই বাঙালী। এখানে কোন উপজাতি নেই। আমি আজ থেকে আপনাদেরকে উপজাতি থেকে জাতিতে প্রমোশন দিলাম"।

উপজাতীয়রা বাঙালী বলতে বাঙালী মুসলমানদের বুঝে। জনসংহতি সমিতি শেখ মুজিবের উপরোক্ত বক্তব্যকে অপব্যাখ্যা করে বলেছে যে, তিনি উপজাতীয় জনগণকে বাঙালী আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে উপজাতীয়দের সবাই বাঙালী বা মুসলমান হতে হবে। সবাইকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। তাই মুসলমান তথা বাঙালী হওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য উপজাতীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সহজ-সরল উপজাতীয় জনগণ তাদের কথায় বিশ্বাস করে জনসংহতি সমিতির প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে।

১৯৭৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় তৎকালিন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য এই জেলার বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা প্রদানের দাবী জানান। এ প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদল বলেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অথচ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম জেলা বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা ভোগ করেছিল। প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীকে স্বরণ করিয়ে দেন যে, ১৯০০ সালের যে শাসনবিধি বলে এতদিন যাবত উপজাতীয় জনগণের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, স্বার্থ এবং অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছিল সেই আইন ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে বলবৎ থাকবে বলে সংবিধানে ঘোষণা করা হয়নি। তাই যেকোন দিন এই আইন বাতিল ঘোষণা করা হতে পারে। একটা বিকল্প প্রশাসনিক মর্যাদা বা ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বাতিল করা হলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তাতে উপজাতীয় জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন হবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেন যে, নির্বাহী আদেশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ করা হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। প্রতিনিধিদলে সংসদ সদস্যা মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ানও ছিলেন।

ছঃ মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার বাকশালে যোগদানঃ

মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদার দাবী সংসদের ভিতরে ও বাইরে জানিয়ে যান। শেখ মুজিবর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদার দাবী তাৎক্ষনিকভাবে মেনে না নিলেও এর একটা সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দিলে মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা নিজেই বাকশালে (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ) যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দিন পর্যন্ত তিনি বাকশালের সদস্য ছিলেন। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হওয়ার আশংকাতে তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করেন।

মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার আত্মগোপনের পর জনসংহতি সমিতির প্রধান কার্যালয় এবং শান্তিবাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার গভীর অরণ্যে স্থাপন করা হয়। তদানিন্তন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে সামরিক কায়দায় বেশ কয়েকটা সেক্টরে এবং প্রত্যেক সেক্টরকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়। উপজাতীয় যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনী ও তৎকালিন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর প্রাক্তন উপজাতীয় সদস্যদের নিয়ে প্রায় একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামেরই কোন এক গহীণ অরণ্যে একটি সামরিক

www.pathagar.com

একাডেমী প্রতিষ্টা করা হয়। প্রথম দিকে উপজাতীয় ছাত্রদের একটা অংশ শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে উল্লিখিত একাডেমীতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এমনকি গ্রামাঞ্চলের যুবকদেরও বাধ্যতামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হয়। এছাড়া শান্তিবাহিনী এবং মিলিশিয়া বাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের লক্ষ্যে গ্রাম্য যুবক ও মহিলা সমিতি গঠন করা হয়। এদের কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা, সরকারের সহযোগী, তাদের ভাষায়, দালাল এবং শ্রেণী শত্রু খতম করা ও সামরিক বাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখা ও এসব গতিবিধির খবর নিকটস্থ শান্তিবাহিনী ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়া। পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণের পর শান্তিবাহিনী ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। তাদের সামরিক তৎপরতা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, যা ১৯৮০ সাল নাগাদ যথেষ্ট জোরদার হয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ

ক: আওয়ামী লীগ আমল ঃ

মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকাকে পুঁজি করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রামের গোটা উপজাতীয় সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই দল ছিল অত্যন্ত দুর্বল। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে এই দলের তেমন কোন সাংগঠনিক শক্তি ছিলনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ এই দলের সমর্থক ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয়রা কোন সময় সংখ্যালঘিষ্ট বহিরাগত বাঙ্গালীদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। অথচ, তাদের নিজস্ব কোন সংগঠন ছিলনা। তাই উপজাতীয় জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেনি। মুক্তিযুদ্ধে তাদের এই নিষ্ক্রিয়তাকে আওয়ামী লীগ এর রাজনীতির পুঁজি করেছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সমাজে উপজাতীয়দের নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্যই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীকালে উপজাতি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে স্থানীয় নেতারা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং সরকারকে প্রভাবিত করে উপজাতীয় জনগণকে সকল পর্যায়ের স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব থেকে বাদ দিয়ে দেয়। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ত্রাণ ও পূণর্বাসন কাজ চালানোর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয় সেগুলি থেকে উপজাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ঐতিহ্যবাহী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়। অথচ তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের আগে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অথবা সদস্য ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামগোত্র পরিচয়হীন বাঙ্গালীদের নেতৃত্বে এসব ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলের ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলি ভেঙ্গে দিয়েই সেগুলির পরিবর্তে এসব ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পাকিস্তান আমলের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বাদ দিয়ে এসব ত্রাণ কমিটি গঠন করায় উপজাতীয়দের মনে স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়। উপজাতীয় জনগণ বিশেষতঃ উপজাতীয় আওয়ামীলীগ নেতারা বাঙ্গালী

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতাদের এই উপজাতি বিরোধী নীতি প্রতিহত করার জন্য সাথে সাথে তৎপর হয়ে উঠেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জোর চাপ সৃষ্টি করার পর উপজাতীয় আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা শেষ পর্যন্ত সরকারকে উপজাতি স্বার্থ পরিপন্থী নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান ও উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ সার্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দেন। এ লক্ষ্যে তিনি দ্রুত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেগুলির বিশেষ বিশেষ কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হলঃ-

ক.১: নূতন চাকমা রাজা ঘোষণাঃ

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের কারণে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় দেশ ত্যাগ করলে চাকমা উপজাতির রাজার পদ শূণ্য হয়। চাকমা উপজাতির ঐতিহ্যবাহী নেতার এই শূণ্য পদ পূরণ পূর্বক উপজাতীয়দের মধ্যে মনোবল ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম ত্রিদিব রায়ের জ্যৈষ্ঠ পুত্র কুমার দেবাশীষ রায়কে চাকমা রাজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তৎকালিন স্বরাষ্টমন্ত্রী জনাব আব্দুল মালেক উকিল ১৯৭৩ সালের ৩০ শে এপ্রিল রাঙ্গামাটি সফরে এলে রাজা ত্রিদিব রায়ের বাড়ীতে যান এবং ত্রিদিব রায়ের মেজ ভাই কুমার সমিত রায়, ত্রিদিব রায়ের স্ত্রী শ্রীমতি আরতি রায়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিত রায় এবং রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

মন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে, কিশোর রাজা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চাচা কুমার সমিত রায় রাজ কার্য পরিচালনা করবেন। তাঁকে সাহায্য করবেন কুমার দেবাশীষ রায়ের মাতা শ্রীমতি আরতি রায় ও ঠাকুরদাদা কুমার কোকনাদক্ষ রায়। কুমার দেবাশীষ রায় তখন রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়ছেন। (পূর্বদেশ ১লা মে, ১৯৭৩ ইং)।

ক.২: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশেষভাবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য ১৯৭৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী, এবং বিভিন্ন

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যা মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ান ১৯৭৩ সালের ৬ই জুন প্রধানমন্ত্রীর সংসদ কক্ষে তার সাথে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধানমন্ত্রী তাকে আশ্বাস দেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। তার উক্ত আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তিনি উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩টি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ২টি, ঢাকা প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি, কৃষি কলেজে ২টি এবং পলিটেকনিকে ৫টি আসন সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন (MORNING NEWS. June. 17. 1973 এবং দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ই জুন, ১৯৭৩ ইং, পূর্বদেশ ১৮ই জুন, ১৯৭৩ ইং এবং দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জুন ১৯৭৩ ইং)

ক.৩: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী যুগ যুগ ব্যাপী অবহেলিত, বঞ্চিত এবং পশ্চাৎপদ উপজাতীয় জনগণের অবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ভূমি সংস্কার, বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১৯৭৩ সালের ২৯ শে জুলাই, রাঙ্গামাটি সফরে এলে স্থানীয় জনগণের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে বিভিন্নস্তরের জনগণের এক সমাবেশে ভাষণ দান কালে মন্ত্রী বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফেরার পর বোর্ডকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে (লেখকের ব্যক্তিগত রোজ নামচা, 'দৈনিক স্বাধীনতার সম্পাদকীয়, ১লা আগষ্ট, ১৯৭৩, এবং বাংলাদেশ সংবাদ, ১০ই আগষ্ট, ১৯৭৩ ইং)।

ক.৪: উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৈদেশিক বৃত্তি প্রদান ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত এবং অবহেলিত উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রীদেরকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগদানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৩ সাল থেকে বৈদেশিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই স্বাধীন বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়। সেকারণে এসব দেশগুলির সাথে স্বাধীনতা লগ্ন থেকে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদেরকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পাঠান

www.pathagar.com

হয়। প্রধানতঃ চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশল ও নার্সিং এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলান্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী এবং কিউবায় পাঠান হয়। ১৯৭৩ সালের পর থেকে প্রতিবছরই কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৃত্তি দিয়ে পাঠান হয়। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পর উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ধারা ব্যাহত হয়।

ক.৫: চট্টগ্রাম ও ঢাকায় উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য বাড়ী বরাদ্ধ ঃ

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ তৎকালীন সংসদ সদস্যা মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় একটি করে পরিত্যক্ত বাড়ী বরাদ্ধের আদেশ দেন। চট্টগ্রামে যে বাড়ীটি বরাদ্ধ দেওয়া হয় ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর আর দখল পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকায় যে বাড়ীটি বরাদ্ধ করা হয় তার দখল পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে উক্ত বাড়ী মালিককে ফেরত দেওয়া হলেও তৎপরিবর্তে অপর একটি বাড়ী বরাদ্ধ দেওয়া হয়, যা উপজাতীয় ছাত্ররা বর্তমানেও ভোগদখল করছে।

ক.৬: পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঃ

তৎকালিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১৯৭৪ সালের ১১ই আগষ্ট রাঙ্গামাটিতে ঘোষণা করেন যে, ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্মী সম্মেলন উদ্বোধনকালে মন্ত্রী উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। জনাব সেরনিয়াবাত বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে রাঙ্গামাটিকে ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য চলতি বছরের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে এবং প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে তিনটি পর্যায়ে একাজ শেষ হবে। এতে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। তিনি আরও জানান যে, চলতি বছরই জেলার বাকী ৮টি থানার বিদ্যুতায়ন কাজও গ্রহণ করা হবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই আগষ্ট ১৯৭৪ এবং মন্ত্রীর রাঙ্গামাটিতে শুভাগমন উপলক্ষে জেলার জনগণের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকলিপি, ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৪ইং)। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটির ভাঙ্গনরোধ কাজ হাতে নেয় এবং শেষ করে।

www.pathagar.com

ক.৭: জাতীয় সংখ্যালঘু হিসাবে উপজাতীয়দের অধিকার প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের ঘোষণা ঃ

১৯৭৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাঙ্গামাটি সফরে আসেন। ঐ সফরে তিনি জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে তাঁর সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। রাঙ্গামাটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজাতীয় প্রধান, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংখ্যালঘুদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবশ্যই রক্ষা করা হবে।

স্থানীয় সমস্যা সমূহের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাঁর সরকার এলাকার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন যে, এজন্যই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুলিশ বাহিনীতে তিনশো এবং রক্ষীবাহিনীতে দু'শো যুবক সংগ্রহ করার জন্য তিনি ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ঐদিন স্থানীয় ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং সমবায় ভিত্তিতে বাজারজাতকরণের জন্য ১লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এছাড়া বাণিজ্যক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকতর সুবিধা প্রদানের জন্য তিনি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব তাঁর রাঙ্গামাটি সফরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য অবিলম্বে অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে তিনি নতুন বন সৃষ্টি এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন (বাংলার বাণী, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ ইং এবং দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৫ ইং)।

খঃ জিয়ার আমল

খ.১: অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিতকরণ ঃ

ক্ষমতা গ্রহণের পর কিছুদিনের মধ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে রাঙ্গামাটি সফর করেন। তাঁর রাঙ্গামাটি সফর কালে তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত উপজাতীয় ও

www.pathagar.com

অউপজাতীয় নেতাদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। তাঁর সফর উপলক্ষে উপজাতীয়দের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচী হাতে নেওয়ার জন্য দাবী জানান হয়। জেনারেল জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাই এই সমস্যাকে অর্থনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে বলে তিনি দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে সমাধানের লক্ষ্যে শীঘ্রই ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হবে বলেও তিনি সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নামে একটা সংস্থা গঠন করা হবে বলেও তিনি উক্ত সমাবেশে ঘোষণা করেন।

খ.২: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনঃ

জেনারেল জিয়ারই ঘোষণা অনুযায়ী, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৬ ইং তারিখে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ২১/২/৭৬ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নামে একটা সংস্থা গঠন করা হয়। ঐ বছরের মার্চ মাস থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু করে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্তকেই বাস্তবায়িত করেছেন। জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালের ২০ শে অক্টোবর এক অধ্যাদেশ (নং ৭৭) জারী করে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নবোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার ফলে ১৯৭৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ২১/২/৭৬ মূলে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিলুপ্ত হয়ে যায়। (বোর্ডের কার্যক্রম অপর এক অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

খ.৩: ট্রাইবেল কনভেনশনের জন্ম ঃ

১৯৭৭ সালের ২৯শে মে তারিখে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা চন্দ্রঘোনা এলাকায় এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যকে হত্যা করে। এই ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শান্তিবাহিনী তথা উপজাতীয় বিদ্রোহ জনিত সমস্যা মোকাবিলা করার ব্যাপারে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা

www.pathagar.com

লাভের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ১৯৭৭ সালের ২রা জুলাই রাঙ্গামাটিতে তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের একটি জরুরী সভা আহ্বান করেন। ২রা জুলাই থেকে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সভায় "টাইবেল কনভেনশন" বা উপজাতীয় পরামর্শ সভা নামে একটা অরাজনৈতিক সংগঠন এবং ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এর একটা কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের এই সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের দাবীদাওয়া সহিংস পন্থার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আদায় করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করতঃ এই পন্থায় আন্দোলন চালানোর জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান হয়। টাইবেল কনভেনশন ভবিষ্যতে শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে বলেও সভায় অপর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

খ.৪: জনসংহতি সমিতির সাথে ট্রাইবেল কনভেনশনের বৈঠক ঃ

উপজাতীয় জনগণের দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চালানোর আহ্বান জানিয়ে টাইবেল কনভেনশন প্রথমে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটা খোলাচিঠি এবং কিছু বিবৃতি প্রচার করে। টাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় জনসভার আয়োজন করে সহিংস পন্থায় জনসংহতি সমিতি যে আন্দোলন চালাচ্ছে তা দাবী আদায়ের সঠিক পন্থা নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। টাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ একই সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যান, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালের ৩০শে জুলাই নানিয়াচরে শান্তিবাহিনীর কয়েকজন নিম্নপর্যায়ের সদস্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

তবে পরবর্তী মাসে অর্থাৎ ১৭ই আগষ্ট জুরাছড়িতে জনসংহতি সমিতির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সাথে টাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ শর্ত সাপেক্ষে সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত হন। তারা একটা তৃতীয় দেশে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেন।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে টাইবেল কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক বর্তমান লেখক

www.pathagar.com

এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্প রঞ্জন চাকমা ১৯৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কাউখালী উপজেলাধীন বাদলছড়ি গ্রামে জনসংহতি সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনায় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের সাথে বৈঠকে বসার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

পরবর্তীকালেও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক দফা বৈঠক হয়। কিন্তু জনসংহতি সমিতি ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে। জনসংহতি সমিতি ট্রাইবেল কনভেনশনকে সরকারের একটা সহযোগী সংগঠন এবং এর নেতৃবৃন্দকে সরকারের লেজুর হিসাবে চিহ্নিত করে। তাই জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আলাপ আলোচনার পথ পরিহার করে ট্রাইবেল কনভেনশনকে প্রতিরোধ করার নীতি অবলম্বন করেন। ট্রাইবেল কনভেনশন বিরোধী এই নীতির অংশ হিসাবে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী ট্রাইবেল কনভেনশনের গ্রাম এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বহু নেতা এবং কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা এবং গুম করে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে ট্রাইবেল কনভেনশন শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল ভূমির লোক পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের সাথে মত পার্থক্যের কারণেও ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনের কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

খ.৫: উপজাতি বিদ্রোহ দমনে পদক্ষেপঃ বাঙালী পুনর্বাসন ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি তৎকালিন সরকার শান্তিবাহিনী তথা উপজাতি বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধাসামরিক, পুলিশ ও আনসার বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিন্তু তাতেও শান্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয়নি, বরং জোরদার হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ৩০ শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়ার গণভোটের এক দিন পূর্বে কাপ্তাই উপজেলার বাংগালহালিয়া গ্রামের কাছে এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে শান্তিবাহিনী সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার এবং কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করে।

শান্তিবাহিনী তথা উপজাতি বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ হিসাবে সরকার পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সাল থেকে তদানিন্তন পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের কাউখালী, নানিয়াচর, লংগদু, বিলাইছড়ি, বরকল, রাজস্থলী, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাংগা, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, লামা ও আলীকদম উপজেলায় বাঙালী পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়। ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ তথা উপজাতীয় জনগণের জোর আপত্তি সত্বেও ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এই পুনর্বাসন কাজ পুরাদমে চলে। উপজাতীয় নেতাদের হিসাব মতে পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় দুই লক্ষাধিক বাঙালী পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মূলতঃ পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি এবং বাঙালী জনসংখ্যার মধ্যে একটি ভারসাম্য এনে উপজাতি বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকার তৎকালিন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুনর্বাসন করে। সরকার এই বাঙালী পুনর্বাসন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঙালী এবং উপজাতীয় জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হন। যেখানে ১৯৭৪ সালে উপজাতি-বাঙালী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৭৩ এবং ২৭, সেখানে ১৯৮১ সালে সে অনুপাত এসে দাঁড়ায় ৬০ এবং ৪০-এ। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাঙালী এবং উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টা সফল হলেও উপজাতি বিদ্রোহ দমন বা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

খ.৬: প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে ট্রাইবেল কনভেনশন নেতাদের সাক্ষাৎ ঃ

প্রেসিডেন্টের উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা মিসেস বিনীতা রায়ের মধ্যস্থতায় ১৯৭৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ঢাকায় ট্রাইবেল কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাক্‌মা এবং যুগ্ম সম্পাদক বর্তমান লেখক বেলা সাড়ে ১১টায় বি,এন,পির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ট্রাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলে তিনি দলের কর্মসূচী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হননি। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

খ.৭: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ট্রাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ঃ

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধান কল্পে ১৯৭৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাক্‌মার নেতৃত্বে ট্রাইবেল কনভেনশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় তৎকালিন স্বরাষ্টমন্ত্রী এ. এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

www.pathagar.com

তারা পার্বত্য অঞ্চলের তৎকালিন সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মত বিনিময় করেন। বলাবাহুল্য, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে স্বরাষ্টমন্ত্রীর কাছ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।

খ.৮: সন্তু লার্মার মুক্তি লাভ ঃ

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মাকে (সন্তু লার্মা) মুক্তি দেওয়ার জন্য ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ অনেক দিন থেকেই দাবী জানিয়ে আসছিলেন। ট্রাইবেল কনভেনশনের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার জেলখানায় সন্তু লার্মার সাথে আলোচনাক্রমে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮০ সালের ২২শে জানুয়ারী সন্তু লার্মা, অনিমা চাকমা, বিভূতি চাকমা, এবং চাবাই মগকে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে এসে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের সামনে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত ৩ জন একই সাথে গ্রেপ্তার হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অনেক পরে গ্রেপ্তার হলেও জনসংহতি সমিতির একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা হিসাবে তাকেও সন্তু লার্মার সাথে মুক্তি দেওয়া হয়।

খ.৯: পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিন জেলায় বিভক্তিঃ

১৯৮১ সালের ১৮ই এপ্রিলের এক সরকারি ঘোষণা বলে তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বান্দরবান মহকুমাকে নিয়ে বান্দরবান জেলা নামে একটি পৃথক জেলা গঠন করা হয়। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি মহকুমা তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার নাম বহন করতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর অপর এক সরকারী আদেশ বলে খাগড়াছড়ি মহকুমাকে পৃথক করে নিয়ে খাগড়াছড়ি নামে আরও একটি নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়। তখন থেকে রাঙ্গামাটি মহকুমাও একটা আলাদা জেলায় উন্নীত হয়।

তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভাগ করার ব্যাপারে উপজাতীয়দের একটা অংশের আপত্তি ছিল। উপজাতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করে যে, বিভিন্ন উপজাতিভূক্ত হলেও তারা একই মংগোলীয় জাতিভূক্ত। একই জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা হিসাবে তাদের মধ্যে একটা জাতিগত ঐক্য বিরাজমান। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভাগ করলে তাদের সে জাতিগত ঐক্য বিনষ্ট হবে। জনসংহতি সমিতি উপজাতীয় জনগণকে তিন জেলায় ভাগ করে তাদের জাতিগত ঐক্য ভেংগে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।

www.pathagar.com

খ.১০: প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে ট্রাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী পেশ ঃ

১৯৮০ সালের ১৮ই মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাঙ্গামাটি সফরে এলে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতাদের সাথে রাঙ্গামাটি সরকারী সার্কিট হাউজে এক বৈঠকে মিলিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের উপায় এবং পন্থা সম্পর্কে আলোচনাকালে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্বশাসন প্রদানের এবং তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুনর্বাসন বন্ধ করার দাবী জানান। তিনি এ দুটি দাবীর ব্যাপারে সরাসরি কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে জবাব এড়িয়ে যান। এতে ট্রাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দ যারপর নাই হতাশ হয়ে পড়েন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের এই উদাসীনতা লক্ষ্য করে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ এর পর থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

গ: প্রেসিডেন্ট সাত্তারের শাসনামল ঃ

১৯৮২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ১১টায় রাষ্ট্রপতির উপজাতীয় বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা জনাব সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ও বাঙালীদের একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এই জেলার সমস্যা সমাধানের পন্থা নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে মত বিনিময় করেন। তবে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ফর্মূলা ঐ বৈঠকে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যতে এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। রাঙ্গামাটি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব কাজী নজরুল ইসলাম ঐ প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

জেনারেল এরশাদের উদ্যোগ

ক: খাগড়াছড়িতে উপজাতীয় নেতাদের সাথে বৈঠক ঃ

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহনের পর ১৯৮২ সালের ২৭শে জুলাই খাগড়াছড়িতে বর্তমান তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে উপজাতীয় জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা পেলে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জি, ও, সি, জেনারেল মান্নাফ ১৯৮২ সালের ২রা আগষ্ট রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

খ: খসড়া দাবীনামা ও যোগাযোগ উপ কমিটি গঠন ঃ

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৮২ সালের ৪ঠা আগষ্ঠ রাঙ্গামাটিতে এক বৈঠকে মিলিত হন। উপজাতীয় জনগণের দাবী-দাওয়া নির্ধারণ করে সেগুলি একটা দাবীনামা আকারে প্রস্তুত করার জন্য ঐ বৈঠকে খসড়া প্রস্তুত উপ-কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে তাদের দাবী-দাওয়া জানার জন্য জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মার নেতৃত্বে যোগাযোগ উপ-কমিটি নামে আরও একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। দাবীনামার খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদনের জন্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং খসড়া প্রস্তুত উপ-কমিটি যথাক্রমে ১৯৮২ সালের ২২শে আগষ্ট এবং ৯ই অক্টোবর রাঙ্গামাটিতে বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু মত পার্থক্যের কারণে কোন সর্বসম্মত দাবীনামা প্রস্তুত বা অনুমোদন করা সম্ভব হয়নি। দাবীনামা প্রস্তুত ও তা সরকারের কাছে পেশ করতে বিলম্ব হওয়ায় ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সি, ১৯৮২ সালের ১২ই অক্টোবর চট্টগ্রামে উপজাতীয় নেতাদের এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং এ ব্যাপারে তাগিদ দেন।

গ: জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ কমিটির বৈঠক ঃ

১৯৮২ সালের ২৫শে অক্টোবর বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন ভাইবোনছড়া এলাকায় যোগাযোগ উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ

www.pathagar.com

জনসংহতি সমিতির ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ উক্ত বৈঠকে যোগাযোগ উপ-কমিটির আহবায়ক উপেন্দ্র লাল চাক্‌মার কাছে জনসংহতি সমিতির ৯-১০-৮২ইং তারিখের একটা বিবৃতির অনুলিপি হস্তান্তর করেন, যাতে যোগাযোগ উপ-কমিটির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

ঘ: উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবীনামা পেশ ঃ

জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল এবং সেই ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মপন্থা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বর্তমান তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৮২ সালের ৩০শে অক্টোবর রাঙ্গামাটিতে এক বৈঠকে মিলিত হন। জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলভূমির লোক পুনর্বাসন বন্ধ রাখা, প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন পার্বত্য অঞ্চলে স্থগিত রাখা, ইত্যাদি কতিপয় দাবী সরকারের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্ত বৈঠকে গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সরকারের উর্ধতন কতৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের দাবী নামার প্রেক্ষিতে কোন সাড়া দেননি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনসংহতি সমিতির দাবী সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নিজেদের দাবীনামা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যেই উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার তাগিদ অনুভব করেন। কিন্তু জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোন তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৮২ সালের ২৫শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত বৈঠকে তাদের এই মনোভাব পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

ঙ: জনসংহতি সমিতির মধ্যে মত বিরোধ ও পার্টির দ্বিধাবিভক্তি ঃ

১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম জনসংহতি সমিতির মধ্যে আদর্শগত বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। পার্টির প্রধান কর্মকর্তারা ঐক্যের স্বার্থে এই বিরোধ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৮২ সালের ২৪শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে কমিটির অন্যতম সদস্য প্রীতি কুমার চাক্‌মা আন্দোলনের আদর্শ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগী ব্যাখ্যা করে বলেন যে, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের

www.pathagar.com

সমস্যা ও যুদ্ধের সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশী, ভারতীয় অথবা বর্মী- যে কোন দেশের পতাকা মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা এই সম্মেলনে বলেন যে, মার্কসবাদ, লেলিনবাদ ও মাও সে-তুঙ এর চিন্তাধারার আদর্শ সমুন্নত রেখে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পার্টিকে সাফল্য কুড়িয়ে আনতে হবে।

উপরোক্ত সম্মেলনের পর আদর্শগত ও কৌশলগত দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের কারনে জনসংহতি সমিতি শেষ পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং ১৯৮৩ সালের ১৪ই জুন সর্বপ্রথম পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পার্টির নিরপেক্ষ ধরনের নেতারা পার্টির দুটি বিবদমান অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। এই পটভূমিতে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা তার আট জন সহযোগীসহ ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত ইজারা গ্রামে অবস্থিত কল্যাণপুর ক্যাম্পে প্রীতি গ্রুপের হামলায় নিহত হন।

১৯৮৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ও ১৯৮৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী যথাক্রমে লার্মা গ্রুপ ও প্রীতি গ্রুপ কর্তৃক প্রচারিত লিখিত বিবৃতিতে জনসংহতি সমিতির দ্বিধাবিভক্তি ও মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার হত্যার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করা হয়েছে। সরকারের সাথে এক চুক্তি সম্পাদনের পর ১৯৮৫ সালের ২৯শে জুন প্রীতিগ্রুপের ২৩৩জন নেতা এবং সদস্য বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নীতির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সমাজে ফিরে আসে। প্রীতি কুমার চাকমা এবং ভবতোষ দেওয়ান ব্যতীত পার্টির প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতা উপরোক্ত চুক্তির পর ফিরে আসে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার উদ্যোগ

কঃ ট্রাইবেল কনভেনশনের পুনরুজ্জীবন ঃ

১৯৮৩ সালের ৩০শে আগষ্ট ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সি এবং 'গ' অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল মান্নাফ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি টাউন হলে উপজাতীয় জনগণের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ট্রাইবেল কনভেনশন পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরদিন রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় নেতাদের এক সভায় শান্তিময় দেওয়ানকে আহবায়ক করে ট্রাইবেল কনভেনশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ট্রাইবেল কনভেনশন জেলা কমিটির এক সভা উপজাতীয় নেতা বিনয় কুমার দেওয়ানের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ট্রাইবেল কনভেনশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জেলা কমিটির অপর এক সভায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলা কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ট্রাইবেল কনভেনশনের উদ্যোগে ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর লংগদু, ম্যারিশ্যা, নানিয়ারচর এবং কাউখালীতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৩ সালের ৩রা অক্টোবর তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ রাঙ্গামাটি সফরে আসেন এবং রাঙ্গামাটি ষ্টেডিয়ামে এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে একটা প্যাকেজ ডিলের প্রস্তাব দেন। জেনারেল এরশাদের ভাষণের আলোকে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে পরদিন ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সির সাথে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামে বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকের পরে শান্তিস্থাপন প্রক্রিয়া নির্ধারণের লক্ষ্যে ৯ই অক্টোবর ট্রাইবেল কনভেনশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিস্থাপন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনের প্রস্তাব করলে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালের ১২ই অক্টোবর চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব আলী হায়দার খানের সাথে রাঙ্গামাটিতে ট্রাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি সংশোধন কল্পে প্রাথমিক আলোচনা হয়।

১৯৮৩ সালের ২রা নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রেষ্ট হাউজে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ যুব প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং অত্র অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের পন্থা নিয়ে মত বিনিময় করেন। উপজাতীয় যুব প্রতিনিধিরা অত্র অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ট্রাইবেল কনভেনশনের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানকল্পে মত বিনিময় ও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার জন্য ১৯৮৪ সালের ১৬ই মে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে তিন পার্বত্য জেলা নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইবেল কনভেনশন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খঃ শান্তিবাহিনী কর্তৃক বিদেশী নাগরিক অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় ঃ

১৯৮৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাঘাইছড়ি উপজেলায় কর্মরত শেল অয়েল কোম্পানীর ৬ জন বিদেশী কর্মকর্তাকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বিকাল ৫ টায় সিজকমুখ এলাকা থেকে অপহরণ করে। তবে ৩ জনকে ঐ একইদিন রাত্রেই মুক্তি দেয় এবং বাকী ৩জনকে গভীর জংগলে তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। পরদিন সকাল ৯টায় রাঙ্গামাটি জেলার ট্রাইবেল কনভেনশনের আহ্বায়ক জনাব শান্তিময় দেওয়ান এবং সদস্য বর্তমান লেখক ও খাগড়াছড়ি জেলা ট্রাইবেল কনভেনশনের আহ্বায়ক জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্মা বাঘাইছড়ি চলে যান। বাঘাইছড়ি উপজেলায় স্থানীয় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ২৩শে জানুয়ারী শান্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং অপহৃত বিদেশীদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক খবর পাওয়া যায়। তারা উপজাতীয় নেতাদের জানায় যে, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশেই বিদেশী নাগরিকদের অপহরণ করা হয়েছে। এদের মুক্তির জন্য তারা জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করার নিমিত্তে জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্মাকে খাগড়াছড়ি পাঠানোর জন্য অনুসন্ধানকারী দলকে পরামর্শ দেয়। তবে উপেন্দ্র লাল চাক্মা আগের দিনই খাগড়াছড়ি গিয়েছিলেন। ২৫শে জানুয়ারী শান্তিবাহিনীর কাচালং অঞ্চলের নেতারা চিঠির মারফত জানান যে, বিদেশীদের মুক্তির ব্যাপারে তারা পরদিন নির্ধারিত স্থানে জনাব উপেন্দ্র

www.pathagar.com

লাল চাক্‌মার সাথে বৈঠকে বসতে চান। তাই পরদিন সকালে জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মাকে খাগড়াছড়ি থেকে হেলিকপ্টারযোগে বাঘাইছড়ি নিয়ে আসা হয়। তিনি বাঘাইছড়ি পৌঁছে নিরাপত্তা বাহিনীর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা শেষ করে দুপুর ১২টায় সিজকমুখ উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সেখান থেকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। ঐদিন সন্ধ্যায় আবার সিজকমুখ ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে শান্তিবাহিনী এবং জনসংহতি সমিতির নেতাদের সাথে জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মা একাই আলোচনা চালিয়ে যান। অপহৃত বিদেশীদের মুক্ত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মার হাতে অর্পণ করে জনাব শান্তিময় দেওয়ান এবং বর্তমান লেখক ২৮শে জানুয়ারী রাঙ্গামাটি ফিরে আসেন। জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মার মধ্যস্থতায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বরকল উপজেলাধীন বড় হরিণা থেকে একজন বিদেশী নাগরিককে মুক্তি দেয়।

২২ কেজি স্বর্ণ এবং ১ কোটিরও বেশী বিদেশী ও বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা শেষ পর্যন্ত সব বিদেশী নাগরিককে মুক্তি দেয়। বিদেশী নাগরিকদের মুক্ত করার ব্যাপারে রাঙ্গামাটি জেলা ট্রাইবেল কনভেনশনের আহ্বায়ক জনাব শান্তিময় দেওয়ান এবং বর্তমান লেখককে শান্তিবাহিনীর নেতারা কখনও আলোচনায় ডাকেননি। তারা জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মা ব্যতীত কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা মেনে নেননি।

গ: জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহন ঃ জনসংহতি সমিতি এবং সরকার পক্ষের প্রথম বৈঠক

ট্রাইবেল কনভেনশনের পরামর্শ এবং অনুরোধক্রমে জেনারেল এরশাদ জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে জেনারেল এরশাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে ট্রাইবেল কনভেনশন কেন্দ্রীয় কমিটি যোগাযোগ উপ-কমিটিকে পুনরুজ্জীবিত করে একটা পূর্ণাংগ কমিটি গঠন করে। পুনরুজ্জীবিত যোগাযোগ কমিটি সরকার এবং জনসংহতি সমিতিকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার জন্য জোর প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যায়। যোগাযোগ কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বৈঠকে বসতে সম্মত হন। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ২১শে অক্টোবর পানছড়ি উপজেলাধীন পুঁজগাং এলাকায় জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির ভাষ্য অনুসারে

www.pathagar.com

সরকার পক্ষ ঐ বৈঠকে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে একটা জাতীয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে মেনে নেন এবং তা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে সম্মত হন। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উভয় পক্ষ আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে এবং সহসা দ্বিতীয় বৈঠকে মিলিত হতে সম্মত হন।

দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য করা হয় ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ইং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত তারিখে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য দু'পক্ষ পরস্পরের উপর দোষারোপ করেছেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সরকার পক্ষ পূর্বাহ্নে কোন আভাস না দিয়ে বৈঠকে অনুপস্থিত থাকে। অপরদিকে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, জনসংহতি সমিতি বৈঠকে বসার জন্য আরও কয়েকটা নতুন শর্ত আরোপ করে যা সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে সরকার পক্ষ আর বৈঠকে বসেননি।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের (বহুমুখী) প্রেক্ষাপট

পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কৌশল সন্ধানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ঃ

১৯৬৪-৬৬ সালে কানাডার ফরেষ্টাল ফরেষ্টী এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ কর্তৃক পরিচালিত মাটি ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ১৯৬৮-৬৯ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প" নামে একটা মহা-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে অর্থের অভাবে এই প্রকলেপর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উন্নয়ন প্রয়াসের ধারাবাহিকতার সূত্র খুঁজে বার করার জন্যই পুনরায় বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হল।

৩ বছরে ৫.৫০ একর পাহাড়ী জমিতে ফলের বাগান গড়ে তোলার একটি নতুন প্রকল্প ১৯৭৬ হাতে নেওয়া হয়। এতে প্রতি পরিবারকে বাগানের জন্য ৬৫০০/০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী বাবদে ৩৬২৫/০০ টাকা এবং অবশিষ্ট ২৮৭৫/০০ টাকার পরিবর্তে ফলের চারা, বীজ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এই নতুন প্রকল্পের পরিণতি সম্পর্কে কোন সরকারি তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। এই নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি প্রায় একই সময়ে হয়েছিল বলে এই প্রকল্পের পরিণতিটা সহজেই অনুমান করা যায়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক জরিপ দল নিয়োগ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯০-৯১ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় দেশের একটা পশ্চাৎপদ অঞ্চলের উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের পর পরই এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থিক সাহায্যের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই করার জন্য ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি প্রাথমিক জরিপ দল (RECONNAISSANCE MISSION) প্রেরণ করে। এই জরিপ দল উক্ত একই বছরে একটি প্রতিবেদনও দাখিল করেছে বলে বোর্ডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

www.pathagar.com

জরিপদলের সুপারিশ ঃ

প্রকৃতপক্ষে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জরিপ দলে বৃটেনের ও.ডি. এম নামে একটা সংস্থা, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা/জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী নামক সংস্থা অন্তর্ভূক্ত ছিল। বৃটেনের ও.ডি.এম. নামক সংস্থার পক্ষে কৃষি/উদ্যান খাতে POST-Harvest Technologist B. GRIMWOOD. "Agricultural And Horticultural Development in Chittagong Hill Tracts" নামে একটি এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীর পক্ষে M.E. GERTSCH, পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিকা সম্পদ ও ফসলের উপর "SOIL RESOURCES AND CROPS OF CHITTAGONG HILL TRACTS" নামে আরও একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রথমোক্ত প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কৃষি' (১) জুম চাষ ও নিম্ন অববাহিকার চাষ, (২) কাপ্তাই পুনর্বাসন প্রকল্প (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল ইত্যাদির উপর আলোচনা, (৪) নদী অববাহিকার কৃষি এবং (৫) অপেক্ষাকৃত নীচু এবং ঢালু জমিতে ফল চাষের তৎকালিন অবস্থা পর্যালোচনা এবং কৃষি ও উদ্যান উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা স্থান পায়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জরিপ দলের দ্বিতীয় প্রতিবেদনে (১) মৃত্তিকা সম্পদ ও আবহাওয়া, (২) ভূমির বর্তমান ব্যবহার এবং উৎপাদন (৩) জনসংখ্যা, (৪) ভূমির সক্ষমতা এবং চাষ পদ্ধতিসমূহ এবং (৫) বিভিন্ন ফসল চাষের উপযোগিতার উপর আলোচনা করা হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জরিপ দলের প্রথম প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ভৌগলিক অবস্থান, জনগোষ্ঠি, ধর্ম, কৃষি এবং জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রা প্রণালীর দিক থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে ভিন্ন বিধায় এই অঞ্চলের উন্নয়ন হবে একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মকান্ড যাতে জনশক্তি, অর্থবিনিয়োগ এবং উদ্যোগ ইত্যাদির আকারে প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন। এখানে ব্যাপক ভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে এধরণের একটা কৌশল অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এখানে উন্নয়ন কৌশল হবে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটা নির্বাচিত এলাকায় কর্মকান্ড কেন্দ্রীভূত করা, যার ফলাফল পর্যায়ক্রমে সমগ্র জেলায় সম্প্রসারণ করা যাবে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিক এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের জরিপ দলের প্রথম প্রতিবেদনে ফরেষ্টাল জরিপ দলের ফলাফল অনুসরণ করার সুপারিশ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। ফরেষ্টালের জরিপে ভূমির সক্ষমতা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। তবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল, (১) নিম্ন, (২) মধ্যম এবং (৩) উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকা।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের উপরোক্ত জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, নিম্ন এবং মধ্যম অগ্রাধিকার এলাকার উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে। জরিপ দলের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, একই সাথে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কাজ শুরু করার বদলে নিম্ন এবং মধ্যম অগ্রাধিকার এলাকায় পরিবহণ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সুবিধার উন্নয়ন, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কতিপয় প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কিছু পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে।

ফরেষ্টাল জরিপ দল চেঙ্গী নদী অববাহিকা, মাইনী নদী অববাহিকা এবং কাচালং পুনর্বাসন এলাকাকে উন্নয়নের জন্য উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই এলাকাসমূহে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জমি সর্বোচ্চ পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে (যথাক্রমে শতকরা ২৪.২, ১৫.২ এবং ৩০.৭ ভাগ) –এই এলাকাসমূহের জমি অন্যান্য এলাকার জমির চাইতে অনেক বড় বড় অংশ একীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। পানির ধারণ ক্ষমতার দিক থেকে এই এলাকাসমূহের মাটির মান তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট।

সবদিক বিবেচনা করে ফরেষ্টালের জরিপ দল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিদ্যমান সম্পদ উপরোক্ত তিনটি উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকার উন্নয়ন একই সাথে হাতে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই জরিপ দল উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকাসমূহের মধ্যে কোন একটাকে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ করেছে।

নিম্নোক্ত কয়েকটা কারণে ফরেষ্টাল জরিপ দল চেঙ্গী অববাহিকাকে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ করেছেঃ–

(১) চেঙ্গী অববাহিকা অনেক প্রশস্থ এবং যেসব এলাকা নদী অথবা সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য, বিদ্যমান সড়কের সাথে সংযুক্ত এমন সব অংশে উৎকৃষ্ট জমিগুলি কেন্দ্রীভূত, (২) বিদ্যমান সড়কগুলির বিস্তার চেঙ্গী অববাহিকায় ব্যাপকতর এবং এলাকাটি রামগড়ের মাধ্যমে, চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ও রেলপথ পর্য্যন্ত সব ঋতুতে ব্যবহার যোগ্য সড়কের সংযোগ স্থলের নিকটে অবস্থিত। সে কারণে এলাকায় সব ঋতুর জন্য পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যয়

www.pathagar.com

কম হবে এবং পরবর্তীকালে মাইনী (নদী) অববাহিকা এবং কাচালং পুনর্বাসন এলাকা উন্নয়নের জন্য এসকল সড়ক সম্প্রসারণ করা যাবে এবং (৩) বর্তমানে কাচালং এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব এত বেশী যে, ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত জমি খুব কমই পাওয়া যাবে।

চেঙ্গী অববাহিকাকে প্রথম শ্রেণীর অগ্রাধিকার দিয়ে ফরেষ্টাল জরিপ দল অন্য দুটি উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সূচনা হিসাবে নিম্নোক্ত কতিপয় তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেঃ- (১) বিদ্যমান সড়ক সমূহকে সব ঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী করা, (২) সমগ্র এলাকায় আবহাওয়া ষ্টেশন স্থাপন করা, (৩) সেচ সম্ভাব্যতা, মাটিতে পানির স্তর এবং নদীর পানি প্রবাহ সম্বন্ধে গবেষনা চালানো, (৪) অববাহিকার নীচু জমিতে চাষাবাদের উন্নয়ন, (৫) প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং (৬) ভূমি ক্ষয় রোধের জন্য ছড়া বা খালের উৎস স্থলে এবং যতদূর সম্ভব উচু জমিতে বন সৃষ্টি করা।

উপরে বর্ণিত যুক্তিসমূহের ভিত্তিতে ফরেষ্টাল জরিপ দল একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অগ্রাধিকার এলাকা হিসাবে চেঙ্গী অববাহিকাকে, বিশেষত উত্তর অঞ্চলকে নির্বাচন করেছে। কারণ কর্ণফুলী বাঁধের দ্বারা বাস্তুচ্যুত লোকদের একটা বড় অংশ দক্ষিনাঞ্চলে খাগড়াছড়ির আশে-পাশে বসতিস্থাপন করেছিল। ধারণা করা হয় যে, উন্নয়নের জন্য উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে পানছড়ির আশেপাশে অনেক বেশী পরিমাণ জমি পাওয়া যাবে।

ফরেষ্টালের জরিপ দল অবশ্য প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক প্রকল্প কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের পূর্বে আরও প্রাথমিক জরিপের প্রয়োজন হবে বলে মত প্রকাশ করেছে। এসব জরিপের ফলাফলই নির্ধারণ করবে, চেঙ্গী অববাহিকার উন্নয়নের প্রকৃতি, স্থান এবং ব্যাপ্তি।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জরিপ দল ফরেষ্টাল জরিপ দল কর্তৃক ১৯৬৬ সালে উপস্থাপিত উন্নয়ন কৌশলকে তখন পর্য্যন্ত সঠিক এবং বাস্তবসম্মত বলে গ্রহণ করেছে। জরিপ দল এও বলেছে যে, ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়ার পর অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এই পরিবর্তনের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অধিকন্তু, জরিপ দল মনে করে যে, কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্য্যায়ে চেঙ্গী অববাহিকায় সমস্ত উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত না করে উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকায় বেশ কিছু সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিৎ।

www.pathagar.com

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জরিপ দল বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, একজন কৃষিবিদ, একজন অর্থনীতিবিদ, একজন ভূমিব্যবহার/মাটি শ্রেণী বিভাজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সেচ প্রকৌশলীর সমন্বয়ে গঠিত চার সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ২ মাসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। ধরে নেওয়া হয় যে, দলটি ফরেষ্টাল জরিপ দল কর্তৃক চিহ্নিত তিনটি উচ্চ অগ্রাধিকার এলাকায় কাজ কেন্দ্রীভূত রেখে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে বিশেষতঃ প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাদি, যথা সম্প্রসারণ সুবিধা মূল্যায়ন এবং এলাকাসমূহে অধিকতর কৃষি, উদ্যান উন্নয়নের জন্য একটা কর্মসূচী প্রনয়ণ করবে।

ক: পরামর্শক দল নিয়োগ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের জরিপ দলের উপরোক্ত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সম্পাদিত এক চুক্তি বলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা করার জন্য (১) AGRAR-UND HYDROTEKHNIK GMBH ২) ULG-CONSULTANTS LIMITED এবং ৩) HALCROW, FOX, AND ASSOCIATES নামক তিনটি বিদেশী পরামর্শক সংস্থাকে নিয়োগ করেঃ-

অংশ কঃ চেঙ্গী অববাহিকার সমন্বিত উন্নয়ন,

অংশ খঃ কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় এবং বান্দরবানে নির্বাচিত এলাকাসমূহে উদ্যান ফসল উৎপাদন ও বিপননে সাহায্য প্রদান,

অংশ গঃ মাইনী নদী অববাহিকা এবং কাচলং পুনর্বাসন এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন। চুক্তির শর্ত অনুসারে পরামর্শক সংস্থা সমূহকে নির্ধারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত প্রকল্প-প্রস্তাব প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। এই প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে ছিল প্রকল্পগুলির কারিগরি, আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাব্যতা নিরূপন করা।

প্রকল্প অংশ 'ক' এবং 'খ' এর পৃষ্ঠপোষক এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং অংশ 'গ' এর পৃষ্ঠপোষক জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী যা এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কই বাস্তবায়ন করবে।

খ: পরামর্শক দলের প্রতিবেদন ঃ

পরামর্শক সংস্থাগুলির সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পরামর্শক দলের প্রথম দলটি ঢাকা আসে। পরামর্শক দল ১৯৭৮

www.pathagar.com

সালের ১৪ই মার্চ একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করে। একই বছরের ২২শে মে পরামর্শক সংস্থাসমূহ চূড়ান্ত মাঠ প্রতিবেদন দাখিল করে। (Chittagong Hill Tracts Development Projects Final Field Report).

প্রকল্প লক্ষ্যসমূহঃ

পরামর্শক সংস্থা সমূহের প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট প্রকল্প লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়, যা গুরুত্ব অনুসারে সাজানো হয়েছে।

(১) পাহাড়ী জনগণের প্রধান প্রধান প্রয়োজন সমূহের সর্বোচ্চ মাত্রায় পূরণ করা,

(২) উপজাতীয় অখন্ডতা সংরক্ষণ করা,

(৩) উপজাতীয়দের সামাজিক বিপর্য্যয়/অসন্তোষ সর্বনিম্ন পর্য্যায়ে কমিয়ে আনা।,

(৪) জনগণের সর্বাধিক অংশের অংশগ্রহণ,

(৫) আয়ের বৃদ্ধি, নিশ্চয়তা এবং স্থায়িত্ব বিধান,

(৬) পল্লী অঞ্চলের জনগনের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থনৈতিক সুবিধাদি প্রদান,

(৭) স্বল্পসময়ে সুবিধাদি প্রদান (দ্রুত ফলপ্রসু প্রকল্প গ্রহণ),

(৮) পল্লী অঞ্চলের জনগণের সর্বোচ্চ মাত্রায় সামাজিক সুবিধাদি প্রদান,

(৯) এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে/পরিমাণে সদ্ব্যবহার (প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা),

(১০) এলাকাকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতধারা এবং অর্থনীতির সাথে যুক্ত করা (জাতিগঠন), এবং

(১১) জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণ করা।

উপজাতীয়দের জরুরী প্রয়োজন সমূহঃ

পরামর্শক সংস্থা সমূহের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, উপজাতীয়দের জরুরী প্রয়োজন অজস্র। মাঠ পর্য্যায়ে পরিচালিত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরামর্শক সংস্থাসমূহ তাদের জরুরী প্রয়োজনগুলির নিম্নোক্ত তালিকা প্রস্তুত করেছেঃ–

(১) বাঙালীদের সাথে সমমর্যাদা/সমকক্ষতা, (২) পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যান্য জেলার সম পর্য্যায়ে আনয়ন, (৩) অভ্যন্তরীন লোক আগমন/আবাসন

www.pathagar.com

হ্রাস করা, (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ, (৫) উপজাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা এবং বর্ণমালা ব্যবহার ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান, (৬) কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, (৭) উপজাতীয় সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, (৮) কৃষি সম্প্রসারণ (৯) তৃণভূমি এবং পশুসম্পদ উন্নয়ন (১০) উচ্চভূমি সমতলকরণ, (১১) বিভিন্ন জাতের ফলের চাষাবাদ, (১২) উত্তর থেকে দক্ষিণগামী সড়ক (১৩) পূর্ব থেকে পশ্চিমগামী সড়ক, (১৪) পশ্চিম থেকে পূর্বদিকগামী আন্তঃঅববাহিকা সড়ক, (১৫) মারিশ্যা থেকে মাইনীমুখ পর্য্যন্ত সড়ক, (১৬) মারিশ্যা–দীঘিনালা সড়ক। (১৭) মারিশ্যা এবং মাইনীমুখে যাত্রীদের জন্য জলযান ঘাট, (১৮) মারিশ্যায় কাচলং নদীতে সেতু নির্মাণ, (১৯) নদীসমূহের পলিমাটি অপসারণ, (২০) রাঙ্গামাটি–চট্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন, (২১) পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে সংযোগ সড়ক, (২২) পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ সড়কসমূহের সংস্কার (২৩) খাগড়াছড়ি–ছোটমেরুং সড়ক, (২৪) খাগড়াছড়ি–পানছড়ি–দীঘিনালা সড়ক, (২৫) বর্ষা মৌসুমে উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগের সুযোগ, (২৬) সাধারণভাবে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, (২৭) ডাকঘর, (২৮) পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, (২৯) সম্প্রসারণ সুবিধাদি, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সরকারী সুবিধাদি ভোগ করার জন্য অধিক পরিমাণ যানবাহন এবং নৌকা, (৩০) ব্যক্তিগত পরিবহণ খাতে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, (৩১) বিপনন, পরিবহণ এবং সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, (৩২) উপজাতীয়দের দোকানের মালিকানা প্রদান, (৩৩) বিপনন অবকাঠামো উন্নয়ন, (৩৪) প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধাদি, (গৃহ–ভিত্তিক শিল্পের বিপনন এবং প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে) (৩৫) শিক্ষা (মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রতি মৌজায় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতি থানায় কলেজ স্থাপন)। (৩৬) বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংস্কার এবং সুসজ্জিতকরণ (৩৭) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (মহিলাদের জন্য তাত বুননসহ), (৩৮) কৃষি, সাক্ষরতা এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ে সান্ধ্যকালীন ক্লাশ, (৩৯) শিক্ষা সহায়ক বই ইত্যাদি বিনামূল্যে প্রদান, (৪০) সরকার নিয়ন্ত্রনবহির্ভূত স্কুল কলেজসমূহ জাতীয়করণ করা, (৪১) বেকার যুবকদের চাকুরী প্রদান, (৪২) সেচ (পাম্প, নদীতে ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ, টিউব অয়েল, জলাশয়, স্থায়ী খাল, গভীর কূপ) এবং পানি নিস্কাশন, (৪৩) পানীয় জল (নদী টিউব অয়েল, গভীর কূপ), (৪৪) যন্ত্রাদি মেরামত কারখানা, এবং স্থানীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণ, (নৌকার ইঞ্জিন, পাম্প, বেবিটেক্সি ইত্যাদি), (৪৫) কুটির শিল্প, (৪৬) ক্ষুদ্র এবং মধ্যম শ্রেণীর শিল্প, (৪৭) বৃহৎ–শিল্প, (৪৮) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উপায়ে আহরণ এবং দ্রুত বর্ধনশীল জাতের বাঁশের বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বনজ সম্পদ উৎপাদন সম্প্রসারণ, (৪৯) সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জনবসতি এলাকাগুলি বনের আওতামুক্তকরণ, (৫০) বসতি স্থাপনের জন্য অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল বনের

www.pathagar.com

আওতামুক্তকরণ, (৫১) জুমিয়াদের আয়ের বিকল্প ব্যবস্থা হওয়ার পর বনায়ন করা, (৫২) ঋণ সুবিধা, (৫৩) হ্রদে স্থানীয় লোকদের অধিকতর সুবিধাদি প্রদান, (৫৪) পল্লী বিদ্যুতায়ন, (বিশেষতঃ কাচলং অঞ্চলে) (৫৫) বর্ধিত এবং উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধাদি, (৫৬) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ, (৫৭) জন্ম নিয়ন্ত্রন এবং পরিবার পরিকল্পনা, (৫৮) ছোট মেরুং, মাইনীমুখ, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, পানছড়ি এবং লোগাং-এলাকায় সব খাতে উন্নয়ন, এবং (৫৯) প্রশাসনিক অবকাঠামো ইত্যাদিতে বস্তুগত সম্পদের বিনিয়োগ।

সংক্ষেপে এই প্রয়োজনগুলি একটি জনগোষ্ঠির আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত করে, যার মূল লক্ষ্য নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ অথবা আয় নয়। বরং তাদের নিরাপত্তা, সমতা এবং তাদের অবনতিশীল জীবনমান রোধ করা।

উন্নয়ন কৌশলের প্রধান প্রধান দিকসমূহঃ

পরামর্শক সংস্থাসমূহের প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কৌশলের নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান দিকগুলির উপর জোর দেয়া হয়ঃ-

(১) অবকাঠামোয় তুলনামূলকভাবে বেশী বিনিয়োগ,

(২) প্রতিষ্ঠানসমূহে তুলনামূলকভাবে বেশী বিনিয়োগ,

(৩) মানব সম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান,

(৪) উৎপাদনে বিশেষতঃ কৃষি উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইউনিট,

(৫) কৃষি এবং বনজ সম্পদে মূল্যবৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট,

(৬) কৃষি ব্যবস্থা অথবা কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক মনোভাব,

(৭) এমন ধরণের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচী তৈরী করা যা সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে সহজলভ্য এবং যা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর অভাবের কথা স্বীকার করে।

(৮) উন্নত বিপনন ব্যবস্থা, যা কেবলমাত্র নতুন প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকবে। যাতে, বিপননের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তৈরী করা কাঠামো এবং শক্তি সমূহের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলবে।

(৯) তিনটি অববাহিকার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম মুখী মজবুত সংযোগ (তবে বাইরের সাথে নয়),

www.pathagar.com

(১০) বাজারে পৌঁছানো সহজলভ্য এবং সহজসাধ্য, উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি/সামগ্রী, পরামর্শ, সম্প্রসারণ এবং সামাজিক সুবিধাদি সহজলভ্য করার জন্য অববাহিকা সমূহের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণমুখী যোগাযোগ।

(১১) একটি মজবুত এবং শীর্ষ পর্য্যায়ের বসতির নমুনা/কাঠামো

(১২) গ্রামের অবস্থান এবং আকার এমন ধরণের হবে যার সুবিধাদি সর্বনিম্ন ব্যয়ে বৃদ্ধি করা যাবে,

(১৩) রাবার, বাঁশ, পশুখাদ্য, এবং দ্রুত বর্দ্ধনশীল গাছের উৎপাদন এবং উন্নয়ন করা, যাতে পাহাড়ী অর্থনীতি টিকে থাকতে পারে,

(১৪) ব্যক্তিগত অথবা গ্রামভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে পশু এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন,

(১৫) কুটির শিল্পের অধিকতর উন্নয়ন, যা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে একীভূত করা যাবে,

(১৬) একটি সাংগঠনিক কাঠামো যা অন্তর্মুখী এবং যা নিজেকে এবং এলাকাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে,

(১৭) সতর্কতার সাথে নির্ধারিত পুঁজিবিনিয়োগের একটা হার যা এলাকার বসবাসকারীদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সুবিধা প্রদান করবে।

(১৮) অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠনে এবং তৃণমূল পর্য্যায়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান,

(১৯) প্রকল্প এলাকা এবং তথায় বসবাসকারী জনগণের সমস্যা সমাধান কল্পে কৃষি গবেষণা কর্মসূচী,

(২০) সম্প্রসারণ কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা, যারা নিজেদেরকে উৎপাদনকারীদের সহিত সম্পৃক্ত করতে পারে এবং উৎপাদনকারীরা যাদের কাছে পরামর্শ চাইতে পারে,

(২১) সব প্রকল্পের কঠোর সরেজমিন তত্ত্বাবধান,

(২২) জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম-ঘন প্রকল্প (অর্থাৎ শ্রম এবং পুঁজির উচ্চ অনুপাতের প্রকল্প),

(২৩) যতদূর সম্ভব ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত উপজাতীয় দক্ষতার উপর সাধারণভাবে গুরুত্ব প্রদান,

www.pathagar.com

গ: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন মহা–পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাঃ

উপরে বর্ণিত উন্নয়ন কৌশল মূলতঃ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নির্ধারিত একটি কৌশল। কারণ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় জনগণ সংখ্যাগরিষ্ট এবং জেলার সর্বত্র একই ধরণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজমান। সুতরাং তিনটি উত্তর অববাহিকা এবং কাপ্তাই হ্রদ ও বান্দরবান অঞ্চলের কয়েকটা কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে এই জরিপকে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৪টি অথবা ৫টি উন্নয়ন এলাকায় বিভক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন মহা পরিকল্পনা" গ্রহণ করার জন্য পরামর্শক দল সুপারিশ করেছে। এই অঞ্চলগুলি নিম্নরূপ হতে পারেঃ–

(১) তিনটি উত্তর অববাহিকা (তৎকালে জরিপাধীন),

(২) তিন উত্তর অববাহিকার পূর্বে অবস্থিত এলাকা,

(৩) রাঙ্গামাটি কাপ্তাই হ্রদের চন্দ্রঘোনা পর্য্যন্ত মধ্য অঞ্চল,

(৪) দক্ষিণ অঞ্চল (সম্ভবত দুটি অংশঃ (ক) বান্দরবান–রুমা অঞ্চল, (খ) লামা অঞ্চল এবং সর্বদক্ষিণ অংশ)।

পরামর্শক সংস্থাসমূহের মাঠ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে তিনটি উত্তরাঞ্চলীয় নদী অববাহিকার যে নিবিড় উন্নয়ন শুরু হচ্ছে অন্যান্য এলাকাগুলিকে সে ধরণের উন্নয়ন থেকে বাদ দেওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে যেসব অঞ্চলকে উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেসব অঞ্চলের মধ্যেও এতে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক রেষারেষি সৃষ্টি করবে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এই মহা–পরিকল্পনা সম্পদের সর্বোচ্চ পরিমাণে সদ্ব্যবহার, সুবিধাদির বন্টন এবং শুধুমাত্র কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদেয় সেবার ব্যয় ভাগা–ভাগি করে বহন করতে সাহায্য করবে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এই ব্যয় একবারই প্রয়োজন হবে। যথা, উপজাতীয় ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য একটি রেডিও এবং একটি টেলিভিশন কেন্দ্র নির্মাণ ব্যয়, ইত্যাদি।

পরামর্শক দলের জরীপের ফলাফল ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সুপারিশ ঃ

পরামর্শক দল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন, জরিপ এবং বিদ্যমান সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৎকালীন অবস্থা ও বিদ্যমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কাজ পর্য্যালোচনা করে। সকল খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

www.pathagar.com

পর্য্যালোচনান্তে ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্য্যন্ত ২২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন-পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি দৃশ্যকল্প প্রতিবেদনে রচনা করেছে।

পরামর্শক দল কর্তৃক অঙ্কিত দৃশ্যকল্প অনুসারে, যে সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সম্পূর্ণ হবে, সেসময় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বিশেষভাবে প্রকল্প এলাকাসমূহ নিজেদেরকে নিম্নবর্ণিত চেহারায় তুলে ধরবে (সেই ২০০০ সালকে প্রাথমিকভাবে একটি লক্ষ্যমাত্রার বছর হিসাবে ধরা হয়েছে)ঃ-

(১) সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি উন্নয়ন মহা-পরিকল্পনা প্রণীত এবং অনুমোদিত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন কাজ পুরাদমে চল্‌ছে। এমনকি এর সুপারিশসমূহের শতকরা ৫০ ভাগ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে;

(২) প্রকল্পের প্রাথমিক পর্য্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে, সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এটাই পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী প্রণয়ণের প্রধান কর্তৃপক্ষ। সমন্বয়, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, বাস্তবায়নাধীন এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা এবং হিসাবরক্ষণের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে গবেষনা চালনার দায়িত্ব এর উপর অর্পণ করা হয়েছে;

(৩) উপজাতীয়দের বিপুল সংখ্যাগরিষ্টের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতর (যথা কতৃপক্ষ) অথবা উপরের স্তর (যথা, নীতি নির্ধারণী ইউনিট) হিসাবে একটি সিদ্ধান্তদানকারী ইউনিট সৃষ্টি করা হয়েছে;

(৪) যে সকল বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রাথমিক ইউনিট গঠন করা হয়েছিল তাদের ন্যায় বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রকল্পটির জন্য একটা প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালনা ইউনিটটি খাগড়াছড়ি অথবা রাঙ্গামাটিতে স্থাপন করা হয়েছে। যে কটি ইউনিট সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করছে এটি সেধরনেরই একটি ইউনিট;

(৫) ২-৩ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ৭টি থানার থানা প্রকল্প কমিটি সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত দানকারী ইউনিটকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ দিচ্ছে;

(৬) উপজাতীয়দের সংস্কৃতি এবং অখন্ডতা প্রায় পুরোপুরি সংরক্ষণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশের বাকী অংশের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে;

(৭) প্রকল্প এলাকা 'ক' এবং 'গ' -এর 'ক' শ্রেণীর ৩৫,৩৪৫ একরের সম্পূর্ণ জমিকে নিবিড় ধান চাষের আওতায় এনে প্রতিটি এলাকা প্রায় ৮৪,০০০

www.pathagar.com

টন ধান উৎপাদন করছে, যার ফলশ্রুতিতে প্রতি এলাকা প্রায় ৩৯,০০০ টন ধান রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। 'ক' শ্রেণীর জমির যে অংশ এযাবত ধান চাষের আওতায় ছিল পানি সেচের মাধ্যমে সে অংশে সব্জি এবং তৈলবীজ চাষের প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে;

(৮) প্রকল্প এলাকা 'ক' এবং 'গ' এর ৩৬,৯৪৯ একরের 'খ' শ্রেণীর সম্পূর্ণ জমি এবং শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ 'গ' শ্রেণীর জমি। (৭০,০০০ থেকে ৮৫,০০০ একর) রবার, তৈলবীজ, আনারস, লেবু, তুলা, ইক্ষু, সবজী, কলা, ডাল এবং বাঁশ জাতীয় বার্ষিক অথবা চিরস্থায়ী শিল্প এবং উদ্যান ফসল উৎপাদনের আওতায় আনা হয়েছে;

(৯) ১৯৪,০৮৯ একর গ-ঘ এবং ঘ শ্রেণীর জমি বিভিন্ন প্রকারের বন এবং কৃষিজ-বনের আওতায় আনা হয়েছে;

(১০) পশু সম্পদ খাত পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন করছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগী, শুকর এবং দুগ্ধ উৎপাদন পশু পালন শুরু হয়েছে;

(১১) শীর্ষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত উপজাতীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পদ্ধতির সাথে সমন্বিত করা হয়েছে;

(১২) ক্ষুদ্র এবং মাঝারী পর্যায়ের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসমূহ পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন করছে। প্রথম বৃহৎ ইউনিটগুলি এগিয়ে আসছে;

(১৩) সকল থানা সদর এবং সকল মৌজা কেন্দ্রের ৫০ শতাংশকে সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করে প্রকল্প এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে ঘন একটি সড়ক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে;

(১৪) ১০০০ জনের অধিক লোক অধ্যুষিত সকল বসতি এলাকা বিদ্যুৎ, প্রতিদিন প্রত্যেকে ২৫ গ্যালন পরিমাণ পরিষ্কার পানীয় জল এবং যথাযথ স্বাস্থ্য সুবিধাদি পাচ্ছে;

(১৫) কাপ্তাই হ্রদ, সব বাজার এবং গ্রাম, নদী এলাকার হ্রদে উঠা-নামা করার এবং মালামাল মজুদ করার সুবিধা পাচ্ছে। কাপ্তাই হ্রদের উপর দিয়ে চলাচল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মোটর চালিত যান ব্যবহৃত হচ্ছে। হ্রদের প্রায় সব ঘাটে নৌকার ইঞ্জিন মেরামত এবং জ্বালানি গ্রহণের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে;

(১৬) থানা সদরগুলির নগরায়ন সবে মাত্র শুরু হবে। নগরায়নের দিক থেকে খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটির পরে দ্বিতীয় স্থান লাভ করবে;

www.pathagar.com

(১৭) শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাড়ীতে বিদ্যুৎসহ টেলিভিশন সেট, শতকরা ৯০ ভাগ বাড়ীতে রেডিও এবং শতকরা ৬০ ভাগ বাড়ীতে রেফ্রিজারেটার থাকবে;

(১৮) শতকরা ৫০ ভাগ স্বাক্ষরতাসহ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে। পর্য্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (প্রতিষ্ঠান)সহ প্রতি থানা সদরে একটি কলেজ থাকবে। তিনটি নদী অববাহিকায় ৩টি কলেজ ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষা দান করবে;

(১৯) পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নতি ঘটবে, আয়ুষ্কাল ১৯৭৮ সালের ৩৩ বছর থেকে ৫০ বছর পর্য্যন্ত বেড়ে যাবে;

(২০) উপজাতীয় সামাজিক প্রথা এবং প্রধানতঃ কাপ্তাই হ্রদের আশে পাশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় পর্যটনের প্রাথমিক চিহ্ন ফুটে উঠেছে, যা বর্তমানে উত্তরাঞ্চল অববাহিকাসমূহে বিকাশ লাভ করছে;

(২১) কাপ্তাই হ্রদের উপর রাঙ্গামাটি অথবা এর আশেপাশে অবস্থিত এবং পুরাপুরিভাবে চালু একটি জলজ সম্পদ গবেষনা ইনসটিটিউটের সহায়তায় কাপ্তাই হ্রদে এবং নদী বরাবর মৎস্য শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে;

(২২) সম্ভবতঃ শল্যচিকিৎসার প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত থানা পর্য্যায়ে চিকিৎসা সুবিধাদি (আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত) পূর্ণ মাত্রায় চালু হবে;

(২৩) রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের একটি উপ-কেন্দ্র উপজাতীয় ভাষায় দৈনিক বেশ কয়েক ঘন্টা কৃষি এবং উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য তথ্যাদি সম্প্রচার করবে;

উপরে যে দৃশ্যকল্প রচনা করা হয়েছে তা ২২ বছর মেয়াদী একটি বহুমুখী সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হবে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের ক্রম অনুসারে চারটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন খাতের পৃথক পৃথক কার্যক্রমের পরিধি এবং সীমারেখা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যাবে না।

চারটি পর্য্যায়ের প্রধান প্রধান কাজ হবে নিম্নরূপঃ-

প্রথম ধাপ (১৯৭৮-৮০ সালের ২ বছর মেয়াদী কার্যক্রমের অনুরূপ)ঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শক্তিশালীকরণ এবং রাঙ্গামাটি অথবা খাগড়াছড়িতে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা, (২) থানা প্রকল্প কমিটি গঠন, (৩) জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ৭৫০০ একর উঁচু-নীচু পাহাড়ী

www.pathagar.com

জমি জরিপ, সমতলকরণ এবং ফলের বাগান গড়ে তোলার প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করা, (৪) সেচ প্রকল্প জরিপ করা (২৩০০ একর), তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুদ্র আকারে পানি সেচ করা, তিনটি কৃষি প্রশিক্ষণ, গবেষনা এবং সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন (চেঙ্গী অববাহিকায় একটি প্রধান এবং মাইনী কাচলং অববাহিকায় একটি করে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেন্দ্র), (৫) কারু ও হস্তশিল্পে উৎসাহ দানের জন্য একটি ভ্রাম্যমান সেবা কেন্দ্র স্থাপন, (৬) চাউল এবং উদ্যান ফসলের জন্য একটি উপকরণ এবং ঋণ কর্মসূচী চালু করা, যার সুবিধাদি প্রকল্প এলাকা খ-এর উদ্যান ফসলের জন্য সম্প্রসারিত হবে এবং তাতে একটি ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল অন্তর্ভূক্ত থাকবে, (৭) প্রত্যেক অববাহিকার জন্য আনারস/ফল/হলুদ/আদা প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রথম ক্ষুদ্র-আকারের ইউনিট নির্মাণ ও চালুকরণ, ধান ভাঙার মিল ও মজুতকরণ সুবিধাদি, (৮) কুটির শিল্পের কার্যক্রম জোরদার করা, (৯) তৈল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা; (১০) খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে একটি করে শিল্প নগরী স্থাপন, (১১) বনজ শিল্পের নার্সারীর জন্য ভূমি জরিপ এবং প্রস্তুতি, (১২) খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা এবং দীঘিনালা-মারিশ্যা এবং সংযোগ সড়কের জরিপ এবং নক্শা, (১৩) কাপ্তাই হ্রদে কয়েকটি ছাউনি-ওয়ালা বিপনন পন্টুন (ভাসমান এবং ভ্রাম্যমান সেতু) নির্মাণ এবং উভয় প্রকল্প এলাকায় মালামাল মজুত সুবিধাদি, (১৪) থানা সদরের জন্য নগরায়ন পরিকল্পনা, (১৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন মহা-পরিকল্পনার কার্যক্রমের সূচনা, (১৬) ১৯৯০ সালে জনসংখ্যা ১০০০ ছাড়িয়ে যাবে এমন সব গ্রামের জন্য পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃ প্রনালী এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদির নিবিড় কর্মসূচীর সূচনা, (১৭) পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর ব্যাপক পরিকল্পনা, (১৮) কৃষি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর্মচারী-কর্মকর্তা প্রশিক্ষনের জন্য খাগড়াছড়ি দীঘিনালা, মারিশ্যা এবং বান্দরবানে ভবণ নির্মাণ, (১৯) উপজাতীয় সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করা, (২০) পল্লী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন এবং আধা-পাকা ভবণ নির্মাণ, (২১) পশুসম্পদ উপ-খাতের অধীনে একটি করে শুকর, ছাগল এবং হাঁস উৎপাদন খামার স্থাপন, (২২) নির্বাচিত থানা কেন্দ্রে পশু হাসপাতাল নির্মাণ, নিয়মিত গণ টীকাদান, রাঙ্গামাটিতে রোগ নির্ণয় উপকেন্দ্রে কাজ শুরু করা, (২৩) ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে খাদ্য সরবরাহ কর্মসূচী চালুকরণ, পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, (২৪) বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহে সজ্জা এবং শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ, (২৫) সরকারী বিদ্যালয়সমূহের মানের সমপর্য্যায়ে মান উন্নীত করার জন্য বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে আর্থিক অনুদান প্রদান, সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, (২৬) 'ক' ও 'গ' প্রকল্প এলাকার দু'টি কলেজের জাতীয়করণ এবং সেগুলির মান সরকারী কলেজগুলির মানের সমপর্যায়ে উন্নীত

www.pathagar.com

করণ, (২৭) স্বাস্থ্য-সুবিধাদি সেবাসমূহের একত্রীকরণ, বি.সি.জি, ডিপথেরিয়া এবং ধনুষ্টংকারের টীকাদান অভিযান শুরু করা, (২৮) উচ্চ এবং পার্শ্ববর্তী অববাহিকায় পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করা, পুকুরে, জলাশয়ে মৎস্য চাষ ইন্সটিটিউট এর জন্য স্থান নির্বাচন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুরূপঃ (১৯৮০-৮৫)ঃ

(১) ৬০০০ একর উচু-নীচু পাহাড়ী জমিতে প্রথম পুনর্বাসন কাজ শুরু, (২) উদ্যান উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি ৫০০০ একর হিসাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সম্ভাবনাময় এলাকার জরিপ; (৩) সব প্রকল্প এলাকায় পূর্ণমাত্রায় কৃষি সম্প্রসারণ, (৪) দীঘিনালার কাছে সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু করা, (৫) কাচলং অববাহিকার উত্তরে সেচ প্রকল্পের জরিপ এবং সেচের জন্য অপর ২০০০ একরের জরিপ কাজ শুরু করা, (৬) দীঘিনালায় বাঁশের চারা রোপন শুরু করা, (৭) পাল্প মিল নির্মাণ শুরু করা, এবং বাঁশ রোপনের তিনবছর পরে মিলের কাজ শুরু করা, (৮) পুনঃ বনায়নের জন্য ৩০,০০০ একর জরিপ, (১৯) কাপ্তাই হ্রদে এবং বান্দরবানে প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট নির্মাণ, (১০) খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা, রাঙ্গামাটি-চন্দ্রঘোনা এবং দীঘিনালা-মারিশ্যা সড়ক নির্মাণ, (১১) সংযোগ সড়ক, বিশেষতঃ মারিশ্যা মাইনীমুখ এবং খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়ক জরিপ এবং নির্মাণ, দীঘিনালা-ছোট মেরুং সড়ক জরিপ, (১২) প্রকল্প এলাকার সকল বাজারের উন্নয়ন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণাগার নির্মাণের দাবী পরীক্ষাকরণ, (১৩) ধানমাড়াই মিল, ক্ষুদ্র আকারের তৈল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প পূর্ণমাত্রায় চালুকরণ, (১৪) মারিশ্যার পুনর্নির্মাণ, এবং দীঘিনালা এবং বোয়ালখালীর সংযোগ স্থাপন, (১৫) বান্দরবান এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে এর আওতায় আনার জন্য দুই অথবা ততোধিক ব্যবস্থাপনা ইউনিট সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহা-পরিকল্পনার কাজ শুরু করা, (১৬) পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর শুরু করা, (১৭) বিদ্যুতায়িত পল্লীতে বিশেষতঃ জুমিয়াদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সীমিত সংখ্যক টেলিভিশন সেট বিতরণ, (১৮) কারু এবং হস্তশিল্পীদের গ্রামে যাওয়ার, তাদের প্রশিক্ষণদান, বাকীতে যন্ত্রপাতি বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণে সাহায্য করার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ ইউনিটকে শক্তিশালীকরণ, (১৯) কৃষি সম্প্রসারণ কতৃপক্ষ ৪০০ উপজাতীয় সম্প্রসারণ কর্মকর্তার কাজের ফলাফল, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মচারী নিয়োগ, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ যানবাহনসহ তাদের সাজ-সরঞ্জাম, কার্যালয়, বাসস্থান, উপকরণ এবং অন্যান্য সুবিধাদি পাঁচ বছর যাবত দেখাশুনা করবে, (২০) হাটহাজারীতে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী উপজাতীয়রা ফিরে এসে মধ্যস্তর পূরণ করবে, (২১) প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হবে, (২২) পল্লী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

www.pathagar.com

পূর্ণমাত্রায় চালু হবে, (২৩) পশুসম্পদ খাতে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন কাজ অব্যাহত থাকবে, টীকাদান অভিযান এখন নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, রোগ নিরূপন কাজ এখন স্থানীয়ভাবে সমাধা করা হচ্ছে, (২৪) ছাগল, শুকর, এবং হাঁস উৎপাদন ইউনিটে মজুত সম্পন্ন হয়েছে এবং মজুত মালামাল এখন বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত, (২৫) প্রকল্প বসতি এলাকায় দুধ উৎপাদনকারী গবাদিপশু পৌঁছানো হয়েছে, (২৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্য সরবরাহ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে, (২৭) মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ একটি সন্তোষজনক পর্য্যায়ে পৌঁছেছে, (২৮) প্রতিটি ওয়ার্ডে এলাকায় বসবাসকারী কর্মী রয়েছে। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কার্যকরী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা রয়েছে, প্রতিটি গ্রাম থেকে সহজ দূরত্বে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র (৩-৪ মাইল), (২৯) রাঙ্গামাটিতে পুকুরে ও জলাশয়ে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের জন্য মৎস্য ইনষ্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে এবং কাজ শুরু করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুরূপঃ (১৯৮৫-৯০)ঃ

(১) বাবুছড়া এবং দীঘিনালার মাঝখানে দ্বিতীয় এবং ছোট মেরুং-এর কাছে তৃতীয় বসতি এলাকা যার প্রত্যেকটির আয়তন ৫০০০ একর, নির্মাণ শুরু, (২) দীঘিনালা-ছোট মেরুং সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য সড়ক নির্মাণ, (৩) অতিরিক্ত সংযোগ সড়ক, বিশেষতঃ দীঘিনালা বাবুছড়া এবং পানছড়ি-লোগাং সড়ক জরিপ এবং নির্মাণ, (৪) প্রায় ২০০০ একর জমিতে সেচ প্রকল্প শুরু, (৫) ঋণ এবং উপকরণ কর্মসূচী পূর্ণমাত্রায় শুরু, (৬) বিপনণের সকল বাঁধা দূর করা হয়েছে, (৭) ৩০,০০০ একর জমিতে পুনঃবনায়ন প্রকল্প শুরু, (৮) পানীয় জলসরবরাহ, পয়ঃ প্রণালী/স্বাস্থ্য সুবিধা কর্মসূচী জোরদারকরণ, (৯) পল্লী বিদ্যুৎতায়ন/রাস্তা বিদ্যুতায়ন/টেলিভিশন সেট বিতরণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অর্জিত হয়েছে, (১০) প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, (১১) কৃষি সম্প্রসারণের মধ্যম এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মচারী নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছে, (১২) কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলিতে প্রাক্তন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উচ্চ পর্য্যায়ের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ শুরু, নবনিযুক্ত সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের দু' বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রম চালু, (১৪) সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা তৈরী করা হয়েছে, (১৫) এই মেয়াদকালে সকল থানা কেন্দ্রে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে, এবং সেগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, (১৬) নতুন বসতি এলাকার জন্য দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ তৈরী করা হচ্ছে, (১৭) সম্পূর্ণ পশুসম্পদখাতের পূর্ণক্ষমতা ব্যবহারের পর্য্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, (১৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এখন সবাই পূর্ণযোগ্যতা সম্পন্ন এবং

www.pathagar.com

নিয়মিতভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান পাঠক্রম গ্রহণ করছেন, (১৯) স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু, অপ্রাতিষ্ঠাণিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার অন্যান্য কর্মকাণ্ডে বিকাশ লাভ করছে, (২০) চাকুরীর সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সহজ এবং পরিবর্তনীয় পাঠক্রম উদ্ভাবন করেছে, (২১) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম সাধারণ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে মিশে যাবে, সাধারণভাবে সকল স্বাস্থ্য কর্মচারীদের পদ উন্নীত করা হবে।

চতুর্থ ধাপ (মোটামুটি তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুরূপঃ ১৯৯০–২০০০)ঃ

(১) উদ্যান কর্মসূচীতে তিনটি এলাকায় ব্লাক অর্জিত অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ছে এবং 'খ' শ্রেণীর সকল এবং 'গ' শ্রেণীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমি ফল চাষের আওতায় এসেছে, (২) মারিশ্যা–ছোট মেরুং–খাগড়াছড়ি–দীঘিনালা–পানছড়ি, মাইনীমুখ–মহালছড়ি এবং খাগড়াছড়ি–রামগড় সড়ক সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য হয়েছে, (৩) সংযোগ সড়কের বিস্তার ব্যাপক আকারে বাড়ান হয়েছে এবং সেগুলির মান/অবস্থার ক্রমান্বয়ে উন্নীত করা হচ্ছে, (৪) চাউল উৎপাদন পূর্ণ উদ্যমে চল্‌ছে, (৫) গবেষনা কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে কাজে লাগানো হবে, (৬) ১০০০ অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত সকল বসতি এলাকায় বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে, (৭) ক্রয়ক্ষমতা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভ্রাম্যমান কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের কর্মসংস্থান করেছে এবং থানা সদরের পশ্চাৎভূমির ক্ষুদ্রতর গ্রাম সমূহেও ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্প চালু রাখার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, (৮) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপজাতীয় উচ্চ প্রশাসণিক কর্মকর্তা পেয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে জাতীয় ব্যবস্থায়/পদ্ধতিতে সমন্বিত করা হচ্ছে, (৯) প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস–মুরগী, শুকর, এবং দুগ্ধ উৎপাদন পশু ইউনিট চালু হচ্ছে, এক বা একাধিক পশু খাদ্য উৎপাদন এবং একটি দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে, (১০) শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যখাত পুরাপুরি সন্তোষজনকভাবে চালু হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবিত অঙ্গ–প্রকল্পসমূহ ঃ

যেসব অঙ্গ–প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত দৃশ্যকল্প বাস্তব রূপ লাভ করবে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হলঃ

www.pathagar.com

১.ক: সাংগঠনিকঃ

পরামর্শক দলের প্রস্তাব মতে প্রকল্পের সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য হলঃ-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সমন্বিত উন্নয়নে এর ভবিষ্যৎ কার্যকারীতা নিশ্চিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালী করা,

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপজাতীয় জনগণকে সুযোগ দান করা,

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রকল্প (উত্তর অববাহিকা) যাতে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং সমন্বয়ের একটা নমুনা তৈরী হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র এবং সহজে প্রয়োগ/ব্যবহার করা যায়, তা নিশ্চিত করা।

১.খ: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণঃ

পরামর্শক দলের প্রস্তাব অনুসারে তৎকালিন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে সরকারী এবং উপজাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী অকার্য-নির্বাহী পরিচালক মন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত "কতৃপক্ষে" পরিণত করা হবে। পরামর্শকদল প্রস্তাব করেন যে বোর্ড নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবেঃ-

চেয়ারম্যানঃ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম,
ভাইস-চেয়ারম্যানঃ ডেপুটি কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
সদস্যঃ শাখা প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, ৩ জন উপজাতীয়।

উপজাতীয় জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরাসরি সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের পন্থা হিসাবে পরামর্শক দল তৎকালিন বোর্ডকে একটি নীতি নির্ধারণী সংস্থা এবং একটি কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসাবে আলাদা করার সুপারিশ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তাদের কাজের জন্য একটি স্বাধীন/স্বতন্ত্র কমিটির নিকট দায়ী থাকবেন।

পরামর্শকদলের সুপারিশ মতে কর্তৃপক্ষ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। কর্তৃপক্ষকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের একটি মহা-পরিকল্পনা চালু করার মত একটি কাজও হাতে নিতে হবে। এই নতুন প্রয়োজন পূরণ করার এবং প্রকল্প মূল্যায়নে এর কার্যকারীতা বৃদ্ধি এবং বর্তমান সংগঠনকে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

পরামর্শকদল প্রস্তাব করেন যে, কর্তৃপক্ষের প্রধান হবেন, পরিকল্পনা এবং উন্নয়নে প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উপ সচিবের পদমর্যাদার একজন মহাব্যবস্থাপক।

www.pathagar.com

তাকে সাহায্য করবেন একজন উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং নিম্নোক্ত চারটি শাখার প্রধানগণঃ-

-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গবেষণা,

-পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন,

-প্রকল্প পরিচালনায় পরামর্শ দান এবং বাস্তবায়ন-উত্তর মূল্যায়ন,

- অর্থ এবং প্রশাসন।

১.গ: পরামর্শক কমিটি ঃ

পরামর্শক দল প্রস্তাব করেন যে, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম পরামর্শক কমিটির সভাপতি থাকবেন। তবে এর সদস্য সংখ্যা কমাতে হবে এবং উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব আনুপাতিক হারে বাড়াতে হবে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুসারে উপজাতীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীর বর্তমান প্রতিনিধিগণ, বোর্ডের সদস্যগণ, মহকুমা অফিসারবৃন্দ এবং মহা-ব্যবস্থাপক এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক মিলে কর্তৃপক্ষের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ এর মধ্যে সীমিত থাকবে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের কাজের সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত একটি অতিরিক্ত কার্যকরী কমিটিও গঠন করতে হবে। এই কমিটির সভাপতি হবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার এবং সদস্য থাকবেন, কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সদস্যবৃন্দ এবং জেলার সকল সরকারী বিভাগের প্রধানগণ।

১.ঘ: পার্বত্য চট্টগ্রাম (উত্তরাঞ্চলীয় অববাহিকা) প্রকল্প ঃ

প্রস্তাব করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের অধীনে/মধ্যে আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম (উত্তরাঞ্চলীয় অববাহিকা-সমূহ) প্রকল্প গঠন করতে হবে, যা উন্নয়নের সূচনাকাল সফলভাবে সমাপ্ত করার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাধারণ সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে একীভূত করা হবে।

আরও প্রস্তাব করা হয় যে, সম্ভবতঃ বোর্ড কর্তৃপক্ষের সদর দফতর রাঙ্গামাটিতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করতে হবে, যা সকল প্রকল্প পরিকল্পনা, তহবিল বরাদ্ধ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় এবং সমগ্র প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রম তত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকবে। মূল প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নের দায়িত্ব যথাযথ সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকবে। তাই একটি ক্ষুদ্র উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রন সংস্থা হিসাবে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠিত হবেঃ

- প্রকল্প ব্যবস্থাপক
- উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক

www.pathagar.com

- প্রকল্প প্রকৌশলী
- কৃষি ঋন/বিপনন কর্মকর্তা
- উর্ধ্বতন প্রকল্প প্রশাসক

কারিগরি সাহায্যঃ

একটি কারিগরি সাহায্য দল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে সাহায্য করবে। এটি হবে প্রত্যেক নির্দিষ্ট প্রকল্পের সাথে সরাসরি সংযুক্ত কারিগরি সাহায্য বিশেষজ্ঞদের অতিরিক্ত দল।

অববাহিকা প্রকল্প কর্মকর্তাগণঃ তিনটি অববাহিকার প্রত্যেকটিতে একটি ছোট প্রকল্প কার্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক কার্যালয়ে মাত্র একজন প্রকল্প সমন্বয়কারী কর্মকর্তা থাকবেন। এই কার্যালয় পরিদর্শনকারী প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কারিগরি সাহায্য বিশেষজ্ঞদের স্থানীয় কার্যালয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে।

কমিটি সমূহঃ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি প্রকল্প সমন্বয়কারী কমিটি গঠন করা হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলার সরকারী বিভাগের প্রধানগণকে নিয়ে এই কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে।

মহকুমা প্রশাসককে সভাপতি এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদগুলির চেয়ারম্যান, মৌজা হেডম্যান এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সদস্য করে প্রত্যেক অববাহিকায় একটি উপজাতীয় যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হবে।

পরামর্শক দলের চূড়ান্ত মাঠ প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গ প্রকল্প সমূহের উপর এই পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই বলে সেগুলির একটি তালিকা নীচে তুলে ধরা হল মাত্রঃ

২: সেচের মাধ্যমে সমতল জমির কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ উপ–প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, চেঙ্গী অববাহিকার লোগাং, খাগড়াছড়ি, মাইনী অববাহিকার দীঘিনালা এবং কাচলং অববাহিকার মারিশ্যা এলাকায় তাৎক্ষণিকভাবে ১২৫ একর, মধ্যম মেয়াদে ২৩০০ একর এবং দীর্ঘ মেয়াদে ১৭৫০ একর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

৩: খাঁটি ধানবীজ উৎপাদন ও বিতরণ উপ–প্রকল্পঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, তিনটি অববাহিকায় প্রয়োজন অনুযায়ী ১৯০ টন উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের বীজ উৎপাদন করা। ২৪০ একর জমিতে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত চাষ করে এই বীজধান উৎপাদন করা হবে।

www.pathagar.com

৪: সমন্বিত কৃষি ভিত্তিক বন/শুষ্কভূমিতে ভূমিহীন জুমিয়া পুনর্বাসন উপ–প্রকল্প ঃ

চারটি আদর্শ ব্লকে। এই অঙ্গ-প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে এবং যদি সফল হয় তাহলে অংশ 'ক' এবং 'খ' প্রকল্প এলাকার 'খ' শ্রেণীর সকল জমিতে এবং 'গ' শ্রেণীর একটা বড় অংশে সম্প্রসারণ করা হবে। এর ফসল চাষের নমুনা, উৎপাদন এবং বিপনন সহায়তার দিকগুলি প্রকল্প 'খ' এলাকায়ও সম্প্রসারণ করা হবে।

৫: ভূমিহীন কৃষকদের পূনর্বাসনের জন্য কৃষিভিত্তিক বনায়ন পদ্ধতিতে বাঁশ উৎপাদন উপ–প্রকল্পঃ

এই অঙ্গ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, বাঁশের চাষ করে দীঘিনালায় একটি মন্ড উৎপাদন মিল স্থাপন করা, যাতে শতকরা ৫০ ভাগ বাঁশ এবং ৫০ ভাগ নরম কাঠ ব্যবহৃত হবে। এতে শুধু বাঁশের চাহিদার পরিমাণ হবে ৯০০০ টন। বার্ষিক ৯০০ একর জমি থেকে বাঁশ কেটে এই চাহিদা পূরণ করা যাবে। বাঁশ প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর পরিপক্ক হয় বলে সর্বমোট ৩৬০০ একর জমিতে বাঁশ উৎপাদন করে মিলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

৬: 'ক্ষুদ্র রাবার বাগান' উপ–প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তিমালিকানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাবার বাগান গড়ে তুলে দেশে রাবারের চাহিদা পূরণ করা। হিসাব করা হয়েছে যে ৬০ হাজার একর জমিতে রাবার চাষ করে দশ বছরে দেশে রাবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

৭: 'পশু সম্পদ উন্নয়ন' উপ–প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে রাঙ্গামাটিতে শুকর এবং হাঁস এবং খাগড়াছড়িতে ছাগল উৎপাদন ইউনিট স্থাপন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত রাঙ্গামাটিস্থ মুরগী ইউনিটের কাঠামোগত এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, চেঙ্গী অববাহিকা এবং অন্যত্র প্রকল্প এলাকা পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র মালিকদের (সমবায়) দুগ্ধ উৎপাদন ইউনিট স্থাপন, প্রতি থানায় প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা এবং যানবাহনসহ পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন। প্রকল্পের চতুর্থ বছরে পশুখাদ্য উৎপাদন কারখানা নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য জরিপ চালানো ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৮: সম্প্রসারণ (প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগসহ) ঃ

এই অঙ্গ-প্রকল্প সম্পর্কে পরামর্শকদলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার অঙ্গ সমূহের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য বহু সংস্থার কার্যক্রম থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সমস্যাবলী সমাধানের জন্যে এদের কোনটিকেই সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কর্মীবর্গকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, যাতে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রাথমিকভাবে মাঠ পর্যায়ে নিয়োগ এবং পরে যাদেরকে তত্ত্বাবধান এবং বিষয়বস্তুর বিশেষত্বের ক্ষেত্রে উচ্চতর পদোন্নতি দেওয়া যায়। প্রশিক্ষণ হবে বিভিন্নমুখী, বাস্তব সম্মত এবং পশুপালনকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। কৃষকদেরকে দলগতভাবে প্রশিক্ষণদানের জন্য পল্লী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

বনসংরক্ষণ ও বনায়ন অঙ্গ প্রকল্পসমূহ ঃ

৯.১:পুনঃ বনায়ন কার্যক্রম ঃ

এই অঙ্গ-প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, প্রকল্প এলাকার প্রত্যেক থানায় কয়েক হাজার মিশ্র বন গড়ে তোলা। এই উপ-প্রকল্পের আওতায় মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা এবং পানছড়ি থানা এলাকায় বনায়ন করা হবে। কারণ প্রকল্প এলাকার বাঘাইছড়ি, ছোট মেরুং এবং লংগদু এলাকায় ইতিমধ্যে বন গড়ে তোলা হয়েছে। এই উপ-প্রকল্পের অধীনে দীঘিনালায় ৮০০০ একর, পানছড়িতে ৮০০০ একর, খাগড়াছড়িতে ৪০০০ একর এবং মহালছড়িতে ৪০০০ একর জমিতে বনায়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯.২: পাল্পউড উৎপাদন-উপ-প্রকল্পঃ

এই প্রকল্প 'দীঘিনালা পাল্প মিল' নামে আরও একটি উপ-প্রকল্পের প্রয়োজন পূরণ করবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। এই মিলের কাঁচামালের বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ ১৭ হাজার টন অনুমান করা হয়, যার অর্ধেক অর্থাৎ ৮০০০ টন পাল্পউড এবং বাকী অর্ধেক হবে বাঁশ এবং নরম কাঠ। দেশীয় দ্রুত বর্দ্ধনশীল গাছের পরিপক্কতার সর্বোচ্চ মেয়াদ ১৫ বছর ধরে নিয়ে ৬০০০ একর জমিতে পাল্পউড চাষ করে মিলের চাহিদা পূরণ করা যাবে বলে এতে হিসাব করা হয়েছে।

১০: কৃষি গবেষনা উপ-প্রকল্পঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এযাবত এই অঞ্চলের কৃষির উপর কোন গবেষণা চালানো হয়নি। পরামর্শক দল তাই অনুভব

www.pathagar.com

করে যে, এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য একটা কিছু করা দরকার। এই লক্ষ্যে চেঙ্গী অববাহিকার খাগড়াছড়িতে একটা গবেষনা কেন্দ্র এবং মারিশ্যা ও দীঘিনালায় একটি করে উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। খাগড়াছড়ি গবেষণা কেন্দ্রকে প্রস্তাবিত একটি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে একীভূত করার উদ্দেশ্যও এতে রয়েছে।

১১: আবহাওয়া বিষয়ক কেন্দ্রঃ

চেঙ্গী, মাইনী এবং কাচলং অববাহিকার অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষনের জন্য আবহাওয়া কেন্দ্রের একটা বিস্তার তৈরী এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়ার পর বিজ্ঞানীদের পক্ষে আবহাওয়া অনুসারে বীজ বপন সময়সূচী প্রনয়ন করা সম্ভব হবে, যা বিদ্যমান জমি কার্যকরীভাবে ব্যবহার এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

১২: পল্লী শিল্প উপ-প্রকল্পঃ

প্রকল্প এলাকার পল্লী শিল্প খাতকে উৎসাহিত এবং এর উন্নয়ন সাধনের কার্যক্রম এমনভাবে শুরু করা যাতে প্রাপ্ত উপকারসমূহের একটা বড় অংশ এলাকার বাসিন্দারা ভোগ করে। এক কথায়, এই কার্যক্রমের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে জনগণের উন্নয়ন।

এই কর্মসূচী একটি ইউনিট উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে যা প্রকল্প এলাকার যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র পল্লী শিল্প খাতের জন্য দায়ী থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী শিল্প উন্নয়ন ইউনিটের কাজগুলি হবে নিম্নরূপঃ-

-নীতি অনুমোদন

-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ

-পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম প্রণয়ন

-উদ্দীপিতকরণ

-পুঁজি গঠন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করে পুঁজি বিনিয়োগ বিষয়ে পরামর্শ দান

-মূল্যায়ন

-প্রশিক্ষণ

-কারিগরি তত্বাবধান এবং পরামর্শ সেবা

-বিপননে পরামর্শ দান।

www.pathagar.com

শিল্প মন্ত্রনালয় বিসিক এর মাধ্যমে এর কারিগরি এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে। তবে সেটা অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

১৩: কৃষি বিপনন এবং ঋণ উপ–প্রকল্পঃ

১৩.১: বিপনন

কৃষি এবং উদ্যান ফসল এখনও নতুন অথবা প্রাকৃতিক পর্যায়ে রয়েছে বিধায় এটা প্রস্তাব করা হয় যে, বর্তমান বিপনন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করা হবে না, বরং বেসরকারী খাত যাতে এর কার্যকারীতা বাড়াতে পারে তজ্জন্য যাবতীয় উদ্যোগ এই খাতকে সাহায্য করার জন্যই নেওয়া হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই হচ্ছে এ লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। এই খাতকে অন্যান্য যে সব বড় ধরণের সাহায্য প্রদান করা হবে সেগুলি হল মালামাল মজুদ করার জন্য হাট–বাজারে ছাউনি নির্মাণসহ বিপনন সুবিধাদির উন্নয়ন, ইত্যাদি।

১৩.২: কৃষি ঋণঃ

এই উপ–প্রকল্পের লক্ষ্য হবে নিম্নোক্ত কাজগুলি সমাধা করার নিমিত্তে কৃষকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ লাভের সুবিধাদি প্রদানঃ

–উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপকরণ ক্রয়

–উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য হালের বলদ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়

–মহাজন এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে গৃহীত ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা

–অগ্রিম এবং স্বল্প মূল্যে ফসল বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতা থেকে অর্থকরী ফসল উৎপাদনকারীগণকে মুক্ত করা।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাঙ্কের সহায়তায় একটি ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (Credit Guarantee Fund) গঠন করে এই উপ–প্রকল্প সহায়ক জামানত গ্রহণ ছাড়া জুমিয়া, বর্গাচাষী এবং পুনর্বাসন এলাকার বাসিন্দাদেরকে ঋণ প্রদান করতে সক্ষম হবে। ব্যবহারে কড়া তত্বাবধানের ব্যবস্থা রেখে পন্য উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে।

১৪: স্বল্প মেয়াদী যোগাযোগ উপ–প্রকল্পঃ

প্রকল্প এলাকার বর্তমান কাঁচা রাস্তার সংস্কার এবং উন্নয়ন এবং খাগড়াছড়ি পর্য্যন্ত স্থায়ী রাস্তা নির্মানের জন্য তহবিল বরাদ্ধ, ফটিকছড়ি –মানিকছড়ি, জালিয়াপাড়া–খাগড়াছড়ি সড়কের বদলে রাঙ্গামাটি–মহাল–ছড়ি–খাগড়াছড়ি

www.pathagar.com

সড়কের মান উন্নয়ন, সেতু পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসন, হ্রদ এলাকায় বিশেষতঃ নদী এবং হাট-বাজারে ঘাট এবং সিঁড়ি নির্মাণ এবং মারিশ্যা-মাইনীমুখ সড়ক নির্মাণ এই উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত।

১৫: প্রাথমিক/প্রধান সড়ক নেটওয়ার্ক (বিস্তার) উপ-প্রকল্পঃ

খাগড়াছড়িকে দীঘিনালা, বোয়ালখালী এবং মারিশ্যার সাথে সংযোগকারী সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী সড়ক পর্যায়ক্রমে নির্মাণ এবং কাপ্তাই-চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটির মধ্যে সব ঋতুতে সংযোগ রক্ষাকারী সড়ক নির্মাণ এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত। নির্মাণের মান রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়ক নির্মাণ মানের সমতুল্য হবে।

১৬: দ্বিতীয় শ্রেণী/অপ্রধান সড়ক নির্মাণ।
উপ-প্রকল্প (সংযোগ সড়ক সমূহ)

চেঙ্গী, মাইনী এবং কাচলং অববাহিকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ এই উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত রয়েছে। এই সড়কের মান হবে ২৬ ফুট চওড়া এবং সেতু এবং মূল রাস্তার বিস্তার ১২ ফুট, যাতে প্রতি ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে গাড়ী চলতে পারে।

১৭: "নীচু সংযোগ সড়ক নির্মাণ" উপ-প্রকল্পঃ

প্রকল্প এলাকায় ৫০ মাইল দীর্ঘ নীচু সংযোগ সড়ক নির্মাণ এই উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য। সেতুসহ রাস্তার প্রস্থ হবে ২০ ফুট। গুরুত্বপূর্ণ বসতি এলাকা, উপ-প্রকল্প উন্নয়ন এলাকা এবং সব ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে এসব সংযোগ সড়ক সংযুক্ত করা হবে।

১৮.১: পল্লী বিদ্যুতায়ন উপ-প্রকল্পঃ

প্রাথমিকভাবে দীঘিনালা/বোয়ালখালীতে তৃতীয় দূরবর্তী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষুদ্র ডিজেল চালিত ইউনিট স্থাপন এই প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ডিজেল চালিত ইউনিট স্থাপনের সাথে সাথে কাপ্তাই এবং রাঙ্গামাটি থেকে প্রধান সরবরাহ লাইন চেঙ্গী অববাহিকার উত্তরাঞ্চলে এবং একটি আড়াআড়ি লাইনের মাধ্যমে মাইনী এবং কাচলং অববাহিকায় সম্প্রসারণ এবং তিনটি অববাহিকাতেই বিতরণ লাইনের অধিকতর উন্নয়ন সাধিত হবে।

www.pathagar.com

১৮.২: টেলি যোগাযোগ উপ–প্রকল্পঃ

রাঙ্গামাটি হয়ে খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা এবং মারিশ্যাকে জাতীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্তকরণ কর্মসূচী এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত। এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রাথমিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ সমাপ্ত হবে।

১৯: পুনর্বাসন প্রকল্পঃ

'ক' শ্রেণীর জমিতে কৃষি উন্নয়নের সুযোগ কম। তাই এসব এলাকায় লোক পুনর্বাসনের সুযোগ সীমিত। 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর জমিতে অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান এবং ভরণ পোষণ সুবিধাদির ব্যবস্থা করার সুযোগ রয়েছে। প্রধানতঃ কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক বনজসম্পদ উৎপাদন/আহরণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের এই সুবিধাদি বাড়ানো যাবে। চেঙ্গী অববাহিকার কুকিছড়া এলাকায় উচুঁ নীচু জমিতে একটি আদর্শ প্রকল্প গ্রহণ করে অতিরিক্ত ৬০০ পরিবারের জন্য কর্মসংস্থান করা যাবে। এই প্রথম প্রকল্প সফল হয়েছে ধরে নিয়ে এটা আরও সম্প্রসারিত করা হবে এবং মাইনী অববাহিকার দীঘিনালা এবং ছোট মেরুং, কাচলং অববাহিকার রূপকারীতে অন্যান্য প্রকল্প শুরু করা হবে। জমি প্রাপ্তির প্রাথমিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ১৯৮৮ সালের মধ্যে উপরে বর্ণিত এলাকাসমূহে ১২৫০০ লোককে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

২০: স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (সুবিধা) উপ–প্রকল্পঃ

সরকার বালাদেশের অন্যত্র স্কুলসমূহে স্বাস্থ্যবিধি সম্মত পায়খানা নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং ব্যক্তিগত গৃহে পায়খানা নির্মাণ সংক্রান্ত প্রচার অভিযানে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কুল এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে পায়খানা নির্মাণ এই প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে একটি সাধারণ ভবনে একটি প্রচার কার্যালয় এবং বিক্রয় কক্ষ স্থাপনের মাধ্যমে এই প্রকল্প শুরু করা হবে। প্রচার অভিযান সংগঠিত করার জন্য একজন প্রচার এবং বিক্রয় অফিসার এবং একজন স্বাস্থ্য প্রকৌশলী নিযুক্ত করা হবে। সভা অনুষ্ঠান, বক্তৃতা দান, চায়ের দোকানে, স্কুল, সিনেমাহল, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, প্রচার অফিস পরিদর্শনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে পোষ্টার এবং প্রচারপত্র বিতরণের মাধ্যমে এই অভিযান পরিচালনা করা হবে।

www.pathagar.com

২১: স্বাস্থ্যসেবা উপ–প্রকল্পঃ

বর্তমানে স্বাস্থ্য খাতে গ্রাম পর্য্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী রয়েছেন। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব গন্ডিতে কাজ করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আরোগ্য এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিদ্যমান স্থানীয় স্বাস্থ্য সুবিধাদির বিষয়ে কোন নজর দিচ্ছেনা। তাই বর্তমান পদ্ধতি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিদ্যা, রোগ নিবারন, পুষ্টি, পরিবারের আকার এবং রোগের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুধাবন করার বিষয়ে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কিছুই করেনা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাধারণ উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি একক কাঠামো প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত হওয়ার পর এই কর্মসূচী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রসারিত করা হবে।

২২: 'শিক্ষা' উপ–প্রকল্পঃ

২২.১ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

২২.১.১: স্কুল জরিপঃ

লোকজনের স্থান পরিবর্তনের কারণে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব স্কুলের কোন কোনটা অন্য এলাকায় বিশেষতঃ যৌথ খামার এলাকায় খুলে দেওয়া হয়েছে অথবা খুলে দেওয়া হবে। তবে প্রকল্প এলাকায় কোন স্কুল চালু আছে এবং বাস্তবে কতজন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী স্কুলে উপস্থিত থাকে তা জানা সম্ভব হয়নি। নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে প্রতিটি স্কুল, স্কুল চলাকালীন সময়ে বিনা নোটিশে পরিদর্শন করা একটা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি রেজিষ্টারে রেকর্ডকৃত সংখ্যার এক–তৃতীয়াংশ থেকেও কম এবং সরকারী তথ্যে চালু/সক্রিয় দেখানো হলেও বহু স্কুল (এবং সেকারণে শিক্ষকরাও) অচল।

২২.১.২: স্কুলে খাদ্য সরবরাহঃ

আই. ই.আর (শিক্ষা ও গবেষনা ইন্সটিটিউট)–এর একটি জরিপ থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ১'৫৬টি আসন রয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায়, প্রকল্প এলাকার ৬০০০ টি আসনে কোন ছাত্র ছাত্রী নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৮ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন, যার অর্থ হল অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ না করেও স্কুল গুলিতে আরও ছাত্রছাত্রী পড়ানো যাবে। বাংলাদেশে স্কুলে খাদ্য সরবরাহের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের দ্বারা স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধিতে দারুণ উৎসাহ যোগাবে।

www.pathagar.com

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর কর্মকর্তারা এ ধরণের কার্যক্রমে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহে তাদের ইচ্ছার আভাস দিয়েছেন, যদি ছাত্রছাত্রীদের কনিষ্ঠ ভাই বোনেরাও স্কুলে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমের ফলে স্কুলে উপস্থিতি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়বে। এতে ২৫,০০০ স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এবং ৫০,০০০ ছোট্ট শিশুসহ মোট ৭৫,০০০ স্কুলগামী ছেলে মেয়ের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

২২ঃ ১ঃ ৩: পাঠ্যসূচী সংশোধনঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু ছেলে মেয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় বাংলা বলতে পারে না। যদি স্কুলের প্রথম দু' বছর লিখন এবং পঠনসহ তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে তা এসব ছেলে-মেয়েদের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক হবে।

তাই উপজাতীয় ভাষায় দক্ষ পিটিআই ইনসটিটিউটে একজন প্রতিনিধি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি পাঠ্যসূচী সংশোধন (সময়োপযোগীকরণ) দল গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যসূচী কৃষি, সমাজ সংগঠন এবং সেবা, সংস্কৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ দক্ষতা এবং কারু শিল্প ইত্যাদির অনুকূলে প্রণীত হবে।

নতুন পাঠ্যসূচী প্রকল্প এলাকা থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি থানায় চালু করা হবে। এই পরিবর্তনের সাথে যাতে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তজ্জন্য স্কুল ছুটির সময়ে চাকুরীরত শিক্ষকগণের নিবিড় পুনঃ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে।

২২.১.৪: শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের অতি জরুরী প্রয়োজনগুলি হল-

(১) বর্তমানে ম্যাট্রিক পাশ নন এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান,

(২) প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাদের নিজেদের ভাষা এবং বাংলা ভাষায় পড়ানোর জন্য পারত পক্ষে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা,

(৩) প্রাতিষ্ঠাণিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন এমন শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদান করা।

এছাড়া নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষাদানের জন্য প্রকল্প এলাকার প্রতিটি থানার শিক্ষকদের নিবিড় সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

www.pathagar.com

২২.১.৫: উপকরণ এবং বইঃ

অনেক স্কুলে আসবাবপত্র যথা, বেঞ্চ, ডেস্ক ইত্যাদি নেই। জরিপের মাধ্যমে স্কুলগুলির প্রয়োজন নির্ধারণ করা হবে। স্থানীয়ভাবে আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী স্কুলসমূহে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। খাদ্য এবং বই সরবরাহ কর্মসূচীর কল্যাণে ছাত্রছাত্রীদের বর্দ্ধিত সংখ্যার ব্যয় বহন করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্ধ করতে হবে।

২২.১. ৬: প্রশাসনঃ

বর্তমানে একজন অফিসারের অধীনে ৪৫টি স্কুল রয়েছে। একজন কর্মকর্তার পক্ষে এতগুলি স্কুল নিয়মিতভাবে পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়। আনুমানিক প্রতি ১০ টি স্কুলের জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে (প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন হিসাবে)।

২২.২: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ

২২.২.১: বিদ্যালয় উন্নয়নঃ

বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১০০ জন ডিগ্রিধারী নন এমন শিক্ষক রয়েছেন। তারা যাতে পাশ ডিগ্রি নিতে পারে তজ্জন্য তাদেরকে স্টাইপেন্ড প্রদানসহ পড়াশুনা করার সুযোগ দিতে হবে। তবে ডিগ্রি লাভ করার পর তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের যেকোন মাধ্যমিক স্কুলে কমপক্ষে পাঁচ বছর চাকুরী করতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিযুক্ত করার পর সেগুলির মান মাধ্যমিক পর্য্যায় পর্য্যন্ত উন্নীত করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে। মাধ্যমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মান সরকারী বিদ্যালয়গুলির সহিত সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রীদেরকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সেগুলিকে জাতীয়করণ করতে হবে।

২২.২.২: সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয় এধরনের বিদ্যালয়সমূহঃ

সরকারী স্বীকৃতি পায়নি এমনসব বিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সরকারী সাহায্য ছাড়া চলছে বলে এসব বিদ্যালয়ের মান এবং সুবিধাদি অত্যন্ত নিম্নমানের। বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে মান নির্ধারণের যে পদ্ধতি চালু আছে তা এযাবত অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী প্রমাণিত হয়েছে। তাই এই পদ্ধতি আরও গতিশীল করতে হবে। জনশক্তির একটি সমীক্ষা পরিচালনা না করা পর্য্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সঠিক প্রয়োজন নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে পরিমাণ আসন রয়েছে, তা আগামী

www.pathagar.com

কয়েক বছর পর্য্যন্ত আসনের চাহিদা পূরণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। ছোট মেরুং ছাড়া বর্তমানে অন্যান্য এলাকার স্কুলগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার তেমন জরুরী প্রয়োজন নেই।

২২.৩: কলেজসমূহঃ

খাগড়াছড়ি কলেজই প্রকল্প এলাকার একমাত্র কলেজ। এটা খুব শীঘ্রিই জাতীয়করণ করা হবে এবং সরকার এর উন্নয়ন কাজ সমাধা করবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ভবন এবং উপকরণের চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। আগামী কয়েক বছরে যা প্রয়োজন তা হল পাঠদান বিশেষতঃ বাস্তব কাজের উন্নয়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি কলেজে ডিগ্রী পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। রাঙ্গামাট সরকারী কলেজে এটা সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে। কারণ এতে প্রয়োজনীয় গবেষনাগার রয়েছে।

২২.৪: কারিগরি প্রশিক্ষণঃ

প্রতিবছর ৮০ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রেখে দু'বছর মেয়াদী পাঠক্রমে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর ৪০ জন করে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করে দুটি পাঠ্যক্রম চালু করার চিন্তা ভাবনা চলছে। এতে এলাকার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২২.৫: অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (বয়স্ক শিক্ষা)ঃ

পাহাড়ী জনগণের শিক্ষার নিম্নহার এবং তাদের অনেকের জন্য যে দ্রুত পরিবর্তন আস্‌ছে তাতে অতি সতর্কতার সাথে প্রনীত একটা কার্যক্রমের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের অর্থ হবে সাধারণ জীবনধারা থেকে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের অর্থনীতিতে উত্তরণ। এই অঞ্চলের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, পরিবর্তন সহজে আসেনা, তাই বয়স্ক শিক্ষায় স্বাক্ষরতা, সংখ্যাগঠন, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং গৃহাস্থলী সম্পর্কিত অন্যান্য এবং পেশাগত বিষয়সহ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

২২.৬: রেডিও রাঙামাটিঃ

প্রায় ৫ লক্ষ লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সহজ মাধ্যম হল স্থানীয় বেতার প্রচার। রাঙ্গামাটিতে একটি স্টুডিও স্থাপন করে জাতীয় কার্যক্রম এবং শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, হাট-বাজার, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর স্থানীয়

www.pathagar.com

ভাষা ভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রচার করা যাবে। সব স্কুল এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি যাতে বেতার প্রচার শুনতে পায় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক স্কুলে একটি করে রেডিও সেট দিতে হবে। এসব রেডিও সেট যাতে চালু থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ক্ষুদ্র রক্ষনাবেক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করতে হবে।

২৩: "পানীয় জল" উপ-প্রকল্পঃ

প্রকল্প এলাকায় টিউব অয়েল স্থাপনের উচ্চমূল্য, উপজাতীয় জনগণের দারিদ্র্য এবং জনবসতির বিক্ষিপ্ত অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরামর্শক দল টিউব অয়েল স্থাপন কর্মসূচীর সম্পূর্ণ ব্যয় বহনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছে। প্রকল্প এলাকার ৪৮৩টি টিউব অয়েলের ঘাটতি পূরণ করতঃ বিদ্যমান বসতি এলাকার টিউব অয়েল স্থাপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করার জন্য ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সালে ২৫০-৩০০ নতুন টিউব অয়েলের প্রয়োজন হবে।

২৪: ঐতিহ্যবাহী ঔষধ সরবরাহঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা স্থানীয় চিকিৎসা, জন্ম নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি এবং গাছ-গাছড়া থেকে প্রস্তুত ঔষধ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। প্রকল্পের সামগ্রিক দিক থেকে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এমনকি প্রকল্পের মোট ব্যয় এবং সুবিধাদির উপর এর প্রভাব খুবই সামান্য। তবে এর যথেষ্ট স্থানীয় গুরুত্ব রয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। তাই এ বিষয়ে একটা সমীক্ষা চালানোর জন্য সুপারিশ করা হয়।

পরামর্শকদলের এই প্রতিবেদন মাঠ পর্য্যায়ে সম্পাদিত কাজ, মাঠ পর্য্যায়ের সমীক্ষার ফলাফল এবং অঙ্গ প্রকল্পসমূহের একটি বাহ্যিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে এবং আন্ত-সম্পর্কের দিক থেকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের রূপ লাভ করেছে। এছাড়া প্রতিবেদনে জাতীয় লক্ষ্য, অগ্রাধিকার এবং প্রকল্প কৌশল তুলে ধরা হয়েছে।

কারিগরি, আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা এবং অঙ্গ-প্রকল্প সমূহের নির্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রম এবং আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিশ্লেষণ পরামর্শক দলের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য রেখে দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসের শেষে এই খসড়া তৈরী হওয়ার কথা। মাঠ প্রতিবেদনের সাথে এর তুলনামূলক বিচারের জন্য রাঙ্গামাটিতে তা পাওয়া যায়নি। তাই এই বই লেখার কাজে সেটা ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

সরকারের বিচার-বিবেচনা এবং পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্যই পরামর্শক দল মাঠ এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং পেশ করেছে। তবে সরকার কোন প্রতিবেদনই হুবহু গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তাছাড়া যেকোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়ন সরকারের অভ্যন্তরীন সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

এই বই এর দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী) এবং পার্বত্য চট্টগাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ যাবত বাস্তবায়িত অপরাপর প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম পর্য্যালোচনা কালে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত উপরে উল্লিখিত পরামর্শক দলের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য হুবহু গ্রহণ করেননি। তাই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন কার্যক্রম যে পরামর্শক দলের মাঠ প্রতিবেদনে কল্পিত ২০০০ সালের দৃশ্যকল্প থেকে ভিন্ন হবে, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখেনা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ

অষ্ট্রেলীয় সরকার ১৯৭৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়ক উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ধরণের একটি প্রকল্প পরীক্ষা করার লক্ষ্যে Australian Developments Assistance Bureau উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে Snowy Mountains Engineering Corporation এবং Gavan Mcdonell Company-কে একাজে নিযুক্ত করে।

প্রথমোক্ত কোম্পানী প্রকৌশলগত দিক এবং দ্বিতীয় কোম্পানী আর্থ-সামাজিক দিক পরীক্ষা এবং এলাকা জরীপ করে, The socio-Economic Impact Report" ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে এবং The Economic Appraisals of Roads Report" আগষ্ট মাসে পেশ করে। দুটি প্রতিবেদনকে একত্র করে Chittagong Hill Tracts Development Study: Socio Economic Impact of Roads and Economic Appraisals, August 1977 নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়।

নির্বাচিত সড়কগুলিঃ

প্রথম প্রতিবেদনে চিহ্নিত অগ্রাধিকারগুলির ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সড়কগুলি নির্বাচিত করা হয়। প্রকৌশল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সেগুলিকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ঃ

www.pathagar.com

অগ্রাধিকার 'ক'

১। রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি উন্নতমানের মূল সড়ক নির্মাণ।

২। রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম মূল সড়কের উন্নয়ন।

৩। রাঙ্গামাটি-বান্দরবান উন্নতমানের মূল সড়ক নির্মাণ-এর ৩টি সম্ভাব্য দিকচিহ্ন রয়েছেঃ

(ক) রানীহাট-রাঙ্গুনিয়া-শিলকখাল-বান্দরবান

(খ) ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান।

(গ) রাঙ্গামাটি-হৃদেরতীর-কাপ্তাই-বান্দরবান।

৪। নিম্নমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর সড়কঃ

(ক) খাগড়াছড়ি-পানছড়ি

(খ) খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা এবং

(গ) সম্ভবতঃ বান্দরবান-রুমা।

অগ্রাধিকার 'খ'

১। উপত্যকা সমূহে নিম্নমানের সড়কঃ

(ক) দীঘিনালা-মাইনীমুখ

(খ) দীঘিনালা-মারিশ্যা

(গ) রামগড়-খাগড়াছড়ি

নির্বাচনের কারণসমূহঃ

প্রতিবেদনের "Socio Economic Impact Report" অংশে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সড়কগুলির বর্তমান অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে এবং বাইরে দ্রুত যাত্রী এবং মালামাল চলাচলের উপযুক্ত নয়। এই অঞ্চলে যথোপযুক্ত সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ও উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ এবং সম্ভাবনা রয়েছে।

জরীপ দল ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে পরিচালিত জরীপের সময় উপলব্ধি করে যে, যাত্রী এবং মালামাল দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সড়ক ব্যবস্থার মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তি ছাড়াও বলিষ্ঠ সামাজিক এবং মানবিক যুক্তি রয়েছে।

জরীপ দল বিশেষভাবে চেঙ্গী-মাইনী এবং কাচলং অববাহিকায় কৃষির আরও নিবিড় উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখতে পায়। কৃষির নিবিড় উন্নয়নের ফলে এলাকায় যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। প্রথমদিকে, চেঙ্গী

www.pathagar.com

অববাহিকায় এবং পরে মাইনী এবং কাচলং অববাহিকায় এবং সবশেষে রাঙ্গামাটির দক্ষিণে স্বল্প পরিমাণে এই যান চলাচল বৃদ্ধি পাবে।

প্রস্তাবিত সড়ক উন্নয়ন ব্যবস্থাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব এলাকায় উন্নয়ন কাজ সবচেয়ে বেশী করা সম্ভব সেগুলি হল চেঙ্গী, মাইনী এবং কাচলং অববাহিকা। এলাকার দুর্গমতা এবং বিশালতার কারণে রাঙ্গামাটির দক্ষিণে কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং সুযোগ একেবারে কম। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সে ধরণের একটা সংযোগ অনাকাঙ্খিত। জরীপ দলের প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করা হয় যে, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফলে সড়কের উভয় পার্শ্বে বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে খুব কম সংখ্যক লোকই তাৎক্ষণিক উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রশাসনিক সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে।

জরীপ দলের সুপারিশ সমূহঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক প্রভাব জরিপ করে জরীপ দল এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য একটি প্রাথমিক সড়ক ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে জরীপদল এরূপ একটি ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেঃ

(ক) রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত একটি মূল সড়ক।

(খ) বিদ্যমান রাঙ্গামাটি - চট্টগ্রাম মূল সড়কের উন্নয়ন।

(গ) রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবান পর্য্যন্ত একটি মূল সড়ক।

(ঘ) খাগড়াছড়ি-পানছড়ি, খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা এবং সম্ভব হলে বান্দরবান-রুমা দ্বিতীয় শ্রেণীর সড়ক।

সড়কগুলির অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ

জরীপদল Economic Appraisals of Road নামে আর একটি প্রতিবেদনে উপরে উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে সড়ক নির্মাণ ব্যয় এবং সেগুলির অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সুফল এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব বলয় ইত্যাদি বিষয় মূল্যায়ন করেছে।

www.pathagar.com

মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ

নিম্নোক্ত সড়কগুলির অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয় মূল্যায়ন করা হয়েছেঃ

উত্তরাঞ্চলঃ

		দৈর্ঘ্য(মাইল)
১.	রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি-লোগাং-	৩৯ + ২৪
২.	খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা-	১৬
৩.	দীঘিনালা-মারিশ্যা-	১৩

দক্ষিণাঞ্চলঃ

১.	রাঙ্গামাটি-কাপ্তাই	২০
২.	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান-	৩৪
৩.	রানীহাট-রাঙ্গুনিয়া-বান্দরবান-	৩৫

এই প্রতিবেদনে উত্তরাঞ্চলের সড়কগুলির নির্মাণ ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সুবিধাদি মূল্যায়ন করা হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় সড়কগুলির বিভিন্ন দিক তুলনা করে দেখান হয়েছে। কারণ এই সড়কগুলির মধ্যে রানীহাট-রাঙ্গুনিয়া-বান্দরবান সড়কটি অর্থনৈতিকভাবে উৎকৃষ্ট হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থিত। এই সড়ক নির্মাণ করা উচিত কিনা সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সরকারী সিদ্ধান্তঃ

বাংলাদেশ সরকার অষ্ট্রেলীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় Gavan Mcdonell & Companyর জরীপদল কর্তৃক দাখিলকৃত Socio-Economic Impact Report এর সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং প্রথম পর্য্যায়ে অগ্রাধিকার 'ক' এর ১নং রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি মূল সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকার Chengi Valley Corridor Development Project (Construction of Rangamati- Mahalchari-Khagrachari Road) নামে একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেন।

প্রকল্পের বিবরণ (পিপি) অনুসারে এই সড়কের দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছে ৪১.৬ মাইল। এর নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০৫৫.৯৮ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে

www.pathagar.com

অষ্ট্রেলীয় সরকার ১৬৬১·৩৭ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। অষ্ট্রেলীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত Snowy Mountains Engineering Corporation এর Monthly Progress Report (Report No: 1 to 33, December 1980) থেকে জানা যায় যে, এই সড়ক নির্মানে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সরকার এবং অষ্ট্রেলীয় সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকে সড়ক নির্মাণ কাজের প্রথম পর্য্যায় সমাপ্তির মেয়াদ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ এবং পুরা কাজ ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল।

Monthly Progress Report নং ৩৩, ডিসেম্বর, ১৯৮০ থেকে জানা যায় যে, ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যের ১২২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল এবং ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরের জন্য ৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়। বরাদ্ধকৃত অর্থ ব্যয়িত হওয়ার পর অষ্ট্রেলীয় সরকার এই সড়ক নির্মাণ প্রকল্প থেকে নিজস্ব কর্মকর্তা এবং কর্মচারী প্রত্যাহার করে নেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং অষ্ট্রেলীয় সরকারের পক্ষে Snowy Mountains Engineering Corporation এই সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সড়কের মাত্র প্রাথমিক অবস্থান নির্ধারণ এবং প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। অষ্ট্রেলীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ব্যয়িত হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগ এই প্রকল্পের কাজ চালিয়ে নেন।

১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছর থেকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিচালনার কার্যক্রম শুরু করলে সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের একটি প্রকল্পও চালু করে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে যে ১৩টি সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়, তাতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি সড়কও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই সড়ক নির্মাণের কাজ বর্তমানেও চলছে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র

এই বই-এর অষ্টম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৬ সালে ২০ শে অক্টোবর তারিখে একটি অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৭৭) জারী করে। বোর্ডের গঠন প্রণালী, কার্যাবলী, তহবিল ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের মার্চ থেকে বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু করে। বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ৭৭ নং অধ্যাদেশে বিধৃত বোর্ডের গঠন প্রণালী, কার্যাবলী, তহবিলের উৎস ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। তাই উল্লিখিত বিষয়ে নীচে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হলঃ-

বোর্ডের গঠন প্রনালীঃ

মূল অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে বোর্ড গঠিত হবেঃ-

(ক) চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান হবেন।

(গ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সার্বক্ষনিক এবং একজন খন্ডকালীন সদস্য থাকবেন।

(ঘ) সরকার সার্বক্ষণিক সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে বোর্ডের সচিব নিয়োগ করবেন।

(ঙ) চেয়ারম্যানই বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ সংশোধন করে চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক অধিনায়ককে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম বিভাগের একজন অতিরিক্ত কমিশনারকে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান করা হয়।

পরামর্শক কমিটিঃ

অধ্যাদেশ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি পরামর্শদাতা কমিটি থাকবে। তিন উপজাতি প্রধান, মৌজা হেডম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান প্রতিনিধি এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করার কথা অধ্যাদেশে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বোর্ডের চেয়ারম্যানই পরামর্শদাতা কমিটির সভাপতি। পরামর্শদাতা কমিটির কাজ হল, ছোট বড় প্রকল্প প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান করা। পরবর্তী কালে পরামর্শ দাতা কমিটি এর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

বোর্ডের কার্যাবলীঃ

বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তুত করা,

(খ) দশ লক্ষ টাকার অধিক নয় এমন প্রকল্প অনুমোদন করা এবং অন্যান্য প্রকল্প সরকারের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা,

(গ) অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা,

(ঘ) অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন তদারক করা,

(ঙ) বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে শর্তাদির ভিত্তিতে অর্থ যোগানো,

(চ) ক্ষুদ্র অথবা কুটির শিল্প স্থাপন অথবা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে শর্তাবলীর ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা ইত্যাদি।

বোর্ডের তহবিলঃ

নিম্নোক্তভাবে বোর্ডের তহবিল গঠিত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ২ কোটি টাকার অনুর্ধ একটি স্থায়ী তহবিল,

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে সংগৃহীত ঋণ,

(গ) যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৬ সালের মার্চে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। বোর্ড ১৯৭৮ সালের আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪০ টি প্রকল্প হাতে নেয়। তন্মধ্যে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৫ টি প্রকল্পের কাজ শেষ করা হয়-

১৯৭৮ সালের আর্থিক বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দু'বছর মেয়াদী (১৯৭৮-৮০) আরও একটি কর্মসূচী হাতে নেয়। এই উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী বোর্ডের প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্ধ নিম্নরূপঃ-

www.pathagar.com

খাত	বরাদ্দের পরিমাণ	মোট প্রকল্পের সংখ্যা
শিল্প (কুটির শিল্প)-	৩৫ লক্ষ টাকা-	৭ টি
যোগাযোগ ও পরিবহণ-	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা-	৪৭ টি
শিক্ষা (স্কুল ভবণ সংস্কার)-	৪৭ লক্ষ টাকা-	২৬ টি
কৃষি ও সেচ (৫৪ টি যৌথ খামার সহ)	৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা-	১২৯ টি
সমাজকল্যাণ (কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ)	৬৬ লক্ষ টাকা-	২৪টি
বোর্ডের কার্যালয় ও কমচারীদের বাসভবণ নির্মাণ	১ কোটি টাকা-	২ টি
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট নির্মাণ	৭০ লক্ষ টাকা-	১ টি
	৮ কোটি টাকা	২৩৬ টি

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রকল্পগুলির অধিকাংশই ক্ষুদ্র আকারের যার প্রত্যেকটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩ লক্ষ টাকার কম (Final Field Report on Chittagong Hill Tracts Development Project, submitted by AGRAR-UND-Hydrotechnik GMBH.

ULG Consultants Limited, Halcro, Fox and Associates, Rangamati May. 22. 1978 Page-C-2).

বোর্ড প্রকল্প নির্বাচন এবং তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তবে এই স্বাধীনতা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কর্তৃপক্ষ বোর্ডের তহবিলের একটা বড় অংশ অনুদান হিসেবে অথবা স্বল্পসুদে ঋণ হিসাবে দিতে পারেন (কুটির শিল্প স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে)। সরকারী অনুদান/ঋণ প্রদানের ব্যাপারে পরীক্ষা ও অনুমোদনের যেধরণের দীর্ঘসূত্রীতা অবলম্বন করা হয়, বোর্ড তা এড়িয়ে যেতে সক্ষম (প্রাগুক্ত Report, Page G-2)।

ইতিমধ্যে ১৯৭৯-৮০ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ১৯৮০-৮১ সালে আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। এই

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সাথে দুটি পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করে। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও ইউনিসেফের ন্যায় দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশগ্রহণের ফলে বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আগের চাইতে অনেক সহজ হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে বাংলাদেশ সরকার সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ স্থাপন, বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মানের লক্ষ্যে একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৮৯-৯০ সালের আর্থিক বছরে উক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত এবং অবহেলিত উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে কয়েকটি বড় এবং অসংখ্য ছোটখাট প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ট গরীব উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তা পর্যালোচনা করলেই এর সাফল্য ব্যর্থতা পরিমাপ করা যাবে। বোর্ডের কার্যক্রম প্রকল্প ভিত্তিতে পর্য্যালোচনা করেই কেবল সমাজে এসব কার্যক্রমের সুফল মূল্যায়ন করা সম্ভব। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আপামর জনগণ বিশেষতঃ উপজাতীয় জনগণের (যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এসব কার্যক্রম) আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তা যাচাই করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ-

১: বোর্ডের সাধারণ (নরমাল) কর্মসূচীঃ

১.ক: যৌথ খামার প্রকল্পঃ

ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যৌথ খামার প্রকল্প হাতে নেয়। প্রথমে তৎকালীন খাগড়াছড়ি মহকুমাতেই ভূমিহীন জুমিয়া পুনর্বাসনের এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মেয়াদ ছিল তিন বছর। প্রধানতঃ আনারস, কলা, এবং

www.pathagar.com

কাজুবাদাম চাষের জন্য একই এলাকায় প্রতি পরিবারকে ৫একর পাহাড়ী জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই জমিতে ফলের বাগান গড়ে তোলার জন্য প্রতি পরিবারকে নগদ টাকা, চারা, বীজ ইত্যাদির দাম বাবদে তিন বছরে ১৫০০০/০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। তদানীন্তন খাগড়াছড়ি মহকুমায় ৬৬টি ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে ৩৩০ একর পাহাড়ী জমি বরাদ্ধ দেওয়া হয় (Agricultural and Horticultural Development in Ctg Hill Tracts. By B. GRIMWOOD).

অনুরূপভাবে বর্তমান রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলাধীন বালুখালী ও মগবান ইউনিয়নে দুটি যৌথ খামার স্থাপন করা হয়। বালুখালী ইউনিয়নের রাঙ্গামাটি মৌজায় এবং মগবান ইউনিয়নের জীবতলী মৌজায় এই দু'টি যৌথ খামার স্থাপন করা হয়। যৌথ খামারের সদস্যরা কলা, আনারস এবং কাজু বাদামের চাষ ঠিকই করেছিল এবং তাদের নামে বরাদ্ধকৃত অনুদানও নগদে ও ফলের বীজ ইত্যাদির মারফত গ্রহণ করেছিল। খামার গড়ে তোলার নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর খামার মালিকরা একে একে খামার ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করে। দু'এক বছরের মধ্যে পুরা যৌথ খামার পরিত্যক্ত হয়। রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষেত্রে এটা শতকরা এক'শ ভাগ সত্য।

বান্দরবান জেলায়ও যৌথ খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। শেষ পর্যন্ত ক'টা যৌথ খামার স্থাপন করা হয়েছিল, তা জানা যায়নি। খাগড়াছড়ি জেলায় যে যৌথখামার স্থাপন করা হয়, তা কতদূর সফল হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বোর্ডের ১৯৭৮ সালের দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫৪ টি যৌথখামার স্থাপন করার পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত থাকলেও রাঙ্গামাটিতে দু'টি যৌথখামার স্থাপন করার পরই গোটা প্রকল্পটিই শেষ পর্য্যন্ত বাতিল করা হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণ হয় যে, বোর্ডের দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রকল্পটি সফল হয়নি।

রাঙ্গামাটি জেলায় স্থাপিত যৌথখামারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাগান গড়ে তোলার নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাগান মালিকরা বাগানের পরিচর্যা বন্ধ করে দেয় বা পরিচর্যা করার আর্থিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। যৌথখামারগুলি জনবসতি এলাকার বাইরে স্থাপন করা হয় বলে হরিণ, শূকর, সজারু ইত্যাদি বন্য জন্তুর আক্রমনের শিকার হয়। বণ্যশূকর এবং সজারু কলা, আনারস ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ফলে বাগানে ফলের উৎপাদন কম হয়। অন্যদিকে যৌথখামারগুলির আশেপাশে ঝাড়-জঙ্গল থাকায় বন্য জন্তু থেকে বাগান রক্ষা করাও প্রায়

www.pathagar.com

অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বাগানে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে যা আয় হয়, তাতে পরিবার ভরণ পোষণ, বাগান পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বাগান মালিকরা শেষ পর্য্যন্ত তাদের নিজস্ব বাগান পরিত্যাগ করে আবার যাযাবর বৃত্তিতে ফিরে যায়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ যে যৌথখামার প্রকল্পের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ, তা বলা হয়ত ঠিক হবেনা। উপজাতীয়দের যাযাবর প্রবৃত্তি এবং সংগ্রাম বিমুখতাও এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলা যায়।

১.খ: ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা ঋণদান কর্মসূচীঃ

১.খ.১: ঋণের পরিমাণ ও ঋণ গ্রহীতার সংখ্যাঃ

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষতঃ উপজাতীয়দেরকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও ব্যবসায় উৎসাহ ও সুযোগদানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড একটি ঋণদান কর্মসূচীও হাতে নেয়। এই ঋণদান কর্মসূচীর অধীনে বোর্ড ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৯-৮০ইং অর্থ বছরে ছাগল, শুকর, মৎস্য, তাঁতকল, ধান মাড়াই কল, দুগ্ধ খামার, আসবাবপত্র নির্মাণ কারখানা, বই বাঁধাই, বিস্কুট কারখানা, সিনেমা হল, ওয়ার্কশপ, ড্রাইক্লিনিং মেশিন, টেইলারিং শপ, 'স' মিল স্থাপন ইত্যাদি খাতে রাঙ্গামাটি জেলায় ৫৩ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ৩১ জন এবং বান্দরবন জেলায় ২০ জনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বমোট ১০৪ জনকে ২৭,৮৫,৩০০/০০ টাকা ঋণ প্রদান করেছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যে ৫৩ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়, তার মোট পরিমাণ হচ্ছে, ১৫,৫২,৩০০/০০ টাকা, বান্দরবান জেলায় ২০ জনকে প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ, ৫০৪,২০০/০০ টাকা এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ৩১ জনকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৭২৮,৮০০/০০ টাকা। রাঙ্গামাটি জেলায় প্রদত্ত সর্বনিম্ন ঋণের অংক হল, ৮০০০/০০ টাকা (বিস্কুট কারখানা) এবং সর্বোচ্চ অংক হল ১,০০,০০০/০০ টাকা (বই বাঁধাই)। বান্দরবান জেলায় প্রদত্ত ঋণের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ অংকও রাঙ্গামাটি জেলার অনুরূপ। খাগড়াছড়ি জেলায় প্রদত্ত ঋণের সর্বনিম্ন অংক ৭০০০/০০ টাকা (মৎস্যচাষ) এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ অন্য জেলার অনুরূপ (সিনেমা হল স্থাপন)।

১.খ.২: ঋন আদায়ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ঋণ দান ও আদায় বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ৩১-১২-৮৮ইং পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলার ১০৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে মোট ১১ জন সম্পূর্ণ ঋণ, যার অংক ৩০৭,৪০০/০০

www.pathagar.com

টাকা পরিশোধ করেছেন। ২৯ জন ঋন গ্রহীতা আংশিক পরিশোধ করেছেন (৮,৯০,০০/০০ টাকার মধ্যে ২৩৯,০০০/০০ টাকা)। বাকী ৬৪ জন ঋণ গ্রহীতা কোন টাকা পরিশোধ করেনি। এই ৬৪ জন কর্তৃক গৃহীত ঋণের অংক ১৫,৮৭,৯০০/০০ টাকা। আর এর সুদের পরিমাণ হল ১১,৯৬৩২৮.৪৮ টাকা।

রাঙ্গামাটি জেলায় ৫৩ জনকে প্রদত্ত ঋণের ১৫,৫২,০০০/০০ টাকা থেকে ৩১-১২-৮৮ইং পর্যন্ত আদায় হয়েছে, ২০২,১০০/০০ টাকা। সুদসহ অনাদায়ী রয়েছে ২৩,৯০৪৭০.৭৬ টাকা (১৩,৫০,২০০/০০+ ১০,৪০২৭০/৭৬)। বান্দরবান জেলায় ২০ জনকে প্রদত্ত ঋণের ৫০৪,২০০/০০ টাকার মধ্যে আদায় হয়েছে ১৪৮,৭০০/০০ টাকা। সুদসহ অনাদায়ী ঋণের অংক হল, ৬৭০,৪৩৩.৩৫ টাকা। খাগড়াছড়ি জেলায় ৩১ জনকে প্রদত্ত ঋণের ৭২৮,৮০০/০০ টাকা থেকে সুদসহ মোট আদায়ের অংক ১,৯৬,৪০০/০০ টাকা এবং সুদসহ অনাদায়ী ঋণের অংক হল ৯৫৬,৫২৪.৭২ টাকা (৪২৪,১২৪/৭২+৫৩২,৪০০/০০)। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় সুদসহ বোর্ডের অনাদায়ী ঋণের মোট অংক হল, ৪০,১৭৪২৮/৮৩ টাকা (২৩,৯০৪৭০/৭৬+৬৭০,৪৩২/৩৫+ ৯৫৬,৫২৫/৭২)

১.খ.৩: অনাদায়ী ঋণের ভবিষ্যৎঃ

ঋণের বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক লোককে সর্বোচ্চ অংকের ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বনিম্ন সংখ্যক ঋণ গ্রহীতা এবং ঋণের অংক হল বান্দরবান জেলায়। রাঙ্গামাটি জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক লোককে সর্বোচ্চ অংকের ঋণ প্রদান করা হলেও এই জেলার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সর্বনিম্ন-মূল ঋণের ১৩ শতাংশ। বান্দরবান জেলায় সর্বনিম্ন সংখ্যক লোককে এবং সর্বনিম্ন অংকের ঋণ প্রদান করা হলেও ঋণ পরিশোধের দিক থেকে এর স্থান সবার উপরে -২৯.৪০ শতাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রায় প্রত্যেকটি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণের বিপরীতে জমি, বসতবাড়ী অথবা বসত বাড়ীর জমি বন্ধক নিয়েছে। তাই ঋণ আদায় করার ক্ষেত্রে বোর্ডের কিছু সুযোগ আছে। বোর্ড আদালতে মামলা দায়ের করে এবং প্রয়োজনবোধে বন্ধকী জমি বা বাড়ী আদালতের মাধ্যমে নীলামে বিক্রি করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করতে পারে এবং তাতে প্রায় সম্পূর্ণ ঋণ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

www.pathagar.com

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বোর্ডের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্টি উপজাতীয় জনগণকে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা দানের লক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রধানতঃ উপজাতীয়দেরকেই এসব ঋণ প্রদান করেছে। ঋণগ্রহীতা প্রায় সবাই উপজাতীয় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যথা উপজাতি প্রধান, মৌজা হেডম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ইত্যাদি। শিল্প কারখানা পরিচালনা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা ঋণ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে তারা ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাও হারিয়েছেন। বর্তমানে আদালতের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিলে এলাকার বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বোর্ডকে হয়ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। তাই ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

২: ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

তুলনামূলকভাবে অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার করার লক্ষ্যে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা এগিয়ে আসে। জাতিসংঘের অধীন আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল এর অন্যতম। মাতা ও শিশুদের কল্যাণার্থে গৃহীত বাংলাদেশ সেবা কর্মসূচীর অধীনে ১৯৮০ সালের ১৯ শে জুলাই বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয় মা ও শিশুদের কল্যাণার্থে ইউনিসেফের আর্থিক সাহায্যে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালের ৯ই মে তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও ইউনিসেফের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লিখিত চুক্তির অধীনে রাঙ্গামাটি জেলার রূপকারী ও খাগড়াছড়ি জেলার পেরাছড়া ও পাবলাখালী মৌজার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮০-৮২ সালে বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পানি ও মলবাহী রোগ ও পুষ্ঠিহীনতা প্রতিরোধ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দুঃস্থ পরিবারদের আয় বৃদ্ধির একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে।

এই কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (সরকারী অনুদান ৪·১৩ লক্ষ টাকা এবং ইউনিসেফ ১৭·০৭ লক্ষ টাকা)। এই কর্মসূচীর অধীনে উন্নয়ন বোর্ড তিনটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ১০ জন উপজাতীয় যুবককে গ্রাম্য স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে প্রশিক্ষনদান, ১০ জন উপজাতীয় মহিলাকে ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষনদান করার কথা। প্রকল্প মৌজায়

www.pathagar.com

১৮ প্রকারের ঔষধ সরবরাহ, শিক্ষা সরঞ্জামাদি প্রদান, মুরুং আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন, ১২টি রিং-অয়েল স্থাপন, ৪৫৫ টি স্লাব লেট্রিন সরবরাহ, ২৮০ জন দুঃস্থ মহিলাকে ১০০০/০০ টাকা কর্জ দাদন, ১২ জন মহিলাকে তাঁত প্রশিক্ষণ দান এবং ১২টি তাঁত সরবরাহ করেছে।

১৯৮২ সালে প্রথম দ্বিবার্ষিক কর্মসূচীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইউনিসেফ এই কর্মসূচীর মেয়াদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করতে সম্মত হলে তা আরও ৮টি নতুন মৌজায় সম্প্রসারণ ও মেয়াদ ১৯৮৫ সাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এই সম্প্রসারিত ও বর্ধিত মেয়াদের কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয় "ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট বহুমুখী উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী-১৯৮২-৮৫"। যে নতুন ৮টি মৌজায় কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হয় সেগুলি হল রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, খাগড়াছড়ি জেলার বোয়ালখালী ও গোলাবাড়ী এবং বান্দরবান জেলার সোয়ালক, রেনিক্ষং, কুহলং, তারাছা ও গজালিয়া মৌজা। এই কর্মসূচী পূর্ববর্তী কর্মসূচী থেকে ব্যাপক। কারণ এতে কিছু নতুন কর্মকান্ড সংযোজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এটা একটা যৌথ কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ হল ১৯২,৮০,০০০/০০ টাকা। এতে সরকারী অনুদান রয়েছে ৩০২৭,০০০/০০ টাকা এবং ইউনিসেফের অনুদান ১৬২, ৫৩,০০০/০০ টাকা এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হল, উপজাতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নয়নসাধন। উপরোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ঃ-

১) প্রকল্পভূক্ত এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণের মধ্যে ১৮ প্রকারের নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা,

২) ৫৪টি রিংওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে ৭০০০ উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা,

৩) ১৫,৬২৪টি উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও আয় বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর শাক-সব্জির বীজ বিতরণ। এছাড়া ৬২০০ টি উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে আদা, হলুদ, কচু ও জুম ধানের বীজ বিতরণ,

৪) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য ২০০০টি উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে ৩১,৮০৮টি বিভিন্ন ফলের চারা বিতরণ,

৫) ২০০ মুরং উপজাতীয় ছেলেমেয়ের জন্য "ম্রো" আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন,

৬) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য ৬৪০টি উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে বিনাসুদে ঋণ প্রদান,

www.pathagar.com

৭) আয় বৃদ্ধির জন্য ৩২০ জন উপজাতীয় মহিলাকে তাঁত ও কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ দান,

৮) প্রকল্প এলাকার কর্মকান্ড তদারক করার জন্য প্রকল্প সংগঠকদের জন্য ৮টি অফিস-কাম-কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ,

৯) রোগ বিস্তার রোধের জন্য ২০০০টি উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে স্লাব লেট্রিন বিতরণ,

১০) শিশু শিক্ষার জন্য প্রি-স্কুলের ব্যবস্থা করা.

১১) ১০০০ জন স্কুল বহির্ভূত ছেলে-মেয়ে ও মহিলাকে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান,

১২) ৩৬ জন উপজাতীয় যুবককে হাঁস-মুরগী পালনে প্রশিক্ষণ দান ও ১৫০০ জন উপজাতীয় মহিলাকে মুরগী পালনে উৎসাহ দান,

১৩) ১১টি প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় মহিলাকে পুষ্টি শিক্ষা দানের জন্য ১১ জনকে প্রশিক্ষণ দান ও প্রশিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ।

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কর্মসূচীর মেয়াদ শেষ হয়। এতে ১৮১,৭০,০০০/০০ টাকা ব্যয় করা হয়। উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের দাবী অনুসারে প্রকল্পের সাফল্যের হার শতকরা ৯৪.২৪ ভাগ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের দাবী অনুসারে "ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট বহুমুখী উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী ১৯৮২-৮৫" এর সাফল্যে অনুপ্রাণীত হয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ ১৯৯০ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কর্মসূচীর মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচী নতুন নামকরন করা হয়েছে "সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ১৯৮৫-১৯৯০"। এই কর্মসূচীতে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার ১৪টি নতুন মৌজা অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

পাঁচ বছর মেয়াদী এই নতুন কর্মসূচীর ব্যয়বরাদ্ধ ছিল ১১৩৮'৩২ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন অনুসারে, এই প্রকল্প স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সুযোগ সুবিধা ও আয়বর্দ্ধন মূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রকল্পের কাজের শেষ পর্যায়ে এসে তা অব্যাহত রাখা এবং আরও অধিক এলাকার কর্মসূচী সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। প্রকল্পের

www.pathagar.com

মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর কার্যক্রম আরও ২৫টি মৌজায় অর্থাৎ সর্বমোট ২৫০টি মৌজায় (বান্দরবানে ৩২টি, রাঙ্গামাটিতে ১৪টি এবং খাগড়াছড়িতে ৪টি) সম্প্রসারণ করা হয়। প্রকল্পটির বর্দ্ধিত মেয়াদের মোট ব্যয় বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ২১ কোটি ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এতে ইউনিসেফের অনুদান ১৬৮৩.৬৬ লক্ষ টাকা এবং সরকারী অনুদান ৪৩২.২৪ লক্ষ টাকা।

১৯৮৫-৯০ সালের বর্দ্ধিত ও সম্প্রসারিত প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয় ১১৩৮.৩২ লক্ষ টাকা। আর প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত ও সম্প্রসারণের পর এর ব্যয়বরাদ্ধ দেখান হয়েছে ২১১৫.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষ ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্য্যন্ত মেয়াদের জন্য সর্বমোট বরাদ্ধই হল ২১১৫.৯০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৯৯০-৯৩ সালের বর্দ্ধিত মেয়াদের জন্য ৯৭৭.৫৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্ধ দিয়ে ১৯৮৫-৯৩ সাল মেয়াদের ব্যয় বরাদ্ধ ২১১৫.৯০ লক্ষ টাকা দেখান হয়েছে। ২১১৫.৯০ লক্ষ টাকা ১৯৯০-৯৩ সালের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্ধ নয়।

১৯৮৫-৯০ ও ১৯৯০-৯৩ সালের বর্দ্ধিত ও সম্প্রসারিত প্রকল্পের কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়ঃ-

১) ১৬০,০০০ শিশুসহ ৩২,০০০ দুঃস্থ উপজাতীয় পরিবারকে আর্থিক সাহায্যসহ যাবতীয় সাহায্য প্রদান,

২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর সাহায্যে উপজাতীয় লোকদেরকে শিশুর জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করা,

৩) শাক-সব্জির বাগান করার ব্যাপারে ২২,০০০ পরিবারকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা,

৪) প্রকল্পভূক্ত ২২,০০০ উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে ৪৫০টি হস্তচালিত পাম্পের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা,

৫) ১৫টি নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ৭৫০০ জন উপজাতীয় লোকের মধ্যে স্লাব লেট্রিন সরবরাহ করা,

৬) ১৫,০০০ উপজাতীয় শিশুর মধ্যে স্কুলপূর্ব শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা,

৭) ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১০০০ জন উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান,

www.pathagar.com

৮) ২২,০০০ জন উপজাতীয় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে আবর্তনমূলক ঋন প্রদান এবং প্রাক-সমবায় দলের মাধ্যমে সঞ্চয় সৃষ্টি ও মৌজা ভিত্তিক পুঁজি গঠন,

৯) ১২০ জন উপজাতীয় যুবক ও ২১০ জন মহিলাকে আয় বর্ধনমূলক কাজের জন্য দক্ষতা বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০) নতুন প্রকল্পের জন্য ২৫টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।

প্রকল্প পরিচালনা পদ্ধতিঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌজা পর্যায়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান হলেন সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান। এই কমিটিতে আরও রয়েছেন মনোনীত একজন কার্বারী, উপজাতীয় সমাজকর্মী, স্কুল শিক্ষক, এলাকার কৃষি কর্মকর্তা এবং আরও কয়েকজন।

বিভিন্ন প্রকল্প মৌজার কর্মকান্ড তত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য উপজেলা সমন্বয় কমিটিও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই কমিটির সহ-সভাপতি। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হল, সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তত্বাবধান করা (১-১-৯০ইং রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালার জন্য প্রস্তুত "পার্বত্য অঞ্চলে ইউনিসেফ সাহায্য পুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি")।

৩: বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৪/৮৫-১৯৮৮/৮৯)ঃ

যুগ যুগ ব্যাপী অবহেলিত পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করে স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে তদানীন্তন সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালে ২৬২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই বিশেষ পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের অধীনে প্রাথমিকভাবে ১৮ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে আরও ২টি প্রকল্প যোগ করায় প্রকল্পের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পগুলির মেয়াদকাল ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ইং পর্যন্ত। পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতি এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

অসুবিধাদির কারণে প্রকল্পগুলির মেয়াদ কাল ১ বছর বাড়িয়ে ১৯৮৯-৯০ইং পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বছরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বছরে প্রায় সব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত এসব প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার জন্য নিম্নে সেগুলির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলঃ-

৩.ক: সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে ১৩টি সড়ক উন্নয়ন এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। আরও ২টি সড়ক যোগ করায় সড়কের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ১৯৮৫ সালের একটি প্রচারপত্র থেকে জানা যায় যে, বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১২,৯৩৩.০০ লক্ষ (১২৯ কোটি ৩৩ লক্ষ) টাকা। কিন্তু ২৯-১১-৯০ ইং অনুষ্ঠিত সমন্বয় কমিটি ও বোর্ডের সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্ধ ছিল ১২৮,৩৩.০০ লক্ষ (১২৮ কোটি ৩৩ লক্ষ) টাকা। বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে যে ১৩টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় সেগুলি হলঃ

সড়কের নাম-	দূরত্ব
(১) নাজিরহাট-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক	৬২.৫০ মাইল
(২) দীঘিনালা-সাজেক সড়ক-	৯ মাইল
(৩) রামগড়-জালিয়াপাড়া সড়ক	১২.২৫ মাইল
(৪) মানিকছড়ি-লক্ষীছড়ি সড়ক	৯.৩২ মাইল
(৫) মানিকছড়ি-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি- (মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া অংশসহ)	৫৭.৬০ মাইল
(৬) রানীরহাট-কাউখালী সড়ক	৪.৫০ মাইল
(৭) ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান সড়ক-	৪০ মাইল
(৮) বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলী সড়ক-	১৩ মাইল
(৯) বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক-	১৪ মাইল
(১০) বান্দরবান-রুমা সড়ক-	৩১.২৫ মাইল
(১১) চিম্বুক-থান্‌ছি সড়ক	২৫ মাইল

www.pathagar.com

(১২) আজিজনগর-গজালিয়া সড়ক- ১২ মাইল

(১৩) রামু-নাক্ষ্যংছড়ি সড়ক ৭·৫০ মাইল

পরে যে দুটি সড়ক যোগ করা হয়, সে দুটি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পূর্বোক্ত বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী সমন্বয় কমিটি ও বোর্ডের সভার একই কার্যবিবরনী থেকে জানা যায় যে, সড়ক উন্নয়ন খাতে ১৯৯০ সালের জুন পর্য্যন্ত বোর্ড ১৪০,৩৭·১৯ লক্ষ (১৪০ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৯ হাজার) টাকা ব্যয় করেছে। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের জন্য ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। বোর্ডের সভায় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ভবিষ্যতে আরও কয়েক বছর যাবত চালু রাখার নিমিত্তে অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্ধের জন্য মন্ত্রনালয়ে পত্র লিখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩.খ: বিশেষ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী সমন্বয় কমিটি ও বোর্ডের সভার পূর্বোক্ত কার্যবিবরনী থেকে জানা যায় যে এই প্রকল্পের জন্য মূল ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ৩৭৬.৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৯০-৯১ সালের প্রতিবেদন মতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯১ সালের জুন পর্য্যন্ত এই প্রকল্পের ৩৯৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, কাউখালী, আলিকদম, ফাইথং ও মানিকছড়ি উপজেলায় ২০০ টন সার বীজ ধারনক্ষম গুদাম নির্মাণ, লামা উপজেলায় সবজি প্রদর্শনী খামার স্থাপন, চাষীদের মধ্যে ৮৩০ টি সেচ যন্ত্র ও সেগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও সেচযন্ত্র চালানোর জন্য ১৬৬০ জনকে ও মেরামত কাজে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদন মতে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পুরাপরি অর্জিত হয়েছে।

৩.গ: কুমিল্লা তুলা চাষ প্রকল্পঃ

১৯৮৪-৮৫ সালের বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছর পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য ৮৫·০০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। ২৯-১১-৯০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৫ সাল থেকে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার পুনর্বাসিত এলাকায় চাষীদের নগদ অনুদান ও উপকরণ সরবরাহসহ ২৩৯০ একর জমিতে প্রদর্শনী হিসাবে তুলা চাষ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে ২৬৯০ একরের জন্য চাষীদেরকে বিনামূল্যে ৩৬০ মন বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব মতে, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৮৪৫ মণ আঁশ তুলা উৎপন্ন হয়। এই তুলার প্রতি বেলের মূল্য ৯০০০/০০ টাকা। তুলা উন্নয়ন বোর্ড তিনটি পার্বত্য জেলার ৩টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করে, যার প্রত্যেকটির আয়তন ৭-৮ একর। এসব প্রদর্শনী খামারে তুলা চাষীদেরকে পোকামাকড় দমনে প্রশিক্ষণ দান এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সময় সময় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উক্ত তিনটি খামারের প্রত্যেকটিতে একটি অফিস কাম গোডাউন ও জিনিংরুম নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক খামারে তিনটি করে তুলা জিনিং মেশিন (বীজতলা থেকে বীজ ছাড়াইকরণ) বসানো হয়েছে। এসব মেশিনে চাষীদের উৎপাদিত তুলা জিনিং করার ব্যবস্থা করা হয়।

বোর্ড সভার উল্লিখিত কার্যবিবরনী থেকে জানা যায় যে, তিনটি প্রদর্শনী খামারে ৩ জন ফার্ম ওভারশীয়ার ও ৬ জন গার্ড-কাম মালী নিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন ওভারশীয়ার ছাড়া বাকী সবাই কর্মরত আছেন। ৯টি জিনিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। জিনিং মেশিনের কিছু যন্ত্রাংশও ক্রয় করা হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সাল অর্থ বছরে তিনটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পুনর্বাসিত এলাকার (গুচ্ছ গ্রাম ও বড়গ্রাম) প্রত্যেক পুনর্বাসিত পরিবারকে তুলা চাষের জন্য বীজ, সার ও কীটনাশক দিয়ে ৬১০ একর জমিতে তুলা চাষ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও ৩ টি প্রদর্শনী খামারে ৩ জন ওভারশীয়ার ও ৯ জন গার্ড-কাম মালী নিয়োগ করা হয়েছে। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ইং প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.ঘ: পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ১৬০০'০০ লক্ষ টাকা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছিল। এই সংস্থা প্রকল্পের শুরু থেকে ১৯৯০ সালের জুন পর্য্যন্ত বরাদ্ধকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেছে। ২৯-১১-৯০ ইং অনুষ্ঠিত বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী সমন্বয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সভার পূর্বোক্ত কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ১৯৯০ সালের জুন পর্য্যন্ত ১৮১'৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১৯৩ টি ডি.এস.পি. নলকূপ পুনঃখননঃ, ৬০'৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩৪২ টি অগভীর নলকূপ পুনঃ খনন, ১৯৩'২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৯৮ টি ডি.এস.পি নলকূপ খনন, ২৯১'৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৯০ টি রিং অয়েল স্থাপন, ৯৩'৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৬ টি বিভিন্ন প্রকার গুদাম/ভবন নির্মাণ করেছে।

www.pathagar.com

১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বছরে ৬১·০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ দেওয়া হয়। উক্ত টাকা থেকে ২৫·০০ লক্ষ টাকা খাগড়াছড়ি পানি শোধনাগার নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা হয় এবং ৩৫·৯৯ লক্ষ টাকা দিয়ে পূর্ববর্তী অর্থ বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কাজের বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.৬: কুটির শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ৩২০·০০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বরাদ্ধকৃত অর্থ থেকে ৩১০·০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে বাকী ১০·০০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ পাওয়া যায়। এই টাকা থেকে পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এই প্রকল্প কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে প্রনীত একটি বিশেষ প্রকল্প। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশেষ লক্ষ্যকে- জনগোষ্ঠি ও এলাকা উন্নয়ন সামনে রেখে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের কুটির ও গ্রামীন শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের সম্পূরক প্রকল্প হিসাবে এটা প্রণয়ন করা হয়েছে। কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হল প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদিত পন্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কুটির শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কারুশিল্পীদের যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন কর্মসূচীতে মোট ১৩২০ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৭০ জনকে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে পুনর্বাসন করা হয়েছে (রাঙ্গামাটি-১৯২ জন, খাগড়াছড়ি-১৪৪ জন এবং বান্দরবান-৩৪ জন) এবং ৯৫০ জনকে (রাঙ্গামাটি-৩৯৬ জন, খাগড়াছড়ি-৩০৯ জন এবং বান্দরবান-২৪৫) কাঠের কাজ, সেলাই, বাঁশ ও বেত, মৌমাছি পালন, এন্ডি চাষ ইত্যাদি কাজের যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিতদের মধ্যে ৪৫০ জনকে (রাঙ্গামাটি-২৩৬ জন, খাগড়াছড়ি-১৫৪ জন এবং বান্দরবান ৬০ জন) নিজ বাসগৃহের নিকট শেড তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। বোর্ড সূত্রে আরও

www.pathagar.com

জানা গেছে যে, এই প্রকল্পের আওতায় ১৪টি হস্ত চালিত বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র (রাঙ্গামাটি জেলায় ৫টি, খাগড়াছড়ি জেলায় ৪টি ও বান্দরবান জেলায় ৫টি) স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তিনটি ডেলিভারী সেন্টার (রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলায়, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর এবং বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর) স্থাপন করা হয়েছে। এসব ডেলিভারী সেন্টারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত তাঁতী কারিগরদের কাঁচামাল সরবরাহ, কাঁচামাল প্রসেস করা, উৎপাদিত বস্ত্র সংগ্রহ করা এবং মাঠ কর্মীদের দ্বারা তা তত্ত্বাবধান করার এবং তাদের উৎপাদিত পন্য প্রকল্পের বিক্রয় কেন্দ্র সমূহের দ্বারা বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উল্লিখিত কর্মসূচীর বাইরেও খাগড়াছড়ি জেলার উল্টাছড়ি গুচ্ছগ্রামে ২০টি তাঁত, পানছড়ি গুচ্ছগ্রামে ৩টি, ভাইবোনছড়া বড়গ্রামে ৩টি, ঠাকুরছড়া বড়গ্রামে ৩টি এবং পানখাইয়াপাড়া মহিলা সমিতিতে ৩টি তাঁত কেন্দ্র স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ সালে বার্ষিক প্রতিবেদন মতে শতকরা ১০০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৩.চ: বিশেষ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পঃ

বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪০৩৪.২৪ লক্ষ টাকা। ১৯৯০ সালের জুন পর্য্যন্ত বরাদ্ধকৃত সমুদয় অর্থ পাওয়া যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা সদর ও প্রধান প্রধান হাট-বাজার বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। ২৯-১১-৯০ইং অনুষ্ঠিত বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী সমন্বয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, ইতিমধ্যে দীঘিনালা উপকেন্দ্রের জন্য ৩৩ কেভি লাইন সংযোজন প্রদান, রামগড়, দীঘিনালা ও বাঘাইছড়ি উপজেলা, বাঘাইহাট ও ঈদগাওতে ১১ কেভি বিতরণ লাইনের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া মারিশ্যা, সিদ্দিকনগর, থানচি, রামগড়, পাতাছড়া, বাঘাইহাট, রোয়াংছড়ি, বাইছড়ি, মাইচছড়ি, ও পানছড়িতে এল.টি লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের একই কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য সময়ে খাগড়াছড়ি এবং থানচিতে ১০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দু'টি, দীঘিনালা,

www.pathagar.com

রাজস্থলী, চন্দ্রঘোনা, লংগদু এবং মারিশ্যায় ৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৫টি, মহালছড়ি, লক্ষীছড়ি, লংগদু, রোয়াংছড়ি, রুমা এবং আলীকদমে ৬০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৯টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে ৫০০·০০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ পাওয়া যায়। উল্লিখিত অর্থ থেকে ৪১·০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২৬ বর্গমিটার বিশিষ্ট একটি আবাসিক এবং ৫৬০ বর্গ মিটার বিশিষ্ট একটি অনাবাসিক ভবণ নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০৯·৮৮ লক্ষ টাকা দিয়ে ৩৩ কেভি, ১১ কেভি এলটি লাইন এবং নির্মাণাধীন বিভিন্ন উপকেন্দ্রের অবশিষ্ট কাজসমূহ সমাপ্ত করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ৯৮% অর্জিত হয়েছে।

৩.ছ: শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পঃ

পি.পি. অনুসারে শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমাণ ৮০৬·০০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের অধীনে প্রতি জেলায় দুটি করে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন, আবাসিক সুবিধাসহ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা খরচে লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছিল। কিন্তু চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ বোর্ড বহন করছেনা। প্রতি জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যথাক্রমে ৭৫ ও ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বহন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বেসরকারী স্কুল ও কলেজের জন্য বর্দ্ধিত হারে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান, সেগুলির উন্নয়নের জন্য যথাক্রমে ৬০·০০ ও ৭০·০০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়।

৩.জ: পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

অনুমোদিত পিপি. অনুসারে প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ৩০৯·৪০ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ পাওয়া যায়। প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানে দু'টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং জেলা পশু সম্পদ অফিস ভবণ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৯টি পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে সর্বমোট ৩৭৩·৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং লক্ষমাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.ঝ: স্বাস্থ্য, হাসপাতাল উন্নয়ন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধের পরিমাণ ৩১০·০০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের অধীনে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এবং খাগড়াছড়ি সদর

www.pathagar.com

হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ ও যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ শয্যায় উন্নীত করা। এই প্রকল্পে সর্বমোট ৩১৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.ঞ: টেলি যোগাযোগঃ

পি.পি. অনুসারে প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্ধের পরিমাণ ১৮১১·৬৫ লক্ষ টাকা। পার্বত্য অঞ্চলের সাথে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও বহির্বিশ্বের সাথে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উপরোক্ত অংকের অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ৪ ও ৬০ চ্যানেল রেডিও পদ্ধতি দ্বারা তিন পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় টেলিযোগাযোগ স্থাপন এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বোর্ডের ২-১১-৮৫ এবং ২৭-১১-৮৫ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, ৩২ টি টেলিযোগাযোগ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে এবং কোন কোনটার কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে। এছাড়া তখন পর্য্যন্ত ২৫টি টাওয়ার ফাউন্ডেশানের নক্শা সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আলুটিলা, সুভলং এবং চিম্বুকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিটার স্থাপনসহ প্রকল্পের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলার সব উপজেলার সাথে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করছে। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে এই প্রকল্পে ১৯৫৮·৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং লক্ষমাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.ট: মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ব্যয় বরাদ্ধের পরিমাণ ৪০.০০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামগড়ে একটি পোনা উৎপাদন কেন্দ্র, বান্দরবানে মৎস্য খামার স্থাপন এবং কাপ্তাই হ্রদে ২৫ লক্ষ পোনা সরবরাহ এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত। বোর্ডের ২৭-১১-৮৫ ইং এর সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, রামগড়ে পোনা উৎপাদন কেন্দ্র এবং অফিস বাসভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। গভীর নলকূপ স্থাপন, বিদ্যুতায়ন ও প্রকল্পের জন্য পদ সৃষ্টির কাজ শুরু করা হয়েছে। তিনটি অতিরিক্ত পুকুর খননের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বোর্ডের ২-১১-৮৫ইং তারিখের সভার আগে কাপ্তাই হ্রদে ১৭ লক্ষ এবং ৭-১১-৮৫ ইং সভার আগে ৯ লক্ষ সহ সর্বমোট ২৬ লক্ষ পোনা ছাড়া হয়েছে। বান্দরবানে মৎস্য খামার স্থাপন সম্পর্কে বোর্ড সূত্রে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং প্রতিবেদন মতে এ ই প্রকল্পে ৪৩·০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩.ঠ: উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়নঃ

পি.পি. অনুসারে এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৩০৯.৮৬ লক্ষ টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের আওতায় আদর্শ উদ্যান স্থাপন, উদ্যান বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান ও ফলের চারা সরবরাহের লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে উদ্যান খামার স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বরকল, কাপ্তাই, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা ও আজিজনগরে একটি করে নার্সারী স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯০-৯১ইং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই প্রকল্পে শতকরা ১০০ ভাগ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এমনকি প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩০৯.৮৫ লক্ষ টাকার স্থলে ৩৫৬.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩.ড: পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পঃ

পর্যটন শহর হিসাবে রাঙ্গামাটিকে আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষে সেখানে একটি পিকনিক সেন্টার ও ২৫০ আসন বিশিষ্ট একটি বিনোদন হল নির্মানের জন্য এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৬০.০০ লক্ষ টাকা। বোর্ডের উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.ঢ: সমন্বিত জুমিয়া পুনর্বাসন এবং বনায়ন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যে হল ৫৩,০০০ একর অশ্রেণীভূক্ত সরকারী বনাঞ্চলে বন সৃষ্টি করা এবং ৪ হাজার ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে ২০ হাজার একর জমিতে পুনর্বাসন করা। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় হল, ১৯৩৬.৮৫ লক্ষ টাকা। বোর্ডের সূত্র মতে, মোট ১৩,১৯৬ একর জমিতে বন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ১৭৩০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পে প্রকৃত ব্যয় হয় ২১৯৯.২০ লক্ষ টাকা, যা প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ২৬২.৩৫ লক্ষ টাকা বেশী। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল বনবিভাগ, বান্দরবান, পাল্পউড প্লান্টেশান বিভাগ, বান্দরবান, জুম নিয়ন্ত্রন বিভাগ, পাল্পউড প্লান্টেশান বিভাগ, কাপ্তাই এবং খাগড়াছড়ি বিভাগ।

৩.ণ: সমন্বিত জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প (বোর্ডের অংশ)ঃ

বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা। এই পরিকল্পনার একটা অংশ বনবিভাগ বাস্তবায়ন করে। আর একটা অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

www.pathagar.com

বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের এই অংশের উদ্দেশ্য হল, জুমিয়া পুণর্বাসন এবং কমিউনিটি সুবিধা প্রদান। এই প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪০০·০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এলাকার পরিস্থিতির কারণে এবং বনবিভাগ ভূমিহীন জুমিয়া পুনর্বাসন করতে অক্ষম হওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধন করে ১৯৩·৭০ লক্ষ টাকা করা হয়। অথচ এই প্রকল্পের ব্যয় হয় ২৪৪·৮৩ লক্ষ টাকা এবং বোর্ড সূত্র মতে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.ত: পাল্প উড উন্নয়ন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কাগজ ও কাঠ ভিত্তিক শিল্পের জন্য পাল্প উড উন্নয়নের নিমিত্তে ৫ হাজার সরকারী বনাঞ্চলে বন সৃষ্টি করা।

কাপ্তাই এবং বান্দরবান পাল্পউড ডিভিশনকে এই বন সৃষ্টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৪২·৪০ লক্ষ টাকা এবং পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৪০। শেষ পর্য্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩১৭·৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ১৪০টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে বোর্ডের ১৯৯০-৯১ইং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।

৩.থ: পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলার ২৭টি ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় হল ১৪০·০০ লক্ষ টাকা। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ইং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বছরের শেষ নাগাদ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৭০ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

৩.দ: বান্দরবান ষ্টেডিয়াম নির্মাণঃ

এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৩·৩২ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে। ব্যয় বরাদ্ধের সম্পূর্ণ টাকাই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছে তিন বছর আগে হস্তান্তর করা হয়েছে। বান্দরবান জেলার ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং বান্দরবান জেলা প্রশাসক প্রকল্পের কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করছেন। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতির পরিমাণ আলোচ্য আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ শতকরা ৯৫ ভাগ।

www.pathagar.com

৩.ধ: খাগড়াছড়ি শিশু সদন নির্মাণঃ

এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ লক্ষ টাকা। বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী সমন্বয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২৯-১১-৯০ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ইং অর্থ বছরে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে আলোচ্য অর্থ বছরে ২৫'০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩.ন: শ্রম ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫'০০ লক্ষ টাকা। উপজাতীয়দেরকে মোটর ড্রাইভিং বা গাড়ী চালনার প্রশিক্ষণদানই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। বোর্ডের ১৯৮৮-৮৯ইং সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং এতে লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জিত হয়েছে। তবে কতজন উপজাতীয়কে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বোর্ড সূত্রে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৬,২১৩'০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছর পর্য্যন্ত এই প্রকল্পে ২৮,০৩৭'২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯০-৯১ বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যয় পরিকল্পনার নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে ১৮২৪'২৮ লক্ষ টাকা বেশী। পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯০-৯১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার কারণে বোর্ডকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সাহায্যপুষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প(বহুমুখী)ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর আলোচনার সূচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে সম্মত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৯-৮০ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী)" নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী) বাস্তবায়নে ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রকল্পের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সরাসরি বাস্তবায়নের জন্য দু'টি উপ-প্রকল্পের দায়িত্ব নেয়। এই দু'টি উপ-প্রকল্প হল, (১) শক্তিশালীকরণ উপ-প্রকল্প এবং (২) উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ উপ-প্রকল্প। শক্তিশালীকরণ উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে শেষ হয়েছে। উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

শক্তিশালীকরণ এবং উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প দু'টি ছাড়া ৯টি প্রকল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থাকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শক্তিশালীকরণ উপ-প্রকল্পসহ ৯টি উপ-প্রকল্প ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড উক্ত ১১টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে সমন্বয়সাধন করেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে সদস্য ও প্রকল্প পরিচালক উক্ত প্রকল্প সমূহের কাজে সমন্বয়সাধন এবং বোর্ড কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের কাজ তদারক করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৮৮-৮৯ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১১টি উপ-প্রকল্পের সমন্বয়ে প্রণীত "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী)" এর মূল ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ৬২৩৮.৯২ লক্ষ টাকা। পরবর্তীকালে তা সংশোধন করে ১২,৯০৭.৮৬ লক্ষ টাকা করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই প্রকল্পের আওতাধীন ১১টি উপ-প্রকল্পের পৃথক পৃথক বরাদ্ধের যে হিসাব দেওয়া হয়, সেগুলির মোট অংক ১২৯০৭.৮৬ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। নিম্নে উপ-প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলঃ-

(১) **উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণঃ** ২০০০ ভূমিহীন জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন, তাদের জন্য ৮০০০ একর রাবার বাগান, ৪০০০ একর বিভিন্ন ফলের বাগান সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সামাজিক সুবিধাদির ব্যবস্থাকরণ এই উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল, ৪৭৬৯.৫০ লক্ষ টাকা।

(২) **বনায়ন ও পুনর্বাসনঃ** ৩০০ জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন ও ৯০০০ একর বনায়ন এই উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল, ৩৪৩.৪৫ লক্ষ টাকা।

(৩) **রোড নেটওর্য়াকঃ** এই উপ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, খাগড়াছড়ি-পানছড়ি, খাগড়াছড়ি-ছোট মেরুং, ছোট মেরুং-দীঘিনালা

www.pathagar.com

এবং ছোট মেরুং-মারিশ্যা সড়ক মিলে ৪২ মাইল সড়ক নির্মাণ। পরবর্তীকালে খাগড়াছড়ি-ছোট মেরুং, ছোট মেরুং-মারিশ্যা সড়কের পরিবর্তে দীঘিনালা-বাবুছড়া এবং মারিশ্যা-দিঘীনালা সড়ক নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল, ৬৪৪৮.৬০ লক্ষ টাকা।

(৪) **কৃষি গবেষণাঃ** খাগড়াছড়িতে একটি নূতন কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং রায়খালীস্থ পুরাতন কেন্দ্রটির উন্নয়ন এই প্রকল্পের আওতাভূক্ত। এই উপ-প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্ধ হল, ৩৫৭·৯৬ লক্ষ টাকা।

(৫) **কৃষি সম্প্রসারণঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ ও টি.এন্ড.ডি. পদ্ধতি চালুকরন। এই প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্ধ হল,৫৩৯·০৮ লক্ষ টাকা।

(৬) **নার্সারী উন্নয়নঃ** ১টি নূতন নার্সারী স্থাপন ও ৫টি পুরাতন নার্সারী উন্নয়ন এই উপ-প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল ৭৭·৭৩ লক্ষ টাকা।

(৭) **সার গুদাম নির্মাণঃ** পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় অতিরিক্ত সার ও বীজ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ৭টি সার ও বীজ গুদাম নির্মাণ এই উপ-প্রকল্পের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। এই উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল ১৯২,২৭ লক্ষ টাকা।

(৮) **কুটির ও গ্রামীন শিল্প উন্নয়নঃ** পার্বত্য অঞ্চলে কুটির ও গ্রামীন শিল্প উন্নয়নে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এই উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত। এই উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল ২৮৮·৬২ লক্ষ টাকা।

(৯) **স্বাস্থ্য রক্ষার সুবিধা প্রদান (স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ) ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলের ৩টি নদী অববাহিকায় অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ এবং এমবুলেন্স সরবরাহ এই উপ-প্রকল্পের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। এই উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল, ৩৫·৭৬ লক্ষ টাকা।

(১০) **জনস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনাঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলের ৩টি নদী অববাহিকায় বিদ্যমান জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহের উন্নয়নই এই উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্ধ হল, ২২·৮২ লক্ষ টাকা।

www.pathagar.com

(১১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শক্তিশালীকরণঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মনিটরিং বিভাগকে শক্তিশালীকরণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের অফিস বাসভবনাদির সুবিধা প্রদান এই উপ-প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই উপ-প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় বরাদ্ধ ছিল, ৭২৫·০০ লক্ষ টাকা।

(বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯০-৯১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন ঃ

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৫-৮০) মেয়াদ কালের তৃতীয় বছরে পুনঃপরীক্ষা করে সেটাকে একটা কেন্দ্রীভূত কার্যক্রমে পুনর্বিন্যাস করা হয়। এই কেন্দ্রীভূত কার্যক্রমে সমবায় ভিত্তিক সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সম্প্রসারণ এবং নিবিড় এলাকা উন্নয়ন লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই কার্যক্রমে শিল্প ও যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি করারও ব্যবস্থা রাখা হয়।

অর্থনীতির এরকম একটা পরিবর্তনমুখী অবস্থা বিবেচনা করে এবং তৎকালে বাস্তবায়নাধীন ১৫০০টি প্রকল্পের দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করতে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালের জুন মাসে একটি দু'বছর মেয়াদী (১৯৭৮-৮০) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ধরে নেওয়া হয় যে, ইতিমধ্যে ১৯৭৭ সালের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

যথাযথ কার্যপ্রণালী বিধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জবাবদিহির ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্জিত সাফল্যের নিয়মিত এবং অর্থবহ পর্যালোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬-৭৭ সালে প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। উন্নয়ন প্রশাসনের দক্ষতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়।

প্রশাসনের অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরন শুরু করা হয়। সেই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ মোট ৭টি আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এসব আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ড সমূহের কাজের প্রধান প্রধান খাত নির্ধারণ করা হয় কৃষি, শিল্প, সেচ, পরিবহন, ক্ষুদ্র শিল্প, এবং সমাজ

www.pathagar.com

কল্যাণ। ১৯৭৮-৮০ইং দু'বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকালে ৭টি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় তার ১৬ শতাংশ অর্থাৎ ৮ কোটি টাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক, হাওড় এবং তদনুরুপ নিম্নভূমিও অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য ছোট বড় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই উন্নয়ন বোর্ড সমূহের কাজ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। অঞ্চল ভিত্তিতে উন্নয়নের এই উন্নয়ন কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলিকে সম্পৃক্তকরণ।

কঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমূখী)ঃ

এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় ৪১৮.৫৭ লক্ষ ডলার। এর মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রদেয় অংশ নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২৮৮.৫০ লক্ষ এবং ১২২.৮২ লক্ষ ডলার। এছাড়া এতে ইউ,এন,ডিপির অনুদান রয়েছে ৭.০৫ লক্ষ ডলার। এই প্রকল্পের আওতাধীন ১১টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১টি বাদে (উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরন) বাকী সব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে বোর্ডের ১৯৯০-৯১ইং বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরন উপ-প্রকল্পের কাজ বর্তমানেও চলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৮৮-৮৯ ইং এবং ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সব প্রকল্প বাস্তবায়নে শতকরা ১০০ ভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণের দিক থেকে যদি বিচার করা হয় তাহলে উন্নয়ন বোর্ডের সব প্রকল্প যে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চয়ই এক জিনিস নয়। যে কোন প্রকল্পের সাফল্য বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে, প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে সেই প্রকল্পের ভূমিকা। প্রকল্পে বরাদ্ধকৃত অর্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ ব্যয় প্রকল্পের সাফল্য বিচারের মাপকাঠি নয়।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের (বহুমূখী) আওতায় বাস্তবায়িত বেশ কিছু উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুফল প্রকল্প এলাকার জনগণ ভোগ

www.pathagar.com

করছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে রোড নেটওয়ার্ক উপ-প্রকল্পের কথা বলা যায়। এই উপ-প্রকল্পের আওতাধীন খাগড়াছড়ি-পানছড়ি, দীঘিনালা-বাবুছড়া, এবং দীঘিনালা-মারিশ্যা সড়ক তিনটি নির্মাণের ফলে ঐসব এলাকার সড়ক যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

বিগত দশকে পার্বত্য অঞ্চলে গ্রামীন ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এমনকি এসব শিল্পজাত পন্যের বিপনন সুবিধা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন "কুটির ও গ্রামীন শিল্প উন্নয়ন" উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণেই যে, এধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বিগত কয়েক বছরে পার্বত্য অঞ্চলের পল্লী এলাকাসমূহে অনেক স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে পল্লী এলাকার জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবই "জনস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা" বিষয়ক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল বলা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের (বহুমুখী) আওতায় বাস্তবায়িত এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পসমূহের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্পগুলি হল, 'উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ' এবং 'বনায়ন ও জুমিয়া পুনর্বাসন।' 'উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরন' উপ-প্রকল্প বর্তমানেও বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে বলে এর সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়নের সুযোগ এমুহূর্তে নেই। বনায়ন এবং জুমিয়া পুনর্বাসন উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ৯০০০ একর পাহাড়ী জমিতে বনায়ন করে তথায় ৩০০ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন করা। এই উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং অর্জিত ফলাফল সম্পর্কে বোর্ডের উপরোক্ত দুটি বার্ষিক প্রতিবেদনে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২৪-১২-৮৫ ইং তারিখের মাসিক সভার কার্যবিবরনীতে বলা হয় যে, "এই প্রকল্পের কাজের গতি অনেকটা মন্থর। পুনর্বাসন পল্লীগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে বাস্তবায়ন সংস্থা বার বার ব্যর্থ হইতেছে। ফলে মূল প্রকল্পটি ব্যর্থ হইতে পারে বলিয়া আশংকা করা যাইতেছে।" পরবর্তীকালে আদৌ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে কিনা বোর্ডের কাগজপত্র থেকে এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

www.pathagar.com

খঃ ইউনিসেফ সাহায্য পুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

পার্বত্য অঞ্চলের শিশু ও মাতাদের কল্যাণে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ একটি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনুদান দিতে সম্মত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড "ইউনিসেফ সাহায্য পুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প" নামে ১৯৮০ সালে দুবছর মেয়াদী (১৯৮০-৮২) একটি উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়। প্রকল্প এলাকার বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নই হল এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করনীয় কাজ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক) পানি ও মলবাহী রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ।

খ) পুষ্টিহীনতা বিশেষতঃ শিশু এবং মাতাদের পুষ্টিহীনতা রোধ করা।

গ) শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

ঘ) দুঃস্থ পরিবারদের জন্য বর্দ্ধিত আয়ের পথ সৃষ্টি করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সালে দু'বছরে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি মৌজার উপরে বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ ইং সালে ১৯২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও ৮টি মৌজায় উপরোক্ত কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করে। এই কর্মসূচীর দু'দফা সাফল্যে অনুপ্রাণীত হয়ে ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষ এই কর্মসূচীর মেয়াদ প্রথমে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ ইং এবং পরে ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত বাড়াতে সম্মত হন। বর্দ্ধিত সময়ের এই সম্প্রসারিত কর্মসূচীর ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২১১৫.৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প এলাকা তিন পার্বত্য জেলার আরও ৩৯টি মৌজা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এযাবত বাস্তবায়িত সব কার্যক্রমে সর্বোচ্চ পরিমাণ সাফল্যের দাবী করা হয়েছে।

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের ১৯৯০-৯১ ইং সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং এর বাস্তবায়নের খতিয়ান পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্মাণ খাতে ১১৬,১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ র সামাজিক সুফল মূল্যায়ন করা যায়। বান্দরবান জেলার মো আবাসিক

www.pathagar.com

বিদ্যালয়, রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে কাকড়াছড়ি উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয় এবং আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় ও সেগুলির প্রত্যেকটির সাথে ছাত্র/ ছাত্রীবাস এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বাসভবন। লামায় অফিস কাম গুদাম ও ১২টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এসব নির্মাণ কাজের সুফল সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ ইতিমধ্যে ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতেও ভোগ করবে।

তেমনিভাবে একই আর্থিক বছরে শিক্ষাখাতে যে ৬০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় তার সামাজিক সুফলও প্রনিধানযোগ্য। মো-আবাসিক বিদ্যালয়, রুমা আবাসিক বিদ্যালয় এবং আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক আবর্তক ব্যয় নির্বাহেই এই অর্থ ব্যয় করা হয়।

১১টি মৌজায় ৬৭টি নলকূপ স্থাপন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস জরীপকরন, স্লাব লেট্রিন উৎপাদন ইত্যাদি মিলে জনস্বাস্থ্য খাতে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখান হয়েছে। এর তাৎক্ষণিক সামাজিক সুফল অনস্বীকার্য। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে।

এছাড়া আলোচ্য বছরে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ২৫.৫৩ লক্ষ টাকা এবং আয়বর্দ্ধনমূলক কার্যক্রমে ৫.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখান হয়েছে। ঔষধ সরবরাহ ব্যতীত উপজাতীয় যুবক-যুবতীদের স্বাস্থ্যকর্মী এবং উপজাতীয় মহিলাদের ধাত্রী প্রশিক্ষণ, ফলমূলের চারা সরবরাহ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের কর্মসূচীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুফল তাৎক্ষনিকভাবে পাওয়া যাবে না। আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচী খাতে ৩০০ জন উপজাতীয় যুবক/যুবতীকে ঋণ প্রদান এবং ২৫০০ জন উপজাতীয় পরিবারের মধ্যে অর্থকরী ফসলের বীজ সরবরাহের অর্থনৈতিক সুফল তাৎক্ষণিক ভাবে মূল্যায়নের সুযোগ নেই।

ইউনিসেফ সাহায্য পুষ্ট সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে যে ৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় তার মধ্যে ব্যবস্থাপনা ব্যয় দেখান হয়েছে ৬৪.২৫ লক্ষ টাকা।এ ছাড়া বিবিধ খাতে ব্যয় দেখান হয়েছে ৩১.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে শুধু মাত্র মোটর সাইকেল ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। বাস্তবে ২০.০০ লক্ষ টাকা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে গন্য করা যায়। অর্থাৎ

www.pathagar.com

আলোচ্য আর্থিক বছরে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা খাতেই ব্যয় হয়েছে মোট ব্যয়ের ২৩ শতাংশ। প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির ব্যয় মিটাতে এই পরিমান অর্থের প্রয়োজন হয়েছে।

'গ' বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ

এই পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৮৪ -৮৫ ইং থেকে ১৯৮৯-৯০ ইং পর্যন্ত। পরবর্তীকালে এই মেয়াদ ১৯৯০-৯১ ইং পর্যন্ত বাড়ান হয়। এই পরিকল্পনার মূল বরাদ্ধ ছিল ২৬২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্ধ দেওয়া হয় ২৮০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা যা মূল বরাদ্ধ থেকে ১৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বেশী। সম্ভবতঃ পরিকল্পনার মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর ফলে এই অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনার অধীনে যে ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় তার মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পটি বাদে বাকী সব প্রকল্পই বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের অধীনে ২০টি সরকারী সংস্থা বাস্তবায়ন করেছে। ১৮ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন শতকরা ১০০ ভাগ এবং বাকী দুটির মধ্যে একটি ৭০ ভাগ (পরিবার কল্যান কেন্দ্র নির্মাণ) এবং অপরটি ৯৫ ভাগ (বান্দরবান ষ্টেডিয়াম নির্মাণ) বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখান হয়েছে। বরাদ্ধকৃত অর্থ ব্যয়ের দিক থেকে বিচার করলে কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশেষ পঞ্চ বাষির্কী পরিকল্পনার অধীন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ১৫ টি সড়কের মধ্যে ১৩টি সড়কের নির্মান কাজ শেষ করা হয়। বর্তমানে ঐ সব এলাকায় সড়ক যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। দু'একটি বাদে উপজেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এলাকার জনগন সরাসরি এর সুফল ভোগ করছে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বোর্ডের দাবী অনুসারে ২০ টি উপজেলা সদরে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। আবার কোন কোন উপজেলা সদরে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর সুফল যে উপজেলা সদর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগন ভোগ করছে তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতপক্ষে এই

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোন থেকেই প্রত্যেকটি প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য, টেলি যোগাযোগ, শিক্ষা এবং কুটিরশিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল জনগণ বর্তমানে সরাসরি ভোগ করছেন। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পাচ্ছেন। আর পল্লী অঞ্চলের জনগন গভীর/অগভীর নলকুপের মাধ্যমে পানীয় জল পাচ্ছেন। সব উপজেলার সাথে জেলা সদরের টেলিযোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালের আধুনিকীকরণ এবং ইউনিয়ন পর্য্যায়ে পরিবার কল্যান কেন্দ্র নির্মানের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের জনগন চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুরূপভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন, আবাসিক উপজাতীয় ছাত্রাবাস নির্মাণ, ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীদের বসবাস করার ও পড়ার ব্যবস্থা, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুটিরশিল্প খাতে তাঁত শিল্পে প্রশিক্ষণদান, তাঁত সরবরাহ, হস্ত শিল্পে কর্মশালার ব্যবস্থা, হস্ত শিল্পীদের যন্ত্রপাতি প্রদান, কুটির ও হস্ত শিল্পজাত পন্যাদি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলে কুটির এবং হস্তশিল্প প্রসারে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এসব শিল্পের প্রসার ঘটেছে, যার সুফল সরাসরি পার্বত্য অঞ্চলের জনগণই ভোগ করছেন।

বিশেষ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাধীন সমন্বিত জুমিয়া পুনর্বাসন এবং বনায়ন প্রকল্পে ২১৯৯·২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩,১৯৬ একর জমিতে ১৭৩০টি ভূমিহীন জুমিয়া পরিবার পূণর্বাসন করা হয়েছে বলে বোর্ডের ১৯৯০-৯১ ইং বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখান হয়েছে। মূল প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯৩৬.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩,০০০ একর জমিতে বনায়ন করে তথায় ৩৪,০০ জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন করা। এই প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে পুনর্বাসিত পরিবারগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা দরকার। তবে বরাদ্ধকৃত অর্থের চেয়ে ২৬২.৩৫ লক্ষ (২১৯৯.২০-১৯৩৬.৮৫ লক্ষ) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করে ৫৩,০০০ একরের স্থলে ১৩,১৯৬ একর জমি বনায়ন

www.pathagar.com

এবং ৩৪০০ পরিবারের পরিবর্তে ১৭৩০টি পরিবার পুনর্বাসন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়নেও শতকরা ১০০ ভাগ সাফল্য দাবী করেছেন।

জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের একটি অংশ সরাসরি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে উন্নয়ন বোর্ড জুমিয়া পুনর্বাসন এলাকায় ১৯৩.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি সুবিধা প্রদান করেছে। বোর্ড প্রকল্প এলাকায় স্কুলভবন, স্কুলের সাথে সংযোগ রাস্তা, উপসনালয় নির্মাণ, রিংওয়েল স্থাপন ইত্যাদি কাজে এই অর্থ ব্যয় করেছে। পুনর্বাসিত পরিবারগুলি বাস্তবে কি ধরনের কমিউনিটি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ছাড়া তা যাচাই না করে প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবে বোর্ড এই প্রকল্প বাস্তবায়নেও শতকরা ১০০ ভাগ সাফল্য দাবী করেছে।

বিশেষ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় আরও অনেক প্রকলপ যথা, বিশেষ কৃষি উন্নয়ন, উদ্যান উন্নয়ন, কুমিল্লা তুলাচাষ, পশু সম্পদ উন্নয়ন, পাল্লউড শ্রেণীর বৃক্ষাদির বন সৃষ্টি, মৎস্য উন্নয়ন, পর্যটন, শ্রম ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল ব্যাপক জনগণ ভোগ করবেনা। আবার কোন কোন প্রকল্পের সুফল তাৎক্ষনিকভাবে পাওয়া যাবে না। তাই এসব প্রকল্পের সাফল্য তাৎক্ষনিকভাবে এবং সঠিক অর্থে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হল, বিশেষ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতাধীন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে তালিকাভূক্ত রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়ক এবং রাঙ্গামাটি-ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান সড়কের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ। প্রথমোক্ত সড়ক খাগড়াছড়ি জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার এবং দ্বিতীয়টি বান্দরবান জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার সংযোগকারী সড়ক। এ দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় সড়কের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণে রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বান্দরবানের সাথে এবং হাটহাজারী-ফটিকছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ির সাথে সড়ক পথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ বেশ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।

www.pathagar.com

রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি-চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান সড়ক নির্মাণ পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের একটা ন্যায্য দাবী। নির্মাণ কাজ শুরু করার পর কেন যে, এতদিন যাবত অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে তার কারণ পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের কাছে বোধগম্য নয়। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি আলাদা জেলায় ভাগ করা হলেও এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা ধর্মীয়, জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক বন্ধন রয়েছে। তাই তারা চায় যে, জেলা হিসাবে ভাগ হলেও তিন জেলার অতীত বন্ধন এবং যোগাযোগ অটুট থাক। অথচ উল্লেখিত দুটি সড়কের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকার ফলে তিন জেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ সহজ হচ্ছেনা। তাই এটা এই অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপজাতীয় জনগণের জন্য একটা স্পর্শকাতর বিষয়।

এই দুটি সড়কের নির্মান কাজ অসমাপ্ত রাখার ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনে কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তাই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। সড়ক দু'টির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রাখার ব্যাপারে উন্নয়ন বোর্ডের দীর্ঘ নীরবতা এবং উদাসীনতা এই অঞ্চলের জনগণের মনে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে। অর্থের অভাব ছাড়া এ দুটি সড়কের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। অথচ বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিছুই বলছেন না।

মূল্যায়নের সার সংক্ষেপ ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী) এবং বিশেষ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে যে ৪১৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা (১৩,০০০·৩৯+২৮০৩৭·২৮ লক্ষ) ব্যয় করা হয় তাতে পার্বত্য অঞ্চলের একটা অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরী হয়েছে।

২। ইউনিসেফ সাহায্য পুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের পল্লী এলাকার জনগণের সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়, সেগুলিও বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী

www.pathagar.com

পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অনুরূপ খাতের এবং কোন কোনটা একে অন্যের সম্পূরক। এসব প্রকল্পও পল্লী অঞ্চলে সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪। মূল পরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্ধকৃত অর্থের একটা বড় অংশ সংস্থাপন/ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করতে হচ্ছে। এব্যাপারে ইতিমধ্যে ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সংস্থাপন ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বোর্ডের ১৯৯০-৯০ অর্থ বছরের নিয়মিত কার্যক্রম (নরমাল বোর্ড) পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য আর্থিক বছরে যে ২৪৪.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, তার ২৬.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬৫ লক্ষ টাকা সংস্থাপন খাতে ব্যয় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা, জ্বালানী এবং কন্সাল্‌টেন্সিসহ ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৭৬৯.৫০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয়ের ১৮ শতাংশ সংস্থাপন খাতে ব্যয় হচ্ছে।

৫। ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প এবং উচ্চভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প বাদে উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলির মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু আজও উন্নয়ন বোর্ডকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটা বিশাল কর্মীবাহিনীর দায় বহন করে যেতে হচ্ছে। অনেকটা এদের কর্মসংস্থানের জন্যই নতুন কোন কার্যক্রম না থাকা সত্বেও নরমাল বোর্ড নামে একটা কার্যক্রম চালু রাখার প্রয়োজন হয়েছে।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পুনর্বাসিত বাঙালী এবং উপজাতীয়দের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাতঃ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা

১৯৭৯ সালেই তৎকালীন সরকার পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসন কাজ শুরু করেন, যা ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত পুরাদমে অব্যাহত থাকে। সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসিত এসব বাঙালীদের অবশ্য সরকারী কাগজপত্রে নতুন বসতিস্থাপনকারী বাঙালী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে এসব বাঙালীদের পার্বত্য অঞ্চলে আনা হয়েছে, সেকথা সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়নি। ৪-৯-৮০ ইং তারিখের স্মারক নং ৬৬ (৯) সি মূলে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের কাছে লেখা গোপনীয় চিঠি এবং ১৫-৯-৮০ ইং তারিখের স্মারক নং ১০২৫ (৯) সি মূলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক কর্তৃক অন্য জেলার জেলা প্রশাসকদের কাছে লেখা গোপনীয় চিঠির ভাষ্যই প্রমাণ করে যে, অন্য জেলা থেকে বাঙালীদের সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ ট্রাইবেল কনভেনশনের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বাঙালী পুনর্বাসনের এই সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যদিও সরকার সেসব প্রতিবাদ এবং আপত্তিকে গ্রাহ্য করেননি।

পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসনের বিষয়ে শুধু সরকার এবং উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেই মন কষাকষি হয়নি, পুনর্বাসিত বাঙালী এবং স্থানীয় উপজাতীয়দের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ সৃষ্টি হয়। উপজাতীয়রা জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারী নিয়মকানুন সম্বন্ধে অবহিত নন বিধায় প্রায় ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত ছাড়া জমি আবাদ এবং ভোগ দখল করত। এছাড়া বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমির পার্শ্ববর্তী খাস জমিও কোন কোন ক্ষেত্রে ভোগ দখল করত। যেসব এলাকায় বাঙালী পুনর্বাসন করা হয়েছিল, সেসব এলাকায় উপজাতীয়দের দখলীয় বহু খাস জমি পুনর্বাসিত বাঙালীদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বাঙালীদেরকে পাহাড়ী জমিই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন পুনর্বাসিত বাঙালী নিজ বন্দোবস্ত পাহাড়ী জমি সংলগ্ন উপজাতীয়দের বন্দোবস্ত অথবা খাস দখলীয় জমি স্থানীয়

www.pathagar.com

প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের যোগসাজশে অনেকটা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। এসব কারণে স্থানীয় উপজাতীয় এবং পুনর্বাসিত বাঙালীদের মধ্যে বিরোধ দিন দিন দানা বাঁধতে থাকে।

স্থানীয় উপজাতীয় জনগণ এবং পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের মধ্যেকার বিরোধের প্রথম ভয়াবহতম বিস্ফোরণ ঘটে ২৫শে মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখে বর্তমান কাউখালী থানাধীন কাউখালী থানা সদর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায়। ঐদিনের ঘটনার বিবরণ সেই সময় তাৎক্ষনিকভাবে রাঙ্গামাটিতে পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় এবং পুনর্বাসিত বাঙালী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে ঘটনার পূর্বেকার অবস্থা এবং মূল ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

পুনর্বাসিত বাঙালী নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী ২৫শে মার্চের পূর্ববর্তী সপ্তাহ থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পুনর্বাসিত বাঙালীদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ সম্বলিত বেশ কিছু পোষ্টার লোক চলাচলের রাস্তায় লাগাতে থাকে। এমনকি তারা রাতের অন্ধকারে এধরণের পোষ্টার রাস্তায় ফেলে রেখে যেত। এতে স্বাভাবিকভাবে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের মনে দারুন আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে থাকে।

বিভিন্ন হুমকি সম্বলিত শান্তিবাহিনীর এসব পোষ্টার এবং প্রচারপত্র বিলির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা এবং ২৬শে মার্চে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কল্পে কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ ২৫শে মার্চ সকাল ৯টায় পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানীয় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং পুনর্বাসিত বাঙালী দলপতিদের এক সভা আহবান করেছিলেন। স্থানীয় উপজাতীয় জনগণের সূত্রে জানা গেছে যে, ২৬শে মার্চ উদযাপন কল্পে ২৫শে মার্চ সকালে পোয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন পোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে লোক দেওয়ার জন্য স্থানীয় ক্যাম্প অধিনায়ক পূর্বেই উপজাতীয় পাড়ার কার্বারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুযায়ী কাউখালী সদরের পার্শ্ববর্তী পাড়া থেকে আনুমানিক ৫০/৬০ জন উপজাতীয় লোক ঘটনার দিন সকালে পোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার করতে এসেছিল।

সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহুত সভায় যোগদানের জন্য ৯টার আগেই কিছু পুনর্বাসিত বাঙালী দলপতি এবং উপজাতীয় নেতা কাউখালী বাজারে

www.pathagar.com

এসে বিভিন্ন চায়ের দোকানে বসে চা নাস্তা খাচ্ছিলেন। এ সময় কাউখালী থানা সদর এবং পার্শ্ববর্তী পাড়ার কার্বারীগণের একটা অংশ পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সেনা ছাউনিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সভা শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে সকাল আনুমানিক ৯টার সময় কাউখালী বাজারের পশ্চিম দিক থেকে একটি গুলির আওয়াজ হয়। পরক্ষনেই কাউখালী বাজারের চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে গোলাগুলি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুনর্বাসিত বাঙালী নেতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, গোলাগুলির সাথে সাথে পোয়াপাড়া, মাইগ্যামাছড়া, বেতছড়ি, মিতিঙ্গাছড়ি, হাতিমারা, কাশখালী, ছোট ডলু ইত্যাদি গ্রামে পুনর্বাসিত বাঙালীদের বাড়ীঘরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং কিছুক্ষনের মধ্যে পুনর্বাসিত বাঙালীদের কয়েক হাজার বাড়ী পুড়ে ছারখার হয়।

এদিকে কাউখালী সেনা ছাউনির দিকে চারদিক থেকে বৃষ্টির মত গুলি আসতে থাকে এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা পাল্টা গুলি ছুড়তে থাকে। এসময় কাউখালী বাজারে আগত লোকজন এবং বাজারের আশেপাশে বসবাসকারী পুনর্বাসিত বাঙালীরা ভয়ে আর্তচিৎকার করতে থাকে। পুনর্বাসিত বাঙালী নেতাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, ঐ সময় কাউখালী সদরের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে ৩০১৯ পরিবার পুনর্বাসিত বাঙালী বসবাস করছিলেন। গোলাগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এসব বাঙালীরা প্রান ভয়ে কাউখালী বাজারে এসে সমবেত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা সেখানেই সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয়।

শান্তিবাহিনীর হামলায় উপজাতীয়দের একটা অংশ সহযোগিতা করেছে এবং পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের বাড়ীঘর জ্বালানোর কাজে অংশগ্রহণ করেছে বলে অভিযোগ আছে। শান্তিবাহিনী এবং উপজাতীয়দের এই সন্মিলিত হামলায় ৭জন পুনর্বাসিত বাঙ্গালী নিহত হয়েছে বলে হিসাব পাওয়া গেছে। শান্তিবাহিনীর হামলা সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। শান্তিবাহিনীর হামলা প্রতিহত হওয়ার পর পরই পুনর্বাসিত বাঙ্গালীরা কাউখালী থানা সদর এবং এর পার্শ্ববর্তী পোয়াপাড়া, বেতছড়ি, মিতিঙ্গাছড়ি, রাঙ্গীপাড়া, কচুখালী, ছোট ডলু, মাইগ্যামাছড়া, কাশখালী, হারাঙ্গীপাড়া ইত্যাদি উপজাতীয় পাড়ায় পাল্টা হামলা চালিয়ে শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের এই হামলায় শতাধিক উপজাতীয় লোক মারা গেছে বলে ধারণা করা হয়। তবে সরকারীভাবে এর কোন পরিসংখ্যান বা হিসাব পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

২৫শে মার্চ তারিখের শান্তিবাহিনীর হামলার পরবর্তী ঘটনায় নিহত বেশ কয়েকজন উপজাতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন কাউখালী বাজারের বাজার চৌধুরী কুমুদ বিকাশ তালুকদার, পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সেক্রেটারী শশীদেব চাকমা, মিতিঙ্গাছড়ি পাড়ার অশ্বিনী কুমার কার্বারী, রাঙ্গীপাড়ার বিজয় কুমার কার্বারী, পোয়াপাড়ার অশ্বিনী কুমার কার্বারী, হারাঙ্গীমুখ পাড়ার মংরী কার্বারী, কচুখালীর সুখই কার্বারী এবং ম্যফা কার্বারী। এরা সবাই কাউখালী সদরে অথবা কাউখালী বাজারে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের হামলায় নিহত হয়েছেন বলে সরকারীভাবে বলা হয়েছিল।

পোয়াপাড়া বৌদ্ধ বিহারের বাগান ও তৎসংলগ্ন জঙ্গল পরিস্কার করার জন্য বিভিন্ন পাড়া থেকে আগত ও ঘটনার সময় কাউখালী বাজারে অবস্থানরত যে ক'জন উপজাতীয় লোক পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের হামলায় নিহত হয়েছে তাদের বেশ কয়েকজনের নামও পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ছিল পঞ্চম কুমার তালুকদার, তার ভাই শুক্রকান্ত তালুকদার, পোয়াপাড়ার কালঞ্জয় চাকমা, তার ভাই কৃষ্ণ হরি চাকমা, চন্দ্রচান চাকমা, প্রেম লাল চাকমা, বাত্যা চাকমা, নিক্যা চাকমা এবং শশীদেব চাকমার পুত্র ধন্যা চাকমা (ডাক নাম) এবং বেতছড়ি পাড়ার ঢেলা চাকমা।

সেনাবাহিনী কর্তৃক আহুত সভায় যোগদানকারী যে সকল নেতৃস্থানীয় উপজাতীয় ব্যক্তি ঘটনার সময় কাউখালী সদরে উপস্থিত ছিলেন অথচ প্রানে বেঁচে গেছেন, তাদের মধ্যে পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব অমরেন্দ্র রোয়াজা, কলমপতি ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব চাইন্দ্যু কার্বারী এবং পোয়াপাড়ার মৃত ক্ষিতিশ রঞ্জন তালুকদারের পুত্র জনাব পরিমল কান্তি তালুকদারের নাম পাওয়া গেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি কাউখালী সদরে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। স্থানীয় সেনাকর্তৃপক্ষ তাকে কাউখালী থেকে হেলিকপ্টার যোগে চট্টগ্রাম সামরিক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান। চিকিৎসার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রানে বেঁচে যান। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে পরবর্তীকালে তারা ২৫ শে মার্চের ঘটনা বিশেষতঃ কাউখালী থানা সদর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত ঘটনার বিবরণ স্থানীয় জনগনের কাছে দিয়েছিলেন। কাউখালী থানা সদরে উপজাতীয় নেতা এবং সাধারণ উপজাতীয়দের হত্যার ঘটনা সম্পর্কে সরকারীভাবে যে ভাষ্য প্রদান করা হয় তা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাদের বক্তব্যের সাথে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যপূর্ন ছিলনা। তাছাড়া সেনাছাউনির কাছে থানা সদরে সংঘটিত এই হত্যাকান্ডের দায়দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তায়।

কাউখালী থানা এলাকায় সংঘটিত ২৫শে মার্চের সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনার পরবর্তী ঘটনাবলীর কথা হয়ত আজও অনেকের মনে আছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামসমূহের উপজাতীয়রা কাউখালীর বাইরে পালিয়ে যাওয়ার পর পরই সম্পূর্ন ঘটনা রাঙ্গামাটি এবং এর বাইরে এমনকি রাজধানীতে পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে যায়। এতে উপজাতীয়দের মধ্যে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিষয়টি শেষ পর্য্যন্ত সংসদে উত্থাপিত এবং আলোচিত হয়। তখনই সরকারের টনক নড়ে। এই ঘটনায় স্থানীয় জনগন তথা পার্বত্য অঞ্চলের জনগনের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিয়ে তৎকালীন বি.এন.পি সরকার ১৯৮০ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব অংশৈ প্রু চৌধুরীকে কাউখালী পরিদর্শনে পাঠান। রাঙ্গামাটি থেকে জনাব চারু বিকাশ চাকমাও ঐদিন প্রতিমন্ত্রীর সাথে কাউখালী যান। জনাব চারু বিকাশ চাকমাই রাঙ্গামাটি জেলার উপজাতীয় নেতা যিনি সর্বপ্রথম কাউখালীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্থানীয় সেনা এবং বেসামরিক কোন কর্তৃপক্ষই রাঙ্গামাটির উপজাতীয় এবং উপজাতীয় নেতাদেরকে কাউখালীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করেন নি।

খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব অংশৈ প্রু চৌধুরীর সফরের পর পরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের অন্যতম নেতা সাংসদ জনাব শাহাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় সাংসদদের একটি টিম কাউখালী পরিদর্শনে আসেন। এই টিমে সাংসদ জনাব রাশেদ খান মেনন এবং জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমাও ছিলেন। তারা ঢাকায় ফিরে গিয়ে কাউখালী ঘটনার জন্য তৎকালীন সরকারকে দায়ী করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং সংসদে আলোচনা করেছেন, যা এখন ইতিহাসে পর্য্যবসিত হয়েছে।

কাউখালীর ঘটনার পর পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষতঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আরও দুটি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়। তার একটি সংঘটিত হয় বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন নব খাগড়াছড়ি গ্রামে ১৯৮৮ সালের ৮ই আগষ্ট এবং অপরটি লংগদু উপজেলা সদর এবং এর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা এবং ৫ই মে তারিখে।

শান্তিবাহিনীর এক অতর্কিত হামলায় সেনাবাহিনীর ৭ জন সদস্য নিহত এবং বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য আহত হওয়ার পর পরই স্থানীয়

www.pathagar.com

পুনর্বাসিত বাঙালীরা পার্শ্ববর্তী নব খাগড়াছড়ি এবং উপজাতীয় গ্রামসমূহে হামলা চালায়। সরকারী ভাষ্যমতে, এতে কিছু সংখ্যক উপজাতীয় লোক হতাহত হয় ও তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হামলাকালে খাগড়াছড়ি এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উপজাতীয় জনগণ পালিয়ে যায়। কিন্তু খাগড়াছড়ি এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে রাঙ্গামাটি পালিয়ে আসা উপজাতীয়দের ভাষ্য মতে, শান্তিবাহিনীর হামলায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা হতাহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পরার সাথে সাথেই নিকটস্থ সেনাছাউনির সদস্যরা খাগড়াছড়ি এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় গ্রামসমূহে হামলা চালিয়ে উপজাতীয়দের নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষ গুলি করে হত্যা করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের পুনর্বাসিত বাঙালীরাও সেনাবাহিনীর এই হামলায় অংশ গ্রহণ করে। স্থানীয় উপজাতীয়দের হিসাব মতে সেনাবাহিনী এবং পুনর্বাসিত বাঙালীদের এই যৌথ হামলায় শতাধিক উপজাতীয় নারীপুরুষ নিহত হয়েছিল। ঐ ঘটনার জের হিসাবে ঐ একই দিন বাঘাইছড়ি সদরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় একজন উপজাতীয় লোক নিহত হয়েছিল। এমনকি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব লক্ষ্মীকুমার চাক্‌মা ঐদিন পরিষদের কয়েকজন বাঙালী কর্মচারী দ্বারা প্রহৃত হয়েছিলেন। উপজাতীয় গ্রামসমূহে সেনাবাহিনীর কথিত হামলা এবং উপজাতীয় লোক হত্যা সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ সূত্রের সমর্থন পাওয়া যায়নি।

লংগদু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রশীদ সরকারের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে সন্ধ্যায় উপজেলা সদরে এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় গ্রামসমূহে পুনর্বাসিত বাঙালীরা হামলা চালায়। ভিডিপির সদস্যরা থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে এই হামলায় নেতৃত্ব দেয়। তারা সর্বপ্রথম লংগদু উপজেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব অনিল বিহারী চাক্‌মার পাড়ায় হামলা চালায়। এতে তার স্ত্রী এবং তার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণকারী পাড়ার কয়েকজন লোক নিহত এবং আহত হয়। জনাব অনিল বিহারী চাক্‌মার বাড়ী এবং পার্শ্ববর্তী সব গ্রামের বাড়ী ঐ রাত্রেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন পুনর্বাসিত বাঙালীরা উপজেলা সদরের বাইরে অবস্থিত উপজাতীয় গ্রামসমূহে হামলা চালিয়ে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। পরদিন রাঙ্গামাটি থেকে গিয়ে উপজাতীয় ও অউপজাতীয় নেতারা হেলিকপ্টার থেকে লংগদু উপজেলার কয়েকটি গ্রামে আগুন জ্বলতে দেখেছেন। এই দাঙ্গায় নিহত নারী পুরুষ এবং শিশুর হিসাব পাওয়া গেছে। জনাব অনিল বিহারী চাক্‌মার বাড়ীর ধ্বংসস্তুপ থেকেই ঘটনার পরের দিন তার স্ত্রীসহ ৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। আর সরকারীভাবেই ১ হাজারের অধিক বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হিসাব পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রেও উপজেলা সদরে এবং সেনাছাউনি ও থানার কাছে প্রশাসনের নাকের ডগাতেই জনাব অনিল বিহারী চাক্‌মার পাড়ায় পুনর্বাসিত বাঙালীরা হামলা চালিয়ে উপজাতীয়দের হত্যা করেছিল, যাদের মধ্যে ৭জনই ছিল এক পরিবারের সদস্য।

শান্তিবাহিনীর হামলার জবাবে বাঙালীদের পান্টা হামলাঃ উপজাতীয়দের দেশত্যাগ

১৯৭৯ সালের ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর শান্তিবাহিনী সর্বপ্রথম বর্তমান লংগদু উপজেলাধীন ২৩নং বগাচতর মৌজাধীন রাঙ্গীপাড়ার পার্শ্ববর্তী পুনর্বাসিত বাঙালীদের গ্রামে হামলা চালায় এবং শতাধিক বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। শান্তিবাহিনীর এই হামলায় বেশ কয়েকজন পুনর্বাসিত বাঙ্গালী হতাহত হয়। ২৩শে ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি থেকে লেখকসহ কয়েকজন উপজাতীয় নেতা সেখানে যান এবং পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের ভস্মীভূত বাড়ীঘরের অংশ এবং আগুনের তান্ডব লীলার চিহ্ন দেখতে পান। শান্তিবাহিনী ১৯৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বারের মত বর্তমান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলাধীন পুনর্বাসিত বাঙালীদের গ্রামে হামলা চালিয়ে ১৩ জন বাঙালীকে হত্যা ও ২৩ জনকে জখম করে। এতে বাঙালীদের পান্টা হামলার ভয়ে সেখানকার উপজাতীয়রা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। অনেকে ভারতে চলে যায়, যদিও তারা পরে দেশে ফিরে আসে। ১৯৮৪ সালের ৩১শে মে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বরকল উপজেলাধীন ভূষণছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত পুনর্বাসিত বাঙালীদের গ্রামসমূহে হামলা চালিয়ে বহু নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। বাঙালীদের পান্টা হামলায় ভূষণছড়া এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের উপজাতীয়রা ভারতের মিজোরাম রাজ্যে পালিয়ে যায়।

পুনর্বাসিত বাঙালীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করার এবং তাদেরকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিস্কার না করার প্রতিবাদে ৭ই মে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে জনসংহতি সমিতি ১৯৮৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী "জরুরী ঘোষণা" নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করে। জনসংহতি সমিতির এই আহ্বান উপেক্ষা করে কিছু নেতা বিশেষতঃ বাঙালী নেতারা সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্যোগ নিলে ঐ বছরের ২৯শে এপ্রিল শান্তিবাহিনী খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি এবং মাটিরাংগা উপজেলার পুনর্বাসিত বাঙালী গ্রামসমূহে হামলা চালায়। এতে সরকারী হিসাব মতে, ৩৮ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। পুনর্বাসিত বাঙালীরা তখন পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় গ্রামে হামলা চালিয়ে

www.pathagar.com

(বেসরকারী হিসাব মতে) ২০/২৫ জন উপজাতীয় নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। ফলে মাটিরাংগা এবং পানছড়ি উপজেলায় বসবাসকারী প্রায় সব উপজাতীয় লোক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ৭ই মে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যায়, যাতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

সংসদ নির্বাচনের পরও শান্তিবাহিনী পুনর্বাসিত বাঙালীদের গ্রামে হামলা অব্যাহত রাখে। শান্তিবাহিনী ১৯৮৬ সালের ১৩ই মে পানছড়িতে, ২রা জুন লংগদুতে, ২৭শে জুন পুনরায় পানছড়িতে এবং ২৭শে জুলাই লক্ষীছড়িতে পুনর্বাসিত বাঙালীদের গ্রামে হামলা চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করে। শান্তিবাহিনীর এই বাঙালী নিধন অভিযানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পুনর্বাসিত বাঙালীরা ১৯৮৬ সালের ১৮ই মে মাটিরাঙ্গা উপজেলার গৌরাংগ পাড়া এবং ১৩ ও ১৪ই জুন দীঘিনালা উপজেলাধীন রেংকার্য্যা, ছোট মেরুং, বড় মেরুং, বোয়ালখালী, তারাবনিয়া, বানছড়া, কবাখালী, পাবলাখালী, দীঘিনালা ও কাটারুং মৌজার উপজাতীয় গ্রামসমূহে হামলা চালিয়ে শত শত বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগীসহ লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল লুট ও বেশ কয়েকজন উপজাতীয়কে হত্যা করে। এসব মৌজা ও গ্রামের উপজাতীয়রা সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যায়। দীঘিনালা, পানছড়ি এবং মাটিরাঙ্গা উপজেলা থেকে পালিয়ে যাওয়া এসব উপজাতীয়রাই আজ ভারতে অবস্থানকারী উপজাতীয় শরণার্থী হিসাবে পরিচিত, যাদের সংখ্যা ৫০ হাজার বলে জনসংহতি সমিতি দাবী করে আসছে। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার এই সংখ্যা ৩০ হাজার বলে স্বীকার করেছে, যাদের মধ্যে ২৫ হাজার ইতিমধ্যে দেশে ফিরে এসেছে বলে জানা যায়।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

সমস্যা সমাধানের লক্ষে উপজাতীয় নেতাদের উদ্যোগ

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে উপজাতীয় প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎঃ

১৯৮৬ সালের এপ্রিল এবং মে মাসের বিভিন্ন তারিখে শান্তিবাহিনী মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি এবং দীঘিনালা উপজেলার বেশ কিছু এলাকায় পুনর্বাসিত বাঙালীদের গ্রামসমূহে উপর্য্যুপরি হামলা চালিয়ে যায়। শান্তিবাহিনীর এই বাঙালী হত্যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পুনর্বাসিত বাঙালীরা পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় গ্রামগুলিতে পাল্টা হামলা চালালে উপরোক্ত উপজেলাসমূহে বসবাসকারী প্রায় সব উপজাতীয় লোক বাড়ীঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে ভারতের ত্রিপুরা এবং মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নেয়।

৩০ থেকে ৪০ হাজার উপজাতীয় লোক ভারতে চলে যাওয়ার পরও শান্তিবাহিনী বাঙালী নিধন অভিযান বন্ধ করেনি। ১৯৮৬ সালের প্রায় পুরো বছরটিই শান্তিবাহিনী তাদের এই সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যায়। সেই সময় সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ- বাঙালী এবং উপজাতি-ভয় ভীতি এবং অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। একদিকে বাঙালীরা শান্তিবাহিনীর হামলার আশঙ্কায়, অন্যদিকে উপজাতীয়রা বাঙালীদের হামলার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। শান্তিবাহিনীর এই সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে কোন সম্প্রদায়ের মানুষই নিরাপদ বোধ করছিলনা। জনগণ ভীষণ অসহায় বোধ করতে থাকে। বলতে গেলে, পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের স্বাভাবিক জীবনধারা যেন এক প্রকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উপজাতীয় নেতারা নিজেরাও যেন এই অস্থির এবং ভয়াবহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অথচ এই অস্থির এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বেশীদিন টিকে থাকাও সম্ভব নয়।

তাই সেই অস্থির, অনিশ্চিত এবং দুঃসহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজার লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ টাইবেল কনভেনশনের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ বৈঠকে মিলিত হতে থাকেন। এমনকি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সাথেও এবিষয়ে মত বিনিময় করতে আরম্ভ করেন। এ পর্যায়ে ১৯৮৬ সালের ২৪শে জুন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটি টাউন হলে স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে

www.pathagar.com

এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। ১৯৮৬ সালের ২৩শে আগষ্ট বেলা ১১টায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী বি, কে, দেওয়ান রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা এবং এর সমাধানের উপায় সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাষ্টপতির কাছে উপস্থাপনের জন্যে জনাব বি, কে, দেওয়ানের নেতৃত্বে একাট উপজাতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৬ সালের ১১ই নভেম্বর রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় এবং অউপজাতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিবাহিনীর অব্যাহত সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে সৃষ্ট পার্বত্য অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি বৈঠকে পর্যালোচনা করার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, এই অনিশ্চিত এবং দুঃসহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পন্থা খুঁজে বার করতে হবে। এ লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্তও ঐ বৈঠকে নেওয়া হয়। সেই লক্ষ্যে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। উক্ত উপজাতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী জনাব বি. কে. দেওয়ান। চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা জনাব সুবিমল দেওয়ান, রাষ্টপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মা, প্রাক্তন সংসদ সদস্য জনাব চাইথোয়াই রোয়াজা, ট্রাইবেল কনভেনশনের সভাপতি ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব শান্তিময় দেওয়ান, নানিয়ারচর উপজেলা চেয়ারম্যান তিলকচন্দ্র চাক্‌মা ও রাঙ্গামাটি পৌরসভা চেয়ারম্যান জনাব গৌতম দেওয়ান উক্ত প্রতিনিধিদলে সদস্য ছিলেন। উপজাতীয় প্রতিনিধিদলটি ১৯৮৬ সালের ১৬ই নভেম্বর প্রথমে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৭ই নভেম্বর বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করে তা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপ পুনরায় শুরু করার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অনুরোধ করেন। জনসংহতি সমিতিকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দানের আশ্বাস প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টকে প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শীঘ্রই এবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন।

www.pathagar.com

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে সরকারী উদ্যোগের অংশ হিসাবে ১৯৮৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী প্রতিমন্ত্রী জনাব বি.কে দেওয়ান রাঙ্গামাটি আসেন এবং উপজাতীয় নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। জনাব বি. কে দেওয়ান বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে জানান যে, জনসংহতি সমিতি জনাব উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে গঠিত যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে আলোচনা চালাতে আগ্রহী। তাই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে গঠিত যোগাযোগ কমিটি অবিলম্বে পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং সে কমিটির মাধ্যমেই ভবিষ্যতে জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করা হবে।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে জনমত যাচাই করার জন্য ১৯৮৭ সালের ১৫ই মার্চ রাঙ্গামাটি জেলা ট্রাইবেল কনভেনশন কমিটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি টাউনহলে এক জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সিদ্ধান্ত হয় যে, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৮৭ সালের ২১শে মার্চ ট্রাইবেল কনভেনশন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি ও সির সাথে সাক্ষাৎ করে জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে ইতিপূর্বে পুনর্গঠিত যোগাযোগ কমিটিকে জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

ঠিক এই পর্যায়ে এসে বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আলোচনা চালানোর জন্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৮৭ সালের ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন রাঙ্গামাটিতে রাঙ্গামাটি জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজাতীয় নেতাদের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেন। ১৯৮৭ সালের ১১ই মে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব এবং একজন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিবসহ রাঙ্গামাটি সফর করেন এবং উপজাতীয় নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তিনিও উপজাতীয় নেতাদেরকে সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুরূপ প্রস্তাব দেন।

www.pathagar.com

যোগাযোগ কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির বৈঠকঃ

সে পর্যায়ে জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না বলে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। কারণ, জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান পক্ষ। জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সরকার পক্ষকে পরামর্শ দেন। তাই জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য তিন জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাদের সেই শুভ উদ্যোগ সফল হয়। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ পুনরায় সরকারের সাথে বৈঠকে বসতে সম্মত হন।

জনসংহতি সমিতি এবং সরকার পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের স্থান এবং সময় নির্ধারণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৯৮৭ সালের ১৯শে জুলাই জনসংহতি সমিতি এবং যোগাযোগ কমিটির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যেশ্যে ১৯৮৭ সালের ২৪শে আগষ্ট জনসংহতি সমিতি এবং যোগাযোগ কমিটির মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ঘোষণাঃ

১৯৮৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ চট্টগ্রাম সফরে এলে তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে তিনি পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে একটা জাতীয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা বলে ঘোষণা করেন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে বলেও তিনি ঐ বৈঠকে ঘোষণা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এ, কে, খোন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নেতৃবৃন্দের বৈঠকঃ

১৯৮৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি জেলার উপজাতীয় নেতাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উপজাতীয় নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি প্রায় একই সময়ে খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে একই বিষয়ে মত বিনিময় করে। এদিকে, জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের নিরাপত্তার ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি যে শর্ত আরোপ করে তাতে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দেয়। বৈঠকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন কল্পে পরামর্শ দানের জন্য ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সি, জেনারেল আব্দুস সালাম ৪ঠা অক্টোবর চট্টগ্রাম সেনানিবাসে তিন পার্বত্য জেলা উপজাতীয় নেতাদের এক বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে নিরাপত্তার ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি শিথিল করার জন্য জনসংহতি সমিতিকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশ্য জনসংহতি সমিতিকে এ ব্যাপারে আর অনুরোধ করতে হয়নি। সরকার পক্ষ শেষ পর্যন্ত বৈঠকের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ভার জনসংহতি সমিতির কাছে ছেড়ে দেন।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উপজাতীয় নেতাদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ১৯৮৭ সালের ৭ই অক্টোবর দ্বিতীয় বার রাঙ্গামাটি সফর করে।

সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের প্রস্তুতি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে ১৯৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর যোগাযোগ কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙ-এ সর্বশেষ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

সরকার ও জনসংহতির সমিতির মধ্যে সংলাপ

সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে পৌনঃপৌনিক বৈঠকঃ

২য় বৈঠকঃ

১৯৮৭ সালের ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙ এলাকায় জনসংহতি সমিতি এবং সরকার পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে জনসংহতি সমিতি প্রথম বারের মত একটি পাঁচ দফা দাবীনামা সরকার পক্ষের কাছে পেশ করে। জনসংহতি সমিতির পাঁচটি প্রধান দাবী হলঃ (১) পার্বত্য অঞ্চলকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা, (২) পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মতামত ব্যতিরেকে যাতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনিক মর্যাদা পরিবর্তন করা না হয় সে ব্যাপারে সাংবিধানিক বিধিনিষেধের ব্যবস্থা রাখা, (৩) ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্টের পর পার্বত্য অঞ্চলে বসতিস্থাপনকারী বাঙালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেয়া, (৪) পার্বত্য অঞ্চলের উন্নতিকল্পে বিভিন্নখাতে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা এবং (৫) পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত পাঁচটি প্রধান দাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও ২৫টি দাবী সেখানে ছিল।

জনসংহতি সমিতির পাঁচ-দফা দাবীনামা সরকার পক্ষ আলোচনার জন্য গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তাদের মতে, পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্বশাসনের দাবী বাংলাদেশ সংবিধানের পরিপন্থি। কারণ ইউনিটারী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে কোন বিশেষ এলাকার জন্য প্রাদেশিক মর্যাদাসহ স্বায়ত্বশাসন প্রদান সাংবিধানিকভাবে অসম্ভব। তাই সরকার পক্ষ তাদের দাবীনামা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পুনঃ পেশ করার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানান। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের দাবীনামা সংশোধন করতে অসম্মতি প্রকাশ করলে আলোচনা ভেংগে যায়। তবে উভয় পক্ষ অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হতে সম্মত হন।

www.pathagar.com

জনসংহতি সমিতি ও সরকার পক্ষের ৩য় বৈঠকঃ

১৯৮৮ সালের ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী পূর্বের একই স্থানে জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির কাছে নিম্নোক্ত কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেনঃ- (১) জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আইনজ্ঞ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সহিত জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের আলোচনার ব্যবস্থা করা, (২) জনসংহতি সমিতি কতৃক এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করা, যিনি মন্ত্রী সভার সদস্যভুক্ত হবেন, (৩) পাঁচ দফা দাবীনামা সরাসরি প্রেসিডেন্ট অথবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সির কাছে গোপনে পেশ করা এবং (৪) পাঁচ দফার বিকল্প হিসাবে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক নতুন প্রস্তাব পেশ করা।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকার পক্ষের উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান এবং জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবীনামা গ্রহণ করার ব্যাপারে সরকারের অপারগতার কারণ জানতে চান। সরকার পক্ষ উক্ত দাবী গ্রহণ করার ব্যাপারে সাংবিধানিক বাধার বিষয়টি উল্লেখ করেন। জনসংহতি সমিতির ভাষায়, "বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত হয়"।

জনসংহতি সমিতি ও সরকার পক্ষের ৪র্থ বৈঠকঃ

১৯৮৮ সালের ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে চতুর্থ বৈঠক পূর্বের একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইউনিটারী রাষ্ট্র কাঠামো ভেংগে পার্বত্য অঞ্চলে একটা প্রদেশ সৃষ্টি করতঃ তথায় স্বায়ত্বশাসন প্রদানের দাবী সংবিধান পরিপন্থী এবং ৫ লক্ষ উপজাতীয় জনগোষ্ঠির দাবীর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তনের নিমিত্তে সংবিধান সংশোধন বাংলাদেশের ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ অধিবাসী মানবেনা- এই যুক্তিতে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীনামার উপর আলোচনা চালাতে পুনরায় অসম্মতি প্রকাশ করে। অন্যদিকে সরকার পক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সংবিধানের আওতায় সমাধানের লক্ষ্যে ৯টি প্রস্তাব সম্বলিত একটা রূপরেখা জনসংহতি সমিতির কাছে পেশ করেন এবং এই প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করে। তবে জনসংহতি সমিতির ভাষ্যমতে, সরকার পক্ষ তাদের রূপরেখা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পক্ষ উক্ত রূপরেখার উপর আলোচনা করার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানালে, সরকার

www.pathagar.com

পক্ষ কর্তৃক পাঁচ দফা দাবীনামার উপর আলোচনায় অসম্মতি জানানোর অজুহাতে তারা উক্ত রূপরেখার উপর আলোচনা চালাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তাদের ভাষায়, "এই রূপরেখা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, অবাস্তব, স্ববিরোধী ও ত্রুটিপূর্ণ। এতে জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন সুষ্ঠু শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা নেই"। আবারো তাদের ভাষায়, "বস্তুতঃ এবারের বৈঠকও তীব্র বিতর্কের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত হয়"। তবে উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বৈঠক প্রত্যেকটি প্রায় এক মাসের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ পরবর্তী মাসে আর বৈঠকে ফিরে আসেননি। অন্যদিকে, জনসংহতি সমিতি বৈঠক থেকে ফিরে যাওয়ার পর পরই শান্তিবাহিনী খাগড়াছড়ি জেলার পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়ে শতাধিক নারী-পুরুষ এবং শিশুকে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহের প্রেক্ষাপটে জনসংহতি সমিতির বিবৃতি" নামে ২৮-৩-৮৮ ইং তারিখে একটা পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করে। উপরোক্ত বিবৃতিতে জনসংহতি সমিতি সরকারী রূপরেখাকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ এবং পাঁচ দফা দাবীনামা আদায়ের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অংগীকার ব্যক্ত করে।

জাতীয় কমিটির সাথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের আলোচনাঃ

সরকারী প্রতিনিধিদলের সাথে জনসংহতি সমিতির ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বৈঠক প্রতি একমাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির দীর্ঘসূত্রিতা এক পর্যায়ে আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গ্রুপ শান্তিবাহিনী পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন পুনর্বাসিত বাঙ্গালী গ্রামের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়, যাতে অনেক নিরীহ পুনর্বাসিত বাঙ্গালী প্রাণ হারায়। এই পরিস্থিতির কারণে পরবর্তী আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব ঘটে। এ অবস্থায় ১৯৮৮ সালের ৯ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। উক্ত আলোচনায় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় কমিটির কাছে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং সরকার পক্ষকে

www.pathagar.com

আলোচনার স্বার্থে নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানান। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় কমিটিকে এ নিশ্চয়তাও প্রদান করেন যে, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার জন্য সবধরণের প্রচেষ্টা তাঁদের পক্ষ থেকে চালানো হবে। এ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির সাথে ৫ম বৈঠকে বসতে সম্মত হন। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জনসংহতি সমিতি ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুন, চার মাস পর পুনরায় আলোচনার টেবিলে ফিরে আসে।

জনসংহতি সমিতি ও সরকার পক্ষের ৫ম বৈঠক এবং তৎপরবর্তী অবস্থাঃ

পঞ্চম বৈঠকে সরকারী প্রতিনিধি দলের কাছে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদাসহ স্বায়ত্বশাসন প্রদানের সরাসরি প্রস্তাব দেন। সরকারী প্রতিনিধি দল এ দাবীটি বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের পরিপন্থী বলে তা পরিবর্তন করার অনুরোধ জানান। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এতে তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে অপারগতা প্রকাশ করা হলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যতীত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন বলে মত প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত কোন সমঝোতা ছাড়াই বৈঠক ভেঙ্গে যায়।

জনসংহতি সমিতি এবং সরকার পক্ষের পঞ্চম বৈঠকও ফলপ্রসূ না হওয়ায় সরকার পক্ষ ভবিষ্যতে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সরকার পক্ষ পঞ্চম বৈঠকের পর জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ভেংগে গেছে বলে ধরে নেয়। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতিও আলোচনা চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন বলে পঞ্চম বৈঠকেই মত প্রকাশ করেছে।

এ পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে বলা হয় যে, যেহেতু প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রশ্ন আলোচনার সরকার পক্ষের কোন অবকাশ নেই, সেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বিকল্প সমাধানের লক্ষ্যে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের এগিয়ে আসা উচিত। কারণ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দই জনসংহতি সমিতির সাথে সরাসরি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ সরকারকে দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তিনটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য সরকারের কাছে এক মাস সময় চেয়ে নেন। এ সময় নেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন" এর দাবীকে কিছুটা নমনীয় করে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে অনেক কষ্টে অর্জিত আলোচনার সুযোগ সদ্ব্যবহার করার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে রাজী করানো।

এ লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৮৮ সালের ১০ই জুলাই যুক্ত স্বাক্ষরে জনসংহতি সমিতির কাছে এক পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে অনুরোধ করা হয় যে, সরকারের সাথে আলোচনায় বসার পূর্বে তারা যেন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে তাদের সাথে আলোচনায় বসার সুযোগ দেন। উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার বার বার অনুরোধ জানিয়ে বিফল মনোরথ হওয়ার পরও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ পুনরায় লিখিতভাবে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেছিলেন। এর অন্যতম কারণ ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তব অবস্থাকে জনসংহতি সমিতির কাছে তুলে ধরা। এমনকি উক্ত আলোচনায় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে জনসংহতি সমিতির কাছে গ্রহণযোগ্য নেতৃবৃন্দকে রাখার জন্যও চিঠিতে অনুরোধ করা হয়।

উপজাতীয় নেতাদের ভারতে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসমস্ত উপজাতীয়রা ভারতে আশ্রয় নিয়ে উপজাতীয় শরণার্থী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে তাঁদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের উপর বার বার চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে ভারতের উপজাতীয় শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তথায় প্রেরণে নীতিগতভাবে সম্মত হন। তৎ প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের ১১ও ১২ই জুলাই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব ফারুক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এ প্রতিনিধি দলে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ হাইকমিশনার নেতৃত্ব প্রদান করলেও উপজাতীয় নেতাদের নেতৃত্বে ছিলেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়। এ প্রতিনিধিদলের তিনটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রতিনিধিদলকে উপজাতীয় শরণার্থীদের সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনার সুযোগ না দিয়ে কিছু সংখ্যক শরণার্থী প্রতিনিধির সাথে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এ সমস্ত শরণার্থী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা কালে মনে হয় যে, তাদের উথাপিত দাবীদাওয়া যেন একই ব্যক্তি বা কতৃপক্ষ দ্বারা রচিত। উপরন্তু তাদের দাবীদাওয়াগুলো পরীক্ষা

www.pathagar.com

করে, প্রতিনিধিদলের সকলেই এক মত হন যে, এ সমস্ত দাবীদাওয়ার সাথে শান্তিবাহিনীর দাবীদাওয়া ও বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাদের দাবীদাওয়াগুলো ছিল সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। তাই প্রতিনিধিদলের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব ছিলনা। তাদের দাবীদাওয়া গুলো ছিল নিম্ন রূপঃ-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা, (৩) উপজাতীয় শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে আসার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষনের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদলসহ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল ও বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশ সফরের সুযোগ দেওয়া এবং (৪) তাদের বাংলাদেশে ফিরে এসে বসবাস করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেই নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। শরণার্থী প্রতিনিধিদের হাজারো বাধা সত্বেও প্রতিনিধিদল কিছু সংখ্যক সাধারণ উপজাতীয় শরণার্থীর সাথে আলাপ করার সুযোগ নেন এবং জানতে পারেন যে, তারা দেশে ফিরে আসতে আগ্রহী। তবে শরণার্থী নেতা নামধারী শান্তিবাহিনীর কিছু নেতা এবং কর্মীর বাধার কারণে তারা দেশে ফিরতে পারছে না। জনসংহতি সমিতি তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শরণার্থীদের জিম্মি হিসাবে বিদেশের মাটিতে আটকে রেখেছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

উপজাতীয় নেতাদের সাথে জাতীয় কমিটির সংলাপ

জাতীয় কমিটির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদানঃ

জনসংহতি সমিতির সাথে ভবিষ্যতে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় ১৯৮৮ সালের ২১ শে জুলাই রাঙ্গামাটি জেলার উপজাতীয় নেতাদের সাথে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি.ও.সি. জেনারেল সালাম জনসংহতি সমিতিকে বাদ দিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজাতীয় নেতাদের কাছে প্রস্তাব দেন। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের সাথে আলোচনায় বসার আগে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সালের ৩১শে জুলাই তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটিতে এক যুক্ত বৈঠকে মিলিত হন। বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, তিন জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সি, এবং জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য জেনারেল সালামকে তা লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত জানার পর জেনারেল সালাম ১৯৮৮ সালের ১০ই আগষ্ট রাঙ্গামাটি টাউন হলে উপজাতীয় ও অউপজাতীয়দের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি জাতীয় কমিটির সাথে তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষন করেন। তিনি জাতীয় কমিটির সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজাতীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় কমিটিকে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি আলোচকদল গঠন করা হয়। চাক্‌মা উপজাতীয় প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে রাঙ্গামাটি জেলা আলোচকদল গঠন করা হয়। তিনটি আলোচক দল শেষ পর্যন্ত জাতীয় কমিটির সাথে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা চালিয়ে যায়।

জাতীয় কমিটির সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের প্রস্তুতি হিসাবে ১৯৮৮ সালের ১১ই আগষ্ট চট্টগ্রাম সেনানিবাসে রাঙ্গামাটি জেলা আলোচকদল

www.pathagar.com

২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জি, ও, সি ও জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য জেনারেল আবদুস সালামের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়। জাতীয় কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে সরকার কর্তৃক জনসংহতি সমিতির কাছে পেশকৃত ৯টি প্রস্তাব সম্বলিত রূপরেখার উপর বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনা হয়। রাঙ্গামাটি জেলার আলোচকদল তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসিত বাঙালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবী জানান। পুনর্বাসিত বাঙালী প্রত্যাহারের দাবীর প্রশ্নে সিদ্ধান্ত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় বিষয়টি জাতীয় কমিটির কাছে উথাপন করার জন্য জেনারেল সালাম আলোচকদলকে অনুরোধ করেন। তবে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবীটি তিনি সরকারের নিকট পেশ করতে রাজী হন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, আঞ্চলিক পরিষদের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরী করা হবে।

জাতীয় কমিটির সাথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের আলোচনার প্রেক্ষাপটঃ

১৯৮৮ সালের ১০ই জুলাই তিন জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যৌথ স্বাক্ষরে জনসংহতি সমিতিকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার উত্তর আসে ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৮ সালে। এ চিঠিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ উপজাতীয় জনগণের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাদের (জনসংহতি সমিতির) দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন সম্পর্কে তিন জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রচুর উপদেশ খয়রাত এবং আন্দোলনের বিরোধী শক্তি হিসেবে তাদেরকে পরোক্ষভাবে হুমকি প্রদান করেন। সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির পুনরায় বৈঠকে বসার পূর্বে উপজাতীয় নেতাদের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব সম্পর্কে চিঠিতে বলা হয় যে, "জুম্ম জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সকল স্তরের জুম্মদের সাথে যোগাযোগ, মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে জনসংহতি সমিতি সবসময়ই সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।" তাদের চিঠির ভাষ্যমতে, তারা যেহেতু প্রতিনিয়তই জনগণের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছেন সেহেতু নতুন করে অন্য কোন পক্ষের সাথে যোগাযোগ করা বা বৈঠকে বসার প্রয়োজন তাদের নেই। কারণ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দও জনগণেরই অংশ। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির উপরোক্ত মনোভাব থেকে এ ধারনাই পরিষ্কার হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা ও তা সমাধানের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি অন্য কোন পক্ষের মতামত এবং পরামর্শ গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে রাজী নয়। অর্থাৎ জনসংহতি সমিতিই পার্বত্য অঞ্চলের একমাত্র ভাগ্য নিয়ন্তা।

জনসংহতি সমিতির জবাবে তাদের দাবীনামা সংশোধনের আভাস পাওয়া গেলেও পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যার সমাধানে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করায় তাঁরা অত্যন্ত হতাশ হন। উপজাতীয়দের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার আদায়ের নামে জনসংহতি সমিতি যে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কেই তখন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সন্দিহান হয়ে উঠেন। পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বদানে পরিপক্কতা, যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কেও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ১৯৮৮ সালের ১০ই জুলাই তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ যে চিঠি জনসংহতি সমিতির কাছে পাঠান তার পেছনে একটা পটভূমি এবং বেশ কিছু যুক্তি ছিল। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ একথা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, উপজাতীয় জনগনের ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক সচেতনতার সাথে ১৯৮৮ সালের রাজনৈতিক চেতনার অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। দীর্ঘ ১৩ বছরকাল সময়ে উপজাতীয় জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও সশস্ত্র আন্দোলনের ক্ষেত্র ও সময় সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মেছে। এই রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে একটি জাতিসত্বার বিকাশ ও অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও এর সঠিক প্রেক্ষিত এবং পর্যায় সম্পর্কেও উপজাতীয় জনগণের মধ্যে পরিষ্কার ধারনা সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে উপজাতীয় জনগণ শিক্ষা পেয়েছে যে, কোন একটি দেশের মানুষ/জনগোষ্ঠি কোন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমতঃ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সব পথ যখন রুদ্ধ হয়ে পড়ে ঠিক তখনই আন্দোলনকারীদের একাংশ সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলন ও আন্দোলনকারীরা সে পথ অনুসরণ না করে এক ভিন্নতর পথ অবলম্বন করে সমগ্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠির অস্তিত্বকে এক অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। ইতিহাস প্রমান করে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আলোকে প্রস্তুতকৃত দাবীনামা জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে দু'বার।

www.pathagar.com

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হন। ১৯৭৩ সালে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে দাবীনামা পেশ করেন।

পরবর্তীতে এ দু'দফা সাক্ষাৎকার সময়ে পেশকৃত দাবীনামা আদায়ের লক্ষ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জনসংহতি সমিতি গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নির্বাচনী জনসভার একটি উক্তিকে অপব্যাখ্যা করে ও সহজ সরল উপজাতীয় জনগণের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২টি আসনেই জনসংহতি সমিতির দু'জন প্রার্থীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করান। এ সুযোগে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে সংসদের ভিতরে ও বাইরে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রমান করে যে, পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাকশাল পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের আভাস পেয়েই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাকশালে যোগদান করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা গ্রেপ্তার হওয়ার আশংকায় তাঁর সংগঠন অর্থাৎ জনসংহতি সমিতির অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের নিয়ে আত্মগোপন করেন। তাঁর আত্মগোপনের পরবর্তী সময়ে অন্য কোন নিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন না করেই জনসংহতি সমিতি এর সশস্ত্র ক্যাডার শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আর কোন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের এই ১৩ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও পার্বত্যবাসীদের মধ্যে বেড়েছে শিক্ষিতের হার, গড়ে উঠেছে একটা বুদ্ধিজীবী সমাজ, বৃদ্ধি পেয়েছে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার। এ সময়ে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের জাতিসত্বার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের জন্য পৃথিবীর ইতিহাস অনুসরণে উৎসাহী হয়েছেন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলন ও তা প্রতিরোধকল্পে নিরাপত্তাবাহিনী কতৃক গৃহীত কার্যক্রমের শিকার হয়েছে নিরীহ উপজাতীয় সম্প্রদায়। পাশাপাশি সরকারীভাবে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন উপজাতীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে সম্পূর্ণই বিপর্যস্ত করে তুলছে।

www.pathagar.com

অবস্থার এরূপ বাস্তবতার নিরিখেই তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসংহতি সমিতিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে এনে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। শান্তিবাহিনীর আক্রমণ ও নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট উপজাতীয় জনগণের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলে। সে চিন্তা চেতনা থেকেই জনসংহতি সমিতিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করণ এবং আলোচনার টেবিলে বসানোর উদ্যোগ গ্রহণে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও জনসংহতি সমিতির অনমনীয় মনোভাব, উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তবতা এবং সর্বোপরি উপজাতীয় জনগণ ও নেতৃত্বের প্রতি জনসংহতি সমিতির সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী, এ সবকিছু উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে জাতীয় কমিটির সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেছে।

জাতীয় কমিটির সাথে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক পুনর্বাসিত বাঙালী প্রত্যাহার প্রশ্নঃ

১৯৮৮ সালের ২৯ শে আগষ্ট চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি জেলা আলোচক দলের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সরকারী রূপরেখার উপর আলোচনাকালে আলোচকদল আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবীর পাশাপাশি পুনর্বাসিত বাঙালী বিশেষতঃ ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সালে সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসিত বাঙালীদের পার্বত্যাঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবী পেশ করেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব, সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে জাতীয় কমিটি এই দাবী গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে। পুনর্বাসিত বাঙালীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সমস্যার বিকল্প সমাধান হিসাবে তাদেরকে পার্বত্য অঞ্চলের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবও আলোচকদলের অন্যতম সদস্য জনাব চারু বিকাশ চাক্‌মা জাতীয় কমিটির কাছে পেশ করেন। জাতীয় কমিটি চারু বিকাশ চাক্‌মার উপরোক্ত বিকল্প প্রস্তাবও গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। পুনর্বাসিত বাঙালীদের প্রত্যাহারের ব্যাপারে জাতীয় কমিটির বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার পরও আলোচকদল বৃহত্তর স্বার্থে সরকারী রূপরেখার উপর আলোচনা চালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক পরিষদঃ

১৯৮৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা আলোচকদলের মধ্যে দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। বৈঠকের শুরুতে আলোচকদল আঞ্চলিক পরিষদের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভংগী জানতে চান। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ২৯শে আগষ্টের পরে খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা আলোচকদলের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রস্তাবিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা আলোচকদল গ্রহণ করেনি। সুতরাং একটি মাত্র আলোচকদলের আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। জাতীয় কমিটির এই বক্তব্যের সমর্থনে খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা আলোচকদলের এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বৈঠকে পেশ করা হয়। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবী নিয়ে আর দর কষাকষি করা রাঙ্গামাটি আলোচকদলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আলোচকদলের কয়েকজন সদস্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবীর প্রশ্নে অটল থাকেন। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধান প্রশ্নে জাতীয় কমিটির সাথে দ্বিমত পোষণ করায় রাঙ্গামাটি জেলা আলোচকদলের নেতা রাজা দেবাশীষ রায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে যোগ দেননি। তার পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব শান্তিময় দেওয়ানকে দলনেতা মনোনীত করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদের বিকল্প সমাধান হিসাবে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি জেলাকে একটি বিশেষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতঃ জেলায় বসবাসকারী সকল উপজাতি এবং অউপজাতি জনগোষ্ঠির সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে তথায় একটি জেলা পরিষদ গঠন করার ও উক্ত জেলা পরিষদের উপর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষমতা অর্পনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সরকার পক্ষের উপরোক্ত প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর উপজাতীয় প্রতিনিধিদল (আলোচকদল) তা গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে উক্ত তারিখে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

তৃতীয় বৈঠকঃ

১৯৮৮ সালের ৫ই অক্টোবর চট্টগ্রাম সেনানিবাসে জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি জেলা আলোচকদলের মধ্যে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত

www.pathagar.com

বৈঠকে প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের কাঠামো, মোট সদস্য সংখ্যা, বিভিন্ন উপজাতি এবং অউপজাতীয়দের সদস্য সংখ্যা, পরিষদের কার্যাবলী ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। বৈঠকে প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তুত পূর্বক তা পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়।

চতুর্থ বৈঠকঃ

১৯৮৮ সালের ১৭ই ও ১৮ই অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি জেলা আলোচক দলের মধ্যে চতুর্থ ও চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রস্তাবিত জেলা পরিষদ আইনের খসড়া পেশ করে তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বিচারপতি জনাব আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী এর বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। দুইদিন যাবত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের (জেলা পরিষদ) খসড়া রাঙ্গামাটি জেলা আলোচকদল অনুমোদন করে। আলোচকদল পরদিন রাঙ্গামাটি ফিরে এসে জানতে পারে যে, জনসংহতি সমিতি পুনরায় সরকারের সাথে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দিয়েছে। জনসংহতি সমিতির পাঠানো ৬ষ্ট বৈঠকের এই প্রস্তাব সরকারের কাছে পৌছার পর সরকার তিন পার্বত্য জেলার আলোচকদলের কাছ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে এ বিষয়ে মতামত চান। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তিন পার্বত্য জেলার আলোচকদলই জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দেয়। কেননা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সর্বদাই এ ধারণা পোষণ করেছেন যে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সার্বিক সমাধানের লক্ষ্যে সকল স্তরের উপজাতীয় জনগণের বিশেষতঃ জনসংহতি সমিতির প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তাই যদিও সরকারের সাথে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ছিল অতীব কষ্টসাধ্য এবং প্রায় দুঃসাধ্য, উপজাতীয় নেতৃত্বের জন্য একটা বেশ স্পর্শকাতর বিষয়, তথাপি উপযুক্ত এবং সহনীয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্মতি সর্বসম্মতভাবে প্রদান করা হয়েছিল।

জনসংহতি সমিতি আলোচনায় ফিরে আসার অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে সরকার পক্ষ তিন পার্বত্য জেলার আলোচকদলের সম্মতিক্রমে পুনরায় বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সরকার তিন পার্বত্য জেলার আলোচকদলের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন স্থগিত রাখেন। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল অনুমোদনের জন্য তড়িঘড়ি করে সংসদে উত্তাপন করা হয়নি। এদিকে,

www.pathagar.com

তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার পরিষদ (খসড়া) আইনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করেন। তারা ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জনসংযোগ সফর করেন। ফলে বিলটি সংসদে পাশ হওয়ার আগেই পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হন এবং এতে মতামত প্রদানের সুযোগ লাভ করে।

উল্লেখ্য, জাতীয় কমিটি উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার পাশাপাশি অউপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথেও পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করেন।

সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতির ৬ষ্ঠ বৈঠকঃ

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ১৯৮৮ সালের ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি রেষ্ট হাউজে জনসংহতি সমিতি এবং সরকার পক্ষের মধ্যে ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জনসংহতি সমিতি সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীনামা সরকারী প্রতিনিধিদলের কাছে পেশ করে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের পূর্বের পাঁচদফা দাবীনামার প্রথম দাবী "প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের" পরিবর্তে "আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন" কথাটি জুড়ে দিয়েছেন মাত্র। বাকী সব দাবী ঠিক রেখেছেন। সরকার পক্ষ, তিন পার্বত্য জেলার নেতাদের সাথে ইতিপূর্বে সম্পাদিত স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন সংক্রান্ত সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাতে আপত্তি জানান। তারা তাদের দাবীনামার বাইরে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে রাজী হন নি। সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে জানান যে, তিন পার্বত্য জেলার নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারককে একেবারে পাশ কাটিয়ে জনসংহতি সমিতির সাথে নতুন কোন সমঝোতায় পৌঁছান সম্ভব নয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকার পক্ষের এই বক্তব্য গ্রহণ করতে সম্মত না হলে আলোচনা ভেংগে যায়।

উল্লেখ্য যে, ষষ্ট বৈঠকে সরকার পক্ষ ইতিমধ্যে তিন পার্বত্য জেলার আলোচকদলের সাথে সম্পাদিত চুক্তির রূপরেখাটি জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরে জনসংহতি সমিতির দাবীদাওয়া উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতার সাথে সংযোজন করার অথবা উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা জনসংহতি সমিতির

www.pathagar.com

দাবীদাওয়ার সাথে সংযোজন করে একটি নতুন দাবীনামা পেশ করার আহ্বান জানান। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে অত্যন্ত অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে সরকার পক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূলতঃ ৬ষ্ঠ বৈঠক এভাবেই কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আলোচকদলের নেতা জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ পরবর্তী ৪ সপ্তাহের মধ্যে সরকারী প্রতিনিধিদল কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে সম্মত হন। সরকার পক্ষ ৪ সপ্তাহের সাথে আরো ২ সপ্তাহ যোগ করে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর আহ্বান জানান। জনসংহতি সমিতি এবং সরকার পক্ষের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা আলোচকদলের নেতা শান্তিময় দেওয়ান ২১শে ডিসেম্বর আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২৩শে ডিসেম্বর মারা যান। এই হত্যার জন্য জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হয়েছে, যা তারা আজ পর্য্যন্ত অস্বীকার করেনি।

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত সময়সীমা অনুসারে ১৯৮৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী অথবা ১লা ফেব্রুয়ারী সরকারের সাথে তাদের ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই বৈঠকের দিন, তারিখ ও জনসংহতি সমিতিই সরকার পক্ষকে জানানোর কথা। কিন্তু ৬ষ্ঠ বৈঠকের পর ৫ম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জনসংহতি সমিতি বৈঠকের তারিখ না জানানোর কারণে বৈঠকের সুনির্দিষ্ট তারিখ চেয়ে যোগাযোগ কমিটি ২০শে জানুয়ারী জনসংহতি সমিতির কাছে চিঠি লিখে। ১০ই ফেব্রুয়ারী লেখা এক চিঠিতে জনসংহতি সমিতি ২২শে ফেব্রুয়ারী সরকার পক্ষের সাথে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেয়। তবে জনসংহতি সমিতি কিছু নতুন শর্ত যোগ করে। কিন্তু সরকার পক্ষ আলোচনা বৈঠকের জন্য কোন নতুন শর্ত মেনে নিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। জনসংহতি সমিতির নতুন শর্ত গ্রহনে অসম্মতির কথা সরকার পক্ষ যোগাযোগ কমিটিকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দেয়। যোগাযোগ কমিটি যথাসময়ে সরকার পক্ষের মনোভাব জনসংহতি সমিতিকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়।

এদিকে ১৯৮৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়। অথচ স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সরকার পক্ষ থেকে সংসদে উথাপন করা হচ্ছিল না। এতে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের

www.pathagar.com

মনে সন্দেহ এবং সংশয় দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে তিন পার্বত্য জেলার তিনটি আলোচকদলের সদস্যবৃন্দ এবং তিন জেলার সকল উপজেলা চেয়ারম্যানদের এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জনসংহতি সমিতির সাথে নির্ধারিত সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার ১৪ দিন পরও স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে উথাপন না করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত সকল উপজাতীয় নেতা জনসংহতি সমিতির সাথে পুনরায় বৈঠকে বসার অপেক্ষায় না থেকে সহসা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিলসমূহ সংসদে উত্তাপনের জোর দাবী জানান। উক্ত বৈঠকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘোষণা" নামে একটা ঘোষণা পত্র প্রস্তুত ও প্রচার করা হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকের ঘোষণার প্রেক্ষিতে ঐদিন সন্ধ্যায় সরকার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল, ১৯৮৯, ও পার্বত্য জেলা সমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) বিল ১৯৮৯ সংসদে উথাপন করে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ৮৯, শেষোক্ত বিল এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ৮৯ বাকী তিনটি বিল সংসদে পাশ হয়।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিলগুলি যাতে সংসদে উথাপন এবং পাশ না করা হয় তজ্জন্য জনসংহতি সমিতি ৬ষ্ঠ বৈঠকের দেড়মাস পরে ৭ম বৈঠকে বসার টোপ সরকারকে দেয়। জনসংহতি সমিতি যখন ৭ম বৈঠকে বসার দিন তারিখ জানাতে বিলম্ব করে তখনই তাদের কালক্ষেপনের কৌশল সরকার ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন। জনসংহতি সমিতির এই কৌশল স্পষ্ট হওয়ার পরই উপরোক্ত বিলগুলি সংসদে উথাপনের ব্যবস্থা করা হয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন বৈঠকের টোপ দিয়ে যদি বিলগুলি উথাপন চলতি অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে সেগুলি আর উথাপন করার সুযোগ নাও আসতে পারে। কারণ বিরোধীদলগুলির আন্দোলনের মুখে সরকার যে কোন সময় সংসদ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হতে পারে। অন্ততঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পর্যন্ত বিলগুলি ঠেকাতে পারলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে তারা মনে করেছিলেন।

জনসংহতি সমিতি ২০শে ফেব্রুয়ারী যোগাযোগ কমিটির চিঠির জবাব দেয়, যাতে ৭ম বৈঠকে বসার অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বে স্থানীয় সরকার পরিষদ বিলসমূহ সংসদে উথাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ৭ম বৈঠক বর্জন করা হয়েছে বলে তাদের চিঠিতে জানান হয়। বস্তুতপক্ষে, স্থানীয় সরকার পরিষদ বিলসমূহ সংসদে উথাপন থেকে সরকারকে বিরত রাখার তাদের কৌশল ব্যর্থ হওয়ার পরই জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে আলোচনা ভেঙ্গে দেয়। অথচ ১৯৮৮ সালের ১৮ই অক্টোবর এবং তৎপরবর্তীকালে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার আলোচকদল কর্তৃক স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের খসড়া অনুমোদিত হওয়ার প্রায় দুই মাস পরেও জনসংহতি সমিতি ১৯৮৮ সালের ১৪ই এবং ১৫ই ডিসেম্বর সরকারের সাথে ৬ষ্ঠ বৈঠকে বসেছিল। স্থানীয় সরকার পরিষদ বিলগুলি সংসদে উথাপনে বিলম্ব ঘটানোর কৌশল হিসাবেই জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে ৬ষ্ঠ বৈঠকে বসেছিল এবং ৭ম বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেয়।

কালক্ষেপনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে উথাপন, পাশ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকারকে বিরত রাখার সকল কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং সেগুলি সকল বাধা সামলে নিয়ে বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসারে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পরিষদ আইনের ২২নং অনুচ্ছেদে প্রায় সকল প্রধান প্রধান সরকারী সংস্থা এবং বিভাগ মিলে ২২টি বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব পরিষদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদ আইনের ২৪নং অনুচ্ছেদ বলে চেয়ারম্যানের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন জমি ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলের সকল প্রকার জমি বন্দোবস্ত এবং হস্তান্তরের চূড়ান্ত আদেশ দানের ক্ষমতা ৬৪ নং অনুচ্ছেদ বলে পরিষদের কাছে অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া হাট-বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল পরিষদের পরিচালনাধীন সকল বিষয়ের উপর প্রবিধান প্রনয়নের ক্ষমতা।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (১) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, (২) প্রাথমিক শিক্ষা এবং (৩) কৃষি সম্প্রসারণ

www.pathagar.com

বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে সরকার ন্যস্ত করেছেন। এসব সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা জাতীয় সরকার বহন করেন। তবে এসব সংস্থার কর্মকর্তাগণ ব্যতীত সকল কর্মচারী এখন থেকে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিই নিয়োগ করবে। প্রাথমিকভাবে তিনটি বিষয় হস্তান্তরের প্রায় আড়াই বছর পর ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে (১) সমাজ সেবা অধিদপ্তর, (২) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, (৩) জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, (৪) সমবায় অধিদপ্তর, (৫) মৎস্য ও পশুপালন এবং (৬) ক্রীড়া হস্তান্তর করা হয়েছে।

উপজাতীয় পুনর্বাসনে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির ভূমিকাঃ

১৯৮৯ সালের ২৫ শে জুন অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি নির্বাচনের এক সপ্তাহ থেকে ১৫ দিন পূর্বে বাড়ীঘর ছেড়ে ভারতের মিজোরাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যাওয়ার জন্য উপজাতীয় জনগণের প্রতি নির্দেশ দেয়। এমনকি তারা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ২০/২৫ মাইল অভ্যন্তরে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণকে জোরপূর্বক তাদের নিজেদের বাড়ীঘর থেকে তাড়িয়ে ত্রিপুরা এবং মিজোরামে নিয়ে যায়। যাদেরকে সীমান্তের অপর পাড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি জনসংহতি সমিতি তাদেরকে সীমান্তের কাছে এপারে আটক করে রেখে দেয়।

১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লংগদু উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুর রশীদ সরকারকে হত্যার বদলাস্বরূপ পুনর্বাসিত বাঙালীরা লংগদু উপজেলায় বসবাসকারী প্রায় সব উপজাতীয় গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। এতে এই উপজেলায় বসবাসকারী এক হাজার উপজাতীয় পরিবার গৃহহারা ও বাস্তুচ্যুত হয়।

স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে শান্তিবাহিনী যেসব উপজাতীয় পরিবারকে ভারতের মিজোরামে নিয়ে যায় এবং যাদেরকে সীমান্তের এপারে আটকে রাখে তারা নির্বাচনের পর পরই শান্তিবাহিনীর বেষ্টনী থেকে পালিয়ে নিজ উপজেলা সদরে চলে আসে। এরা সবাই জুরাছড়ি উপজেলার বাসিন্দা। শান্তিবাহিনী দ্বারা ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত জুরাছড়ি উপজেলার কিছু পরিবার বিলাইছড়ি উপজেলা সদরে আশ্রয় নেয়। এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জুরাছড়ি এবং বিলাইছড়ি উপজেলা সদরে আশ্রয় গ্রহণকারী উপজাতীয় পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪০১ এবং ৩২৫।

www.pathagar.com

১৯৮৮ সালের বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন নব খাগড়াছড়ি এবং এর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফলে পালিয়ে যাওয়া উপজাতীয় পরিবারগুলি ১৯৯০ সালের শুরুতে তাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসতে শুরু করে। এসব গ্রামসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রত্যাবর্তনকারী পরিবারের সর্বশেষ সংখ্যা ১ হাজার। তাই ১৯৮৯ ইং সালে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে লংগদু, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি এবং বরকল উপজেলার ৪ হাজার উপজাতীয় পরিবার ভরণপোষণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। অনেক দেন দরবার করার পর এসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসনের জন্য কিস্তিতে নগদ অর্থ এবং খাদ্য শস্য বরাদ্ধ পাওয়া যায়। ভরণপোষণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, যদিও তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন আজও সম্ভব হয়নি। সরকারের কাছ থেকে ভরণপোষণের জন্য অনিয়মিতভাবে খাদ্যশস্য পাওয়া গেলেও তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী এবং আয়বর্ধক প্রকল্প হাতে নেওয়ার মত যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। আর এত বিপুল সংখ্যক পরিবার সুষ্ঠ পুনর্বাসনের সংগতিও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নেই। কারণ এই পরিষদ রাজস্ব এবং উন্নয়নসহ যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ের জন্য জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে এই ৪ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয় পরিবারগুলির ভাগ্য অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের বিরোধীতাঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনের তথা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধীতা করে "পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি" নামে ১৯৮৯ সালের ১লা মে জনসংহতি সমিতি ১৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এর আগে ১৯৮৮ সালের ১৯শে নভেম্বর "বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নয়দফা রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি" নামে অপর একটি পুস্তিকায় স্থানীয় সরকার পরিষদ খসড়া আইনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে এই আইনের বিরুদ্ধে সমিতির আপত্তির কারণ তুলে ধরে। দ্বিতীয় পুস্তিকার বক্তব্য মতে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি হলঃ (১) এই আইনে পার্বত্য অঞ্চলে বেআইনীভাবে বসতিস্থাপনকারী বাঙালীদের অত্র অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, (২) জনসংহতি সমিতির ভাষায় "জুম্মজনগণকে" তিনটি জেলায় ভাগ করে

www.pathagar.com

তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয়েছে," (৩) পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসনের উপর পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়া হয়নি, (৪) সামন্ততান্ত্রিক দুর্বল নেতৃত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ইত্যাদি।

জনসংহতি সমিতির প্রথমোক্ত পুস্তিকার ভাষ্য মতে "যেহেতু জেলা পরিষদ কার্যতঃ সরকারী আমলাদের নিয়ন্ত্রনে থাকতে বাধ্য হবে, সেহেতু পরিষদের সদস্যগণ সরকারী যে কোন কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে সমর্থন জ্ঞাপন করতে বাধ্য হবেন। কাজেই পার্বত্য জেলা পরিষদে জুম্ম জনগণের দুই তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকলেও মূলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ জুম্ম জনগণের কোন স্বার্থ ধরে রাখতে পারবেনা।" জনসংহতি সমিতির মতে "পার্বত্য জেলা নামক স্বায়ত্বশাসন বাংলাদেশ সরকারের একটা ষড়যন্ত্র এবং ৪ লক্ষাধিক বেআইনী অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করানোর হীন উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয়।"

উপরোক্ত দৃষ্টিভংগী থেকেই ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি শুধু জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি, নির্বাচনের ১৫ দিন পূর্বে উপজাতীয়দেরকে জোরপূর্বক তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এমনকি কয়েক হাজার উপজাতীয়কে ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ঠেলে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি। এই কয়েক হাজার উপজাতীয়কে ভারতে নিয়েই জনসংহতি সমিতি দাবী করছে যে, স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে উপজাতীয় জনগণ ভোট দিতে যায়নি। ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি।

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান ও সাধারণ নির্বাচনকালে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতিঃ

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে গণঅভ্যুত্থানের পর পরই ঢাকা ও চট্টগ্রামে অধ্যয়নরত পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীরা "পাহাড়ী ছাত্র ঐক্য পরিষদের" পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবীতে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটা অংশের কাছ থেকে তারা তাদের দাবীর সমর্থনে একটা বিবৃতিও আদায় করে নেয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ পার্বত্য অঞ্চলের ভোটার তালিকা সংশোধন, উপজাতীয় শরণার্থীদের ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলার সংসদ নির্বাচন স্থগিত রাখার

www.pathagar.com

দাবী জানান। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিল করার দাবীর প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ রাঙ্গামাটি সফরে আসেন এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিল করা হবে না বলে ঘোষণা দেন। তাঁর উপরোক্ত ঘোষণার পরও পাহাড়ী গণ পরিষদ নামে আরো একটা সংগঠন চট্টগ্রামে একটা সাংবাদিক সম্মেলন এবং বিক্ষোভ মিছিল করে স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবী জানায়। এছাড়া পাহাড়ী পেশাজীবি সংগঠনের নামে আরও একটি সংগঠনও স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবীতে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদ বিরোধীরা কারা?

জনসংহতি সমিতির বাইরে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র ঐক্য পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ এবং পাহাড়ী পেশাজীবি পরিষদ নামে কয়েকটা সংগঠন স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিল করতঃ পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে একটা সংসদীয় কমিটি গঠন করার দাবী জানিয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, সাবেক লুসাই পাহাড়ের লুসাইরা তথাকার অধিবাসী লুসাই, লাখের, পই, রান্টে, পইথে এবং অন্যান্য উপজাতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের সবাইকে মিজো (পাহাড়ের বাসিন্দা) জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। তেমনি জনসংহতি সমিতিও পার্বত্য অঞ্চলের বসবাসকারী সকল উপজাতীয়দের এক নাম 'জুম্ম জাতিতে" রূপান্তরিত করেছে। জনসংহতি সমিতির বাইরে যারা স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবী জানাচ্ছে তারা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ এবং পাহাড়ী পেশাজীবি পরিষদ নাম দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠিকে "পাহাড়ি জাতি" হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, উল্লিখিত সংগঠনগুলি জনসংহতি সমিতির "জুম্ম" জাতিকে "পাহাড়ী জাতিতে" রূপান্তরিত করে জনসংহতি সমিতির সাথে তাদের আঁতাতকে আড়াল করার কৌশল অবলম্বন করেছে। "জুম্ম জাতিকে" "পাহাড়ী জাতির" মোড়কে আবৃত করে সেই "জুম্ম জাতির" অধিকার আদায়ের নামেই উপরোক্ত সংগঠনগুলি রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

স্থানীয় সরকার পরিষদঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগে

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯নং আইন) অনুসারে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। পরিষদ আইনের ২২ নং অনুচ্ছেদ বলে প্রায় সকল প্রধান প্রধান এবং ছোট-খাট সরকারী সংস্থা/ বিভাগ মিলে মোট ২২টি বিষয় এবং সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পরিষদের কাছে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদ আইনের ২৪ নং অনুচ্ছেদ বলে চেয়ারম্যানের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন জমি এবং সংরক্ষিত বণাঞ্চল ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের সব জমি বন্দোবস্ত এবং হস্তান্তরের চূড়ান্ত অনুমোদন দানের ক্ষমতা আইনের ৬৪ নং অনুচ্ছেদ বলে পরিষদের কাছে অর্পন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল, পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি ছাড়াও পরিষদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সংস্থার কর্মকান্ড ও পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি বিষয়ে প্রবিধান প্রনয়নের ক্ষমতা পরিষদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাবে এমন সব পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের শৃংখলা বিধি প্রনয়নের ক্ষমতাও পরিষদের কাছে অর্পন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন বা উক্ত আইন বলে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদের বেশ কিছু দিক রয়েছে যেগুলি স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার দুর্বল দিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণ হিসাবে পরিষদের আয়ের উৎসের কথা বলা যেতে পারে। হাট-বাজার, টোল ষ্টেশন নীলাম লব্ধ আয় ব্যতীত পরিষদের নিজস্ব আয়ের কোন উৎস নেই। পরিষদের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় এবং হচ্ছে। এমনকি রাজস্ব বাজেটের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যও জাতীয় সরকারের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। তাই পরিষদ কোন কারণে সরকারের বিরাগভাজন হলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে পরিষদের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সকল উন্নয়নশীল দেশে এই ধরণের স্বায়ত্বশাসিত এলাকার কর্তৃপক্ষ এর যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজনের জন্য জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ এমনকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি এর কোন ব্যতিক্রম নয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির উপর নিয়ন্ত্রনঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসারে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির সবচেয়ে দুর্বল দিক হল অত্র অঞ্চলের বিদ্যমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অনুপস্থিতি। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীন বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগ দ্বারা। অন্যদিকে, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় দ্বারা। জেলায় বিদ্যমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি ভিন্ন একটি মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিধায় এইসব কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিকে ডিঙ্গিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের প্রথম তফসীলের (পরিষদের কার্যাবলী) ২নং ক্রমিকে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, সেগুলির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, হিসাব নিরীক্ষন, সেগুলিকে সহায়তা সহযোগিতা ও উৎসাহদান করবে। উপজেলা পরিষদগুলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনঃ বিন্যাস) অধ্যাদেশ (১৯৮২ সালের ৩৯ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা যা বাংলাদেশের সব উপজেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটা অধ্যাদেশ। অথচ, ১৯৮৯ সালে স্বতন্ত্র আইন বলে পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় সরকার পরিষদ তথা স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনঃবিন্যাস) অধ্যাদেশ পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে আর বলবৎ থাকার কথা নয়। পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে অর্থবহ এবং শক্তিশালী করার স্বার্থে উপরোক্ত অধ্যাদেশসমূহ সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাস্তবে তা করা হয়নি। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ আজও স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উপজেলা পরিষদগুলি জেলা পরিষদ তথা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে জবাবদিহি করতে

www.pathagar.com

বাধ্য নয়। উপজেলা পরিষদগুলি নিজ নিজ এলাকার পরিসরে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছে।

স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার পরিষদের (জেলা পরিষদ) এখতিয়ারাধীন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে স্বতন্ত্র এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বকীয়তা এবং ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে খর্ব করছে। পার্বত্য অঞ্চলের সুশাসন ব্যবস্থাকে অর্থবহ করতে এবং এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির উপরোক্ত ত্রুটি এবং দুর্বল দিকগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে। স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধনক্রমে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির উল্লিখিত ত্রুটি এবং দুর্বল দিকসমূহ দূর করা যেতে পারে। এসব ত্রুটি এবং দুর্বল দিকগুলি দূর করার জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি থেকে ইতিমধ্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয়। ("থানা পরিষদ এবং থানা প্রসাশন পুনর্বিন্যাস অধ্যাদেশ" ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে)

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণ বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজ মনে করতেন যে, উপজাতীয় জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বৃটিশ সরকার ১৯০০ সালের জুন মাসে (৬ই জুন) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রণয়ণ ও প্রবর্তণ করেছিলেন। তাই এটা উপজাতীয় জনগণের রক্ষাকবচ। এই শাসনবিধি প্রবর্তিত হওয়ার ৯০ বছর পরও উপজাতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশেষতঃ রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে তা বলবৎ রাখার দাবী জানাচ্ছেন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অতীতে উপজাতীয় জনগণের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা করেছে, বর্তমানে কতটুকু রক্ষা করছে এবং আদৌ রক্ষা করতে সক্ষম কিনা তা বুঝার জন্য এই শাসনবিধির বিচার বিশ্লেষণ এখন একটা জরুরী প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ (Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900) এর উপর নীচে কিছু আলোকপাত করা হলঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ এর মোট পাঁচ অধ্যায়ে ২০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩ নং ও ৪ নং অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন

www.pathagar.com

সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং কোন কোন আইন বাতিল করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ নং থেকে ১০ নং অনুচ্ছেদে কর্মকর্তা নিয়োগ তাদের ক্ষমতা, বিশেষতঃ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ১১ নং থেকে ১৫ নং অনুচ্ছেদে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে বিধিব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের ১৬ নং থেকে ২০ নং অনুচ্ছেদে পুলিশ প্রশাসন, মামলার আপীল নিষ্পত্তি, বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা, উকিল নিয়োগে বিধিনিষেধ এবং দেশে তৎকালে প্রচলিত কোন কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় রহিত করা হয়েছে।

মূল আইনের ১৮ নং অনুচ্ছেদে এই আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে সরকারকে বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৮ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলবৎ হওয়ার পর পরই তদানীন্তন বাংলার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকাজ চালানোর জন্য মোট ৫৪টি বিধি সম্বলিত একটা বিধিমালা প্রণয়ণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ ইং মূল আইন এবং উক্ত আইনের ক্ষমতা বলে প্রণীত বিধিমালাকে একত্রে সাধারণভাবে Hill Tracts Manual বলা হত এবং এ নামেই আইনটি সমধিক পরিচিত।

বিধিমালার ১ নং থেকে ১১ নং বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার পদ্ধতি ও ১২ নং থেকে ৩৩ নং বিধিতে দলিলাদি রেজিষ্ট্রেশান, ৩৪ নং বিধি জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর পদ্ধতি, জুম চাষ নিয়ন্ত্রন, ৩৫ নং থেকে ৪১ নং বিধি সার্কেল, মৌজা বিভাগ, মৌজা হেডম্যান নিয়োগ পদ্ধতি, মৌজা ও উপজাতি প্রধানদের বিচার ক্ষমতা, ৪২ নং বিধি জুমকর, ৪৩ নং বিধি জুম কর আদায়, ৪৫ নং বিধি শন, গর্জণ খোলা ইত্যাদির কর আদায়, ৪৬ নং বিধি মৌজা হেডম্যানদের ভাতা, ৪৭ নং বিধি উপজাতি প্রধানদের খাস মৌজা রাখা, ৪৮ নং বিধি মৌজা হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্ত ইত্যাদি এবং ৫০ নং থেকে ৫৪ নং কতিপয় বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।

মূল আইনের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনসমূহ এবং কোন আইনের কতটুকু প্রযোজ্য হবে, তার একটা তালিকা তৈরী করা হয়েছে। এতে, কোর্ট ফি, ষ্টাম্প ডিউটি, আয়কর, শুল্ক ইত্যাদি প্রদান করা থেকে পার্বত্য অঞ্চলের আদি পাহাড়ী বাসিন্দাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

২। ফৌজদারী, দেওয়ানী, রাজস্ব মামলা বিচার নিষ্পত্তি করার ও সাধারণ উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা জেলা গঠন করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনারকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট করা হয়েছে এবং আইনের ৬নং অনুচ্ছেদ বলে ফৌজদারী, দেওয়ানী, রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ বলে ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার, তৎকালীন সি এন্ড বি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং জেলা রেজিষ্ট্রার এর ক্ষমতা ভোগ করেন।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা দায়রা বিভাগ করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারকে দায়রা জজ করা হয়েছে।

৪। ফৌজদারী কার্যবিধি বলে মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য বাংলার সরকারের উপর হাইকোর্টের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে অন্যান্য মামলা বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারে কমিশনারের উপর হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৫। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকে প্রদান করা হয়েছে।

৬। মাদকদ্রব্য ব্যবহার উৎপাদনের পারমিট প্রদান ও বিদেশী মাদকদ্রব্য আমদানী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকে প্রদান করা হয়েছে।

৭। (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল কর্মকর্তাকে ডেপুটি কমিশনারের অধস্তন কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য করা হবে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাব-ডেপুটি কালেক্টারসহ সকল কর্মকর্তার আদেশ পুনর্বিবেচনা ক্রমে সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকে ৬নং অনুচ্ছেদ বলে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ পুনর্বিবেচনা পূর্বক সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনারকে প্রদান করা হয়েছে।

(গ) পার্বত্য চট্টগাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর বলে প্রদত্ত যে কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা পূর্বক সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা বাংলার সরকারের উপর অর্পণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৮। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ অথবা তদ্ধারা প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

বিধিসমূহের বৈশিষ্ট্যঃ

১। দেওয়ানী মামলার বিচার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকে প্রদান করা হয়েছে। দেওয়ানী মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসরণ করার কথা বলা হলেও ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ রাখা হয়েছে। (বিধি সমূহের ১ নং থেকে ১১ নং পর্যন্ত দেওয়ানী মামলা বিচার সংক্রান্ত)।

২। ২০ নং বিধি বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা প্রশাসকগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত যেকোন কর্মকর্তাকে সাব রেজিষ্টার নিয়োগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত বহু কর্মকর্তাকে যথা সিনিয়র সাব-ডেপুটি কালেক্টর, জুনিয়র সাব-ডেপুটি কালেক্টর, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে (বাংলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ৭৫৬৯ ই এ তাং ৩০/৫/২৭ এবং একই বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ৯৬১টি-আর তাং ৮/৯/৩০ ইং) সাব-রেজিষ্টার নিযুক্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ রেজিষ্টারিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ যাবতীয় দলিলাদির রেজিষ্টারীং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। (১২ নং বিধি থেকে ৩৩ নং বিধি দলিলাদি রেজিষ্টারীকরণ সংক্রান্ত)।

৩। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা যা, ৩৪ নং বিধি বলে ডেপুটি কমিশনারের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এই বিধিতে অন্য জেলার লোককে জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পরবর্তীকালে এই বিধি সংশোধন করে যথেষ্ট শিথিল করা হয়। দীর্ঘদিন যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই বিধি নিষেধ শিথিল করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ১৫ বছর বসবাসরত ভূমিহীন বহিরাগত লোকদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হয়। এই সংশোধনীর

www.pathagar.com

সুযোগ গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫ বছর বসবাস না করে ও অনেক বহিরাগত ব্যবসায়ী এমনকি চাকুরীজীবি স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট নেন এবং সেই সুবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভ করেন। ৩৪ নং বিধির এই সংশোধনী বহিরাগত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভের পথ সুগম করে দেয়। প্রধানত এই সংশোধনীর পর থেকেই বহিরাগত বাঙ্গালী বিশেষতঃ ব্যবসায়ীরা ব্যাপক হারে জমি কিনতে এবং বন্দোবস্ত নিতে থাকে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙ্গালীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়।

বহিরাগত লোকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভ করার ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংশোধনীতে যে বিধিনিষেধ রাখা হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ৩১ শে মার্চের সংশোধনী বলে তা প্রত্যাহার করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভের জন্য মৌজা হেডম্যান থেকে ইতিপূর্বে স্থায়ী বাসিন্দার যে সার্টিফিকেট প্রয়োজন হত ১৯৭৯ সালের উপরোক্ত সংশোধনী বলে তা আর প্রয়োজন হয় না। মূলতঃ অন্য জেলার লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করার জন্যই বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের ৩৪ নং বিধির এরূপ সংশোধন করেছিলেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৩৪ নং বিধিতে আরোপিত বিধি নিষেধ তুলে নিয়েই ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ লক্ষাধিক বাঙ্গালী পুনর্বাসন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লংঘন করে নয়, বরং আইনের বিধি নিষেধকে তুলে দিয়েই এই ২ লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙ্গালীকে তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ১৮ নং অনুচ্ছেদে এই আইনের যে কোন অংশ সংশোধন করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। সরকারের বা মহল বিশেষের স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকার এই আইনের যে কোন অংশ সংশোধন করার আইনগত ক্ষমতা রাখে। যদি ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলবৎ রাখা হয়, তাহলে তা সংশোধন করার ক্ষমতা ও সরকারের কাছে বহাল থাকবে। সরকারের এই সংশোধনী ক্ষমতা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা স্থানীয় জনগণের হাতে দেওয়া হয়নি। সুতরাং আইনের সংশোধনী সরকার সবসময় এলাকার আদিবাসিন্দাদের স্বার্থে করবেন–এই নিশ্চয়তা নেই। অতীতের অভিজ্ঞতাই প্রমান করে যে, প্রায় সব সংশোধনীই পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসিন্দাদের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে বার বার ক্ষুন্নই করেছে।

www.pathagar.com

৩৫ নং বিধি বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিন উপজাতি প্রধানের ৩টি সার্কেল, সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং মাইনী ভেলী-এই কটি বিভাগে ভাগ করা হয়। ১৯২৬ সালের ১৭ই জুনের সংশোধনী মূলে মাইনী ভেলী বিভাগ বাদ দেওয়া হয়। ৩৭ নং বিধি বলে গোটা জেলাকে বেশ কয়েকটা মৌজায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক মৌজায় একজন করে হেডম্যান নিযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

৩৮ নং বিধি বলে ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য তিন সার্কেল প্রধানের সমন্বয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের কাজ হল নিজ নিজ সার্কেলের শাসনকাজে ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করা এবং নিজ নিজ সার্কেলের অধীন মৌজা সমূহে ডেপুটি কমিশনারের যাবতীয় আদেশ কার্যকরী করা। সার্কেল প্রধানদের দায়িত্ব হল নিজ নিজ সার্কেলের অধীন মৌজায় হেডম্যানদের মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

উক্ত একই বিধিবলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলকে নিয়ে তিনটি মহকুমা যথা রাঙ্গামাটি, রামগড় এবং বান্দরবান মহকুমায় বিভক্ত করা হয়।

৪০ নং বিধি বলে সার্কেল প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষতঃ নিজ নিজ সামাজিক প্রথা অনুসারে সামাজিক বিরোধসমূহ বিচার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত বিধি বলে সার্কেল প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদেরকে কিছু কিছু ফৌজদারী অপরাধ বিচারের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে।

৪১ থেকে ৪৬ নং বিধিতে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ, জুম খাজনা নির্ধারণ, আদায় পদ্ধতি, জুম খাজনা আদায়ে সার্কেল প্রধান মৌজা প্রধানদের ক্ষমতা, তাদের ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪৮ নং বিধিতে সার্কেল প্রধানদের অভিষেক এবং মৌজা হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্তের নিয়ম ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫০ নং বিধিতে বন্দোবস্ত ছাড়া ৩০ শতাংশ জমি বাস্তভিটা হিসাবে দখল করার অধিকার উপজাতীয়দের প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির অবস্থানকে যদি বিপদজনক মনে করেন, তাহলে ডেপুটি কমিশনার ৫১ নং বিধি বলে

www.pathagar.com

তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এই জেলা থেকে বহিস্কার করতে পারেন। উপজাতীয় জনগণ মনে করে যে, এই বিধি বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য জেলার লোক বসতি স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছে। অন্য জেলার লোক বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে এই আইনগত বাধা তৎকালীন পাকিস্তানের সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হওয়ার পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট ১৯৬৫ সালে উক্ত বিধিকে বেআইনী ঘোষণা করেন।

৫২ নং বিধিতে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, লুসাই ইত্যাদি উপজাতীয় বংশোদভূত লোক ছাড়া অন্য জেলার লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ১৯৩০ সালে এই বিধি বাতিল করা হয়। অবশিষ্ট বিধিগুলিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই বলে আলোচনা করা হল না।

উপরের আলোচনা থেকে হয়ত এটা পরিস্কার হয়েছে যে, তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করার ক্ষেত্রে মূল আইনে কিছু বিধি নিষেধ রাখা হলেও সরকারের উপর প্রদত্ত সংশোধনী ক্ষমতা বলে সেগুলি পরবর্তীকালে শিথিল এবং শেষ পর্যন্ত বাতিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বলে জেলার শাসনকাজ পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারের উপর অর্পণ করা হয়েছে। উপজাতীয় বা সার্কেল প্রধানদের দ্বারা গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষমতা জেলার শাসনকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত।

ভারত উপমহাদেশে প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার সূচনাঃ

১৯০৯ সালের মিন্টো-মর্লি সংস্কার পরিকল্পনা অনুসারে প্রণীত ১৯০৯ সালের আইনে বৃটিশ সরকার সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচনের নীতি মেনে নেন। তবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আইনসভাসমূহে নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখেন।

এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এতে আইনসভাসমূহের গঠনপ্রণালী এবং কাজের পরিবর্তন সূচনা করেছে। এই আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৮ জনের অধিক সরকারী হবেন না। প্রাদেশিক আইনসভায় অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা বৃহৎ প্রদেশগুলিতে সর্বোচ্চ ৫০ করা হয়েছে। এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, সরকারী এবং মনোনীত বেসরকারী

www.pathagar.com

সদস্য সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা থেকে সামান্য বেশী হবে। তবে বাংলার ক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়।

১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনামতে প্রণীত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করে এটাকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। আইনসভার উভয় কক্ষের নির্বাচন প্রত্যক্ষ এবং ভোটাধিকার সম্পত্তি ভিত্তিক করা হয়। এই আইনে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ন্যায় রেগুলেশান প্রদেশ এবং পাঞ্জাব, আসামের ন্যায় নন-রেগুলেশান প্রদেশ সমূহের মধ্যেকার ভেদাভেদ তুলে দেওয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্ণরের বিপুল ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধাদি অব্যাহত রাখা হয়। এই আইন প্রাদেশিক নির্বাহী কর্তৃত্বে দ্বৈত সরকার প্রবর্তন করে। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনসভার পরিবর্তে ভাইসরয়ের নিকট দায়ী থাকবেন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বাংলার সদস্য সংখ্যা হল সর্বোচ্চ। অর্থাৎ ১৪০। আইনসভার নির্ধারিত সদস্য সংখ্যার শতকরা ৭০ জন নির্বাচিত সদস্য হবেন। মনোনীত সদস্যদের শতকরা ২০ জনের অধিক সরকারী কর্মচারী হবেন না।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯৩২ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দফায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল ১৯৩৩ সালের মার্চে শ্বেতপত্রে প্রকাশিত হয়। ভারত শাসন বিল ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হলে ঐ বছরের ২রা আগষ্ট থেকে তা আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বিধৃত মূল নীতিগুলি ছিলঃ

(ক) গভর্ণর শাসিত প্রদেশসমূহ এবং কেন্দ্রে যোগ দিতে ইচ্ছুক রাজ্যসমূহকে নিয়ে সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠন।

(খ) প্রত্যেক গভর্ণর শাসিত প্রদেশে নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ সরকারসহ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান এবং

(গ) দ্বৈত শাসনের বিলুপ্তি সাধন।

এই আইনের তাৎক্ষনিকভাবে গুরত্বপূর্ণ দিক হল, প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন, ১৯১৯ সালের আইনে প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন পদ্ধতির বিলুপ্তি, গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত অথচ জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রী পরিষদের শাসনের সূচনা।

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাপক জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশসমূহের আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বৃটিশ ভারতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বপ্রথম সফলভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে (A Socio-political History of Bengal and the Birth of Bangladesh-Kamruddin Ahmed)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম যে বৃটিশ ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তা ইতিহাসই প্রমাণ দেয়। অথচ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রবর্তন করার পর বৃটিশ ভারতে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটা আইন প্রণীত হয়েছে। এমনকি এসব আইনের ভিত্তিতে স্থানীয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কয়েক স্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের শাসনবিধি বলবৎ থাকার কারণে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে গ্রাম, ইউনিয়ন, জেলা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাজ করার সুযোগ লাভ করেনি। ১৯৫৪ সালেই সর্বপ্রথম প্রাদেশিক পর্যায়ে এবং ১৯৫৯ সালে স্থানীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছিল।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির তুলনামূলক আলোচনাঃ

(ক) পাকিস্তানে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে স্থানীয় বা গ্রাম পর্যায়ের শাসন সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের শাসনবিধি বলবৎ থাকায় মৌজা হেডম্যান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ) মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়। কারণ ১৯০০ সালের শাসনবিধি অনুসারে মৌজা হেডম্যানগণ নিজ নিজ মৌজায় এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহ কয়েক মৌজা সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ারে বিরোধ বিচার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা ভোগ করেন।

(খ) ১৯০০ সালের শাসনবিধি একটি বিশেষ আইন এবং এটা কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এবং এক ব্যক্তি

www.pathagar.com

ডেপুটি কমিশনার দ্বারা শাসিত। তিনি সরাসরি জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী। স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ বা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ নন। একটি বিশেষ এলাকার শাসক হিসাবে ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের যাবতীয় ভালমন্দের জিম্মাদার অথচ তিনি তাদের কারো কাছে দায়বদ্ধ নন। তিনি স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। তিনি জাতীয় সরকারের একজন কর্মচারী এবং প্রতিনিধি মাত্র। সেজন্য তিনি স্থানীয় জনগণের কাছে নীতিগত এবং আইনগত কোন ভাবেই দায়বদ্ধ নন।

(গ) বিশেষ এলাকা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা তিন পার্বত্য জেলা সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য অঞ্চলে এক ব্যক্তির শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার নামে সীমিত স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমতে যেসব সুবিধা বিশেষতঃ সামাজিক বিরোধ বিচার নিস্পত্তি, জুমচাষ, ভূমির মালিকানা লাভ ও ভোগদখলের ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন, সেগুলি সংরক্ষণ করার জন্য ১৯৮৯ সালে পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) ১৯৮৯ নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং মৌজা হেডম্যান নিয়োগ ও ভূমি কর আদায়ের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার যেসব ক্ষমতা ইতিপূর্বে ভোগ করতেন সেগুলি বহাল রাখা হয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন বলবৎ হওয়ার পরও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বহাল থাকার কারণে স্থানীয় প্রশাসনে ডেপুটি কমিশনারের কতৃত্ব বহাল থাকছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারকে স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ করা হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার স্থানীয় পরিসরে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

(ঙ) পার্বত্য অঞ্চলে জমি বন্দোবস্ত প্রদান ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে যে একক ক্ষমতা ভোগ করতেন স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে তার সে ক্ষমতা অনেকটা খর্ব করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসারে খাস জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের অনুমতি দানের ক্ষমতা স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দার ভূয়া সনদপত্র দেখিয়ে বহিরাগতরা ইতিপূর্বে যে হারে পার্বত্য অঞ্চলে বন্দোবস্ত ও খরিদমূলে জমির মালিকানা লাভ

www.pathagar.com

করতেন স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের উল্লিখিত বিধি নিষেধের ফলে তা কিছুটা হ্রাস পাবে।

(চ) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার এককভাবে যে ক্ষমতা ভোগ করতেন, জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহকে সে পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। তবে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ যে ক্ষমতা ভোগ করছে ডেপুটি কমিশনার সে ক্ষমতা ভোগ করতেন না।

(ছ) স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে মোট ২২টি সরকারী বিভাগ-প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯০০ সালের শাসনবিধি অনুসারে ডেপুটি কমিশনার এতগুলি সরকারী বিভাগ প্রতিষ্ঠান সরাসরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভোগ করেন না।

(জ) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে দেওয়ানী ও রাজস্ব মামলা বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে একটা স্বায়ত্বশাসিত এলাকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহের এখতিয়ারে আনা হয়নি।

(ঝ) ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ সংসদ কর্তৃক প্রণীত একটি সাধারণ আইন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বাংলার গভর্ণর কর্তৃক জারীকৃত একটি বিশেষ আইন। সেটা সংশোধন, পরিবর্তণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সরকারের এখতিয়ারাধীন। কোন সংশোধনীর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার ক্ষমতা স্থানীয় জনগণের ছিলনা। অনুরূপভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহও সংসদ সাধারণ সংখ্যাধিক্যে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। এটা সংবিধানের অংশ নয় বলে এটাকে বাতিল বা সংশোধন করার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়না। এই আইনসমূহের কোন সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই। তেমনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিরও সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

জনসংহতি সমিতির পাঁচ-দফা দাবীনামা এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির আপত্তির কথা এই পুস্তিকায় প্রসংগান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সে বিষয়ে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে অর্পিত দায়িত্ব এবং ক্ষমতা জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবীর ন্যূনতম কয়টি এবং কি কি দাবী পূরণ হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ১৯৮৭ সালের ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের কাছে যে পাঁচদফা দাবী পেশ করে, তার প্রথম এবং প্রধান দাবী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান পূর্বক তথায় স্বায়ত্বশাসন প্রদান। জনসংহতি সমিতি ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুন অনুষ্ঠিত ৫ম বৈঠক পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে অটল থাকে। ১৯৮৮ সালে ১৪ই এবং ১৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি পাঁচদফা দাবীনামা সংশোধন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত সংশোধিত দাবীনামা পেশ করে। জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে রূপান্তরিত করলেও মূল পাঁচদফা দাবীনামার অপরাপর সমুদয় দাবী অপরিবর্তিত রাখে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আলোচক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কাছে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবী জানিয়েছিল। কেন সে দাবী শেষ পর্যন্ত অর্জিত হয়নি তাও এই পুস্তিকায় প্রসংগান্তরে আলোচনা করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চলে "জুম্মল্যান্ড" প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষুদ্র উপজাতির মতে অখন্ড পার্বত্য অঞ্চল মানেই একটি বিশেষ উপজাতি কতৃক অন্যান্য উপজাতিগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এই একটি বিশেষ

www.pathagar.com

উপজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশংকাই শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী অর্জনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই জনসংহতি সমিতি চাইলেই সব উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যাবে এমনটা বিশ্বাস করা যায়না।

২. পাঁচদফা দাবীনামায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী সংযোজন করা হলেও মূল পাঁচদফা দাবীনামায় যে সকল বিষয় প্রাদেশিক পরিষদের কাছে হস্তান্তরের দাবী করা হয়েছিল আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষেত্রেও ঐ সকল বিষয় হস্তান্তরের দাবী অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বেতার, টেলিভিশন, ডাক, বিচার ব্যবস্থা, খনিজ সম্পদ, পর্যটন, তথ্য (সংবাদপত্র) বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সীমান্ত রক্ষা ব্যতীত জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবীনামায় সংযোজিত অন্যান্য সব বিষয় স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে রাখা হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ট তফসীলে স্বায়ত্বশাসিত জেলার মধ্যে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল এবং তথায় আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ট তফসীল অনুসারে আঞ্চলিক পরিষদ স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদের নীচের স্তরের একটা প্রশাসনিক সংস্থা। সেদিক থেকে বিচার করলে জেলা পরিষদের নিম্নস্তরের একটা প্রশাসনিক সংস্থার কাছে উপরোক্ত কতিপয় বিষয় হস্তান্তরের দাবী অযৌক্তিক।

৩. পার্বত্য অঞ্চলকে "জুম্ম ল্যান্ড" ঘোষনার দাবী একটা বিতর্কিত বিষয়। জীবিকা বা পেশা ভিত্তিতে কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠির নাম বা পরিচয় নির্ধারিত হতে পারেনা। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠি এক কালে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই বলে তারা "জুম্যা বা "জুম্ম" নয়। এটা পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীগণ কর্তৃক প্রদত্ত নাম, যার অর্থ অর্ধসভ্য এবং অনুন্নত জনগোষ্ঠি। তাই এটা কিছুতেই উপজাতীয় জনগোষ্ঠির জাতীয় পরিচয় হতে পারেনা। জনসংহতি সমিতি চাইলেই সব উপজাতি "জুম্ম জাতি" হিসাবে পরিচিত হতে চাইবে না।

৪. জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রধান দাবী হল, অন্য জেলার লোক পার্বত্য অঞ্চলে বসতিস্থাপন করার বিষয়ে সংবিধানে বিধিনিষেধ আরোপ করা। এই দাবী সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হলেও

www.pathagar.com

কোন একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য এ ধরণের বিধিনিষেধ পৃথিবীর কোন কোন দেশে রাখা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে জমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে বিশেষতঃ এই অঞ্চলের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের কাছে জমি বন্দোবস্তি প্রদান বা এমন ব্যক্তি কর্তৃক জমি খরিদের ক্ষেত্রে সে ধরণের বিধিনিষেধ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে রাখা হয়েছে, তাতে বাইরের কোন লোকের পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ বেশ কঠিন করা হয়েছে। এতে পার্বত্য অঞ্চলের বাইরের কোন লোকের পক্ষে এখানে জমির মালিকানা লাভ করা কঠিন হবে।

৫. পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তি যাতে এই অঞ্চলের চাকুরীর কোন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, তজ্জন্য সাংবিধানিকভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করাও জনসংহতি সমিতির অন্যতম দাবী। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে অত্র অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন উপজাতির এবং সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতে কর্মচারী নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

৬. ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্টের পর অন্য জেলার যে সকল লোক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লংঘন করে পার্বত্য অঞ্চলে জায়গা-জমির মালিকানা লাভ করেছে তাদেরকে এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতি দাবী জানিয়েছেন। এই পুস্তিকায় প্রসংগান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৭. জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হয়নি। তাই মামলায় জড়িত বা সাজাপ্রাপ্ত জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর কোন সদস্যকে মুক্তি দেওয়া বা সাজা মওকুফ করার প্রশ্ন উথাপিত হয়নি।

৮. পার্বত্য অঞ্চলের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সরাসরি সম্পাদন এবং অন্যান্য সরকারী আধাসরকারী সংস্থা কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির এতদসংক্রান্ত দাবী সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশে পূরণ হয়েছে বলা যায়।

www.pathagar.com

৯. কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ এবং সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকুরীতে কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত জনসংহতি সমিতির দাবী একটা জরুরী দাবী নয়। কারণ উপরোক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সরকার বহু পূর্বেই কার্যকরী করেছেন, যদিও তাতে জনসংহতি সমিতির দাবী শতকরা একশ ভাগ পূরণ হয়নি। জনসংহতি সমিতির কিছু কিছু দাবী উপরে আলোচিত দাবীগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সেগুলির আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে ছয়বার বৈঠকে মিলিত হয়ে কোন সমঝোতায় উপনীত হতে পারেনি। তাই স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সব দাবী পূরণ হওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। জনসংহতি সমিতি মূল পাঁচ-দফা দাবীর উপর আলোচনা চালিয়ে গেলে হয়তবা তাদের অনেক দাবীই আদায় করা যেত। কৌশলগত ভুলের জন্য জনসংহতি সমিতি দাবী আদায়ের এই সুযোগ হারিয়েছে। অন্যদিকে, জনসংহতি সমিতির অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা ছাড়াই স্থানীয় সরকার পরিষদ নামের স্বশাসন ব্যবস্থা পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছেন- এই অজুহাতে জনসংহতি সমিতি তা প্রত্যাখান করেছে।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে সমাধানের আশায় উপজাতীয় জনগণ বিগত সতর বছর বুক বেঁধে ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের আশাভংগ হয়েছে। তাই তারা আশায় বুক বেঁধে বসে থাকতে আর আগ্রহী নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদই হচ্ছে জনসংহতি সমিতির বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠার একটা যথাযথ ফোরাম। পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ আজ যথার্থভাবেই সেই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে জনসংহতি সমিতি আজ জনগণ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগণ, তথা "জুম্ম জাতি"র আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের নামে পরিচালিত আন্দোলনেই জনসংহতি সমিতি আজ উপজাতীয় জনগণের তেমন কোন সমর্থন আদায় করতে পারছেনা। তাই উপজাতীয় জনগণ তথা "জুম্ম জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণাধীকার" আদায়ের নামে নিজেদের নেতৃত্ব এবং সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি ভিন্ন নাম ধারণ করে এই আন্দোলন জিইয়ে রাখতে চাইছে। জনসংহতি সমিতির প্রতি উপজাতীয় জনগণের মোহ ভংগের কারণেই জনসংহতি সমিতিকে এভাবে কৌশল পরিবর্তন করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

উপসংহার

জনসংহতি সমিতির বাইরে থেকে যে সকল উপজাতীয় নেতা এবং জনপ্রতিনিধি পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছেন তারাই সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন। আজ তারাই স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সামিল হয়েছেন। তবে তারা অবশ্যই স্থানীয় সরকার পরিষদকে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করেননি। তারা এই পরিষদকে দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক স্থায়ী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র আন্দোলনের একটা বিকল্প ব্যবস্থা এবং সমস্যা সমাধানের পথে একটা বলিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করেছেন এবং আজও তাই গণ্য করেন।

উপজাতীয় জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি হিসাবে তাদের আশা-আকাঙ্খা আবেগ অনুভূতির সাথে সংগতিপূর্ণ এমন কোন ব্যবস্থা যদি সরকার উদ্ভাবন করতে পারেন, যা হবে স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে একটা উন্নত ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে সরকার যদি জনসংহতি সমিতির সাথে আবারও আলোচনায় বসতে চায়, সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিকে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পক্ষ হিসাবে গণ্য করতে হবে। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতিতে আজ একটি শক্তিশালী পক্ষ। পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য অথচ স্থানীয় সরকার পরিষদের বিকল্প এমন কোন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করার আগেই স্থানীয় সরকার পরিষদ ভেংগে দেওয়ার দাবী উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এর অর্থ ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুনের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

এ প্রসংগে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক নিবন্ধে স্থানীয় সরকার পরিষদ সম্পর্কে সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মূল্যায়ন প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে একটি যথার্থ সূচনা। লক্ষ্যনীয় আমি এখানে চূড়ান্ত সমাধান বলছিনা, বলছি চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে একটি ক্ষুদ্র অগ্রগতি। অগ্রগতি এ কারণে যে, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী

www.pathagar.com

সমূহের প্রতিনিধিত্বের পথ সুগম করেছে। তবে প্রতিষ্ঠানটিকে বাস্তবে কার্যকর করার প্রক্রিয়া নিয়ে হয়তো বিতর্ক থাকতে পারে, তবে তা প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপটে নিরসনযোগ্য। রাজনৈতিক সমাধানের যে মূল লক্ষ্য জাতীয় মূলধারার সংগে এ এলাকার মানুষকে সম্পৃক্তকরণ তা অর্জিত হতে পারে এমনি সীমিত কিন্তু অর্থবহ সূচনার উপর ভিত্তি করেই, একে নস্যাৎ করে নয়। কারণ তা হবে অযৌক্তিক বিলাসিতা। এ অর্জনগুলোর জন্য ব্যয় হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমান শ্রম ও সম্পদ, সম্পদ দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে যা যৎকিঞ্চিত নয়"।

৯ই জুন ১৯৯১ ইং তারিখের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্তই জনাব আনোয়ার হোসেনের উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমান করেছে। সরকারের উল্লেখিত সিদ্ধান্তে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে যে প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে বর্তমান সরকার সেটাকে একটা সঠিক এবং সময়োচিত পদক্ষেপ বলে মনে করেন। উল্লেখ্য যে, ৯ই জুনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির সভায় পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে বর্ণিত ২২টি বিষয় পরিষদগুলির কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির প্রতি বর্তমান সরকারের মনোভাব সম্বন্ধে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মনে এ যাবত যে সংশয় এবং সন্দেহ ছিল সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এর নিরসন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতারও প্রতিফলন এতে ঘটেছে।

সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসতে বাধ্য। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের কিছু ত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের প্রশাসনে সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশীদারীত্ব এবং কর্তৃত্ব নিশ্চিত করবে। বর্তমান সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে একদিকে বর্তমান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বস্তরের জনগণের মনে আশার সঞ্চার করেছে। সরকারের উপরোক্ত

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের জন্য সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনবে। একথাও সত্য যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন এক জিনিস নয়। তাছাড়া যেকোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর সাথে জড়িত আছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্য।

স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলির দু'বছরের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। সরকারের সিদ্ধান্ত কত দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে কার্যকরী হচ্ছে, তা দেখেই জনগণ সরকারের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা মূল্যায়ন করবে। কত স্বল্প সময়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে আগামী দিনগুলিতে সেদিকেই জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

৯ই জুন,১৯৯১ইং তারিখের পরবর্তী অবস্থা

১: তিন পরিষদের যৌথসভা

১.ক: প্রথম যৌথ সভাঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে ২২ টি বিষয় হস্তান্তর সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের পর ১৯ শে জুন, ১৯৯১ ইং তারিখে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি রাঙ্গামাটিতে একটি শীর্ষ পর্যায়ের যৌথ সভায় মিলিত হয়। স্বাগতিক পরিষদ হিসাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব গৌতম দেওয়ান উক্ত যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উক্ত যৌথ সভায় ১) পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং তৎকালিন উপজেলা পরিষদসমূহ স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে হস্তান্তরকরণ, ২) ১৯০০ ইং সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি রহিত ও পার্বত্য জেলা সমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ ইং সনের ১৬নং আইন) বলবৎ করা, ৩) ১৯৫৮ ইং সালের ভূমি হুকুম দখল আইন রহিত করা, ৪) উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কোটা বন্টনের দায়িত্ব পরিষদগুলির কাছে ন্যস্ত করা এবং পার্বত্য অঞ্চলের অউপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা, ৫) বাজার ফান্ড সংস্থার প্রশাসন ও ভূমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করা, ৬) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী, শান্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত সহিংস ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয় ও অউপজাতীয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, খাগড়াছড়ি জেলার গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম এবং শান্তিগ্রাম প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালু রাখা এবং ৭) পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারণ করার ও ঘোষণা দেওয়ার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়।

যৌথসভার উপরোক্ত দাবীসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করার ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ আবেদন আকারে লিখিতভাবে পেশ করার সিদ্ধান্তও উক্ত বৈঠকে গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্তক্রমে বৈঠকের দিনই একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত করা হয়। তিন পরিষদের পক্ষে তিনজন

www.pathagar.com

চেয়ারম্যানই তাতে স্বাক্ষর করেন। তিন পরিষদের যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তীতে চেয়ারম্যানবৃন্দ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং লিখিত আবেদন পেশ করেন।

দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল মূলতঃ সেসব অসুবিধা দূর করা এবং বিষয় হস্তান্তর সংক্রান্ত ৯ই জুন ১৯৯১ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য ১৯শে জুন তারিখের যৌথ বৈঠকে সরকারের কাছে আহ্বান জানান হয়েছিল। তাতেও তাৎক্ষনিক কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এতে স্বাভাবিকভাবেই পরিষদগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ হতাশ হয়ে পড়েন। অনেক সদস্য পরিষদের কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

১.খ: দ্বিতীয় যৌথসভা

এরূপ এক হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যে ১৯৯১ইং সনের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ খাগড়াছড়িতে দ্বিতীয়বারের ন্যায় যৌথসভায় মিলিত হয়। স্বাগতিক পরিষদ হিসাবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সমীরন দেওয়ান এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যান ছাড়াও প্রত্যেক পরিষদ থেকে পাঁচজন সদস্য যৌথসভায় যোগদান করেন।

এই যৌথসভায় ১৯শে জুন ১৯৯১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যৌথসভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ১৯৯১ইং সালের ৯ই জুনের সরকারী সিদ্ধান্ত ১৯শে জুন তারিখের সভার আহ্বান এবং তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ সত্বেও বাস্তবায়িত না হওয়ায় এই যৌথসভায় গভীর হতাশা প্রকাশ করা হয়। এই যৌথসভা ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর দু'দিন স্থায়ী হয়।

স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠার দু'বছর সময়েও এই ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং নূতন ক্ষমতাসীন সরকারের ৯ই জুনের সিদ্ধান্ত ও ঘোষণার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হয়, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যৌথসভার সিদ্ধান্তসমূহে। রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম যৌথসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও দাবীনামা পুনর্ব্যক্ত করা ছাড়াও ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯১ইং তারিখের মধ্যে বাকী ১৯টি বিষয়

www.pathagar.com

পরিষদগুলির কাছে হস্তান্তরের সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে পরিষদগুলি সরকারের সাথে অনেকটা বিরোধের অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির এরূপ একটা সিদ্ধান্তে বাস্তবে পরিষদগুলির ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরিষদগুলির এধরণের একটা অবস্থানের কারণে জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে বলেও কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি প্রতিষ্ঠার পর দু'বছরের মধ্যেও স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ৯ই জুনের সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনগণের কাছে পরিষদগুলির গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছিলো। তখন পরিষদগুলি টিকিয়ে রাখাটাই যেন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের জন্য একটা দায় হয়ে পড়ে। এরকম একটা অবস্থায় পরিষদগুলির ভবিষ্যৎ দ্রুত নিস্পত্তির জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেকটা পরিস্থিতির চাপে পড়ে পরিষদগুলিকে সরকারের সাথে এরূপ একটা অবস্থান নিতে হয়।

১.গ: বিশেষ যৌথসভাঃ

খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যৌথসভায় গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর সরকার ৯ই জুনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। নির্ধারিত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার ১) মৎস্য, ২) পশু সম্পদ, ৩) সমবায়, ৪) কুটির শিল্প ও ৫) বন অধিদপ্তর পরিষদগুলির কাছে হস্তান্তর করে। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি তথা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের এরূপ ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হয়। সরকারের এই পদক্ষেপে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যেও উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। পরিষদগুলির কার্যক্রম পুনরায় জোরদার হয়।

সরকারের এরূপ ইতিবাচক মনোভাবের প্রতি সাড়া দিয়ে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ১৯৯২ ইং সালের ৬ই জানুয়ারী বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাচিং প্রু জেরির চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে তারই সভাপতিত্বে এক বিশেষ যৌথসভায় মিলিত হয়। উক্ত সভায় ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর ১৯৯১ ইং তারিখের দাবী অনুসারে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উপরে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয় পরিষদগুলির কাছে হস্তান্তর করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ এবং খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যৌথসভায় গৃহীত বাকী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

২: সংলাপ কমিটি গঠনঃ

স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি চালু রাখার পাশাপাশি সরকার জনসংহতি সমিতির সাথেও আলোচনার উদ্যোগ গ্রহন করে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদ বা এলাকার নেতৃবৃন্দের মতামত ছাড়াই সরকার নিজ উদ্যোগে এ সকল কমিটি গঠন করেছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এসব কমিটি গঠনের কথা জানা যায়। কমিটির সদস্য হিসাবে উল্লেখিত ব্যক্তিরাই এসব কমিটি গঠন বা কমিটিতে তাদের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালানোর লক্ষ্যে সরকার এ যাবৎ দু'টি কমিটি গঠন করেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়। দু'টি পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করার খবর জানাজানি হয়ে গেলে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের বিশেষ যৌথসভায় এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির মতামত গ্রহণ করার জন্য উক্ত যৌথসভায় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

৩: ১০ই এপ্রিলের লোগাং হত্যাকান্ডঃ

১৯৯২ইং সালের ১০ই এপ্রিল দুপুর ১২টায় উপজাতীয়দের সর্ব বৃহৎ সামাজিক উৎসব 'বিঝু' উৎসবের মাত্র দু'দিন আগে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন লোগাং গ্রামে একটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। সরকারী ভাষ্যমতে, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ৩ জন বাঙ্গালী রাখাল ছেলের উপর হামলা চালিয়ে ৩ জনকেই আহত করে পরে যাদের ১ জন মারা যায়। এই ঘটনার খবর স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পে জানানো হলে তারা ঘটনাস্থলে যায়। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তখন তাদের উপর গুলি ছুঁড়ে। বিডিআর বাহিনীর সদস্যরাও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ফলে ১২ জন উপজাতীয় লোক নিহত হয়।

অন্যদিকে, উপজাতীয়দের ভাষ্যমতে, বাঙালী এবং উপজাতীয় বালকদের মধ্যে মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাঙালী এবং বাঙালীদের দ্বারা গঠিত ভিডিপি ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা বিডিআর বাহিনীর সদস্যদের ছত্রছায়ায় পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় গ্রামসমূহে হামলা চালায়। তাদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং নির্বিচারে উপজাতীয় লোকদের হত্যা করে। উপজাতীয়দের ভাষ্যমতে, এতে শত শত উপজাতীয় লোক নিহত এবং আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ১৫৭ জনের লাশ

www.pathagar.com

খাগড়াছড়িতে এনে রাতের অন্ধকারে কবর দেওয়া হয়েছে। এভাবে উপজাতীয়দের হত্যা করার অভিযোগ সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ সূত্রের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তবে লোগাং-এর এই ঘটনায় ৫৩৬টি উপজাতীয় পরিবারের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সরকারীভাবে জানা গেছে।

লোগাং-এর ঘটনায় পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের মধ্যে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৩ই এপ্রিল 'বিঝু' উৎসব বর্জন করার জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ডাক দেয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই ডাকে বিঝু উৎসব বন্ধ হয়নি। তবে বিঝু তেমন জাকজমকপূর্ণ হয়নি।

ঘ: বান্দরবানে চতুর্থ যৌথ সভাঃ

১৯৯২ইং সালের ২২শে এপ্রিল তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চতুর্থবারের মত বান্দরবানে যৌথসভায় মিলিত হয়। স্বাগতিক পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাচিং প্রু জেরি এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক ২২শে ও ২৩শে এপ্রিল দু'দিন স্থায়ী হয়।

সভায় ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাজমান অসংগতি ও জটিলতার নিরসন, একটি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তরের পর পুনরায় প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন, প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনসহ পূর্ববর্তী যৌথসভার অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে পুনরায় দাবী জানান হয়। এছাড়া লোগাং হত্যাকান্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠান এবং তদন্ত সাপেক্ষে ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী ও পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে অবিলম্বে সংলাপ শুরু করার আহ্বান জানান হয়।

ঙ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লোগাং সফরঃ

২৫শে এপ্রিল ১৯৯২ইং সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী ১০ই এপ্রিলের হত্যাকান্ডের স্থল লোগাং পরিদর্শনে যান। তিনি ঐ দিন সকালে লোগাং মডেল স্কুল প্রাঙ্গনে এক জনসভায় ভাষণ দেন। মন্ত্রী তার ভাষণে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি ১০ই এপ্রিলের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের যথাযথ সাহায্য প্রদানের এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। লোগাং এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল অপ-প্রচার চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন (সংবাদ, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৯২ইং)।

www.pathagar.com

৫: শেখ হাসিনার লোগাং সফরঃ

২৭শে, এপ্রিল ১৯৯২ইং সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা লোগাং-এর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। ঐদিন তিনি চট্টগ্রাম থেকে সড়ক পথে খাগড়াছড়ি যাওয়ার সময় খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি, জালিয়াপাড়া ও গুইমারায় আয়োজিত পথ সভায় ভাষণ দেন। তিনি খাগড়াছড়ি থেকে একই দিন বিকালে লোগাং এর ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন। লোগাং থেকে ফিরে এসে বিরোধী দলীয় নেত্রী একইদিন বিকালে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম মাঠে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে তাঁর লোগাং সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে লোগাং হত্যাকান্ডসহ পার্বত্য অঞ্চলে সংঘটিত সকল হত্যাকান্ডের তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানান। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে বলে তিনি তাঁর ভাষণে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। (সংবাদ, ২৮শে এপ্রিল'৯২ইং)।

৬: স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সাথে বৈঠকঃ

বিরোধী দলীয় নেত্রী ২৮শে এপ্রিল দুপুরে খাগড়াছড়িতে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। তিনি সেখানে পরিষদের কার্যক্রম এবং পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনার জন্য তিনি পরিষদ নেতৃবৃন্দের কাছে আহ্বান জানান। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সমীরন দেওয়ান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। (সংবাদ, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯২ইং)

৭: প্রধানমন্ত্রীর লোগাং পরিদর্শন ও খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ভবন উদ্বোধনঃ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৩ই মে ১৯৯২ইং খাগড়াছড়ি যান এবং ঐদিন দুপুরে তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের উপস্থিতিতে খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। পরিষদ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। বেগম

www.pathagar.com

খালেদা জিয়া আরও বলেন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার যেকোন সময় খোলা মন নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী এবং সেই লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যে সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া আরও বলেন যে, স্বৈরাচারী সরকারের আমলে মাত্র ৩টি বিষয় পরিষদগুলির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু তার সরকারের আমলে শিল্প ও বাণিজ্য, সমবায়, মৎস্য, পশু সম্পদ, সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, অশ্রেণীভূক্ত বন সহ মোট ৭টি বিষয় পরিষদ গুলির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ভবন উদ্বোধনের পর পরই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্থানীয় খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় ভাষণ দেন। জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বেগম জিয়া বলেন যে, এই অঞ্চলের জনগণকে তাদের অঞ্চল এবং সমগ্র দেশের উন্নয়নের জন্য এক যোগে কাজ করতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন যে, কোন কোন কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তাদের স্বার্থে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

জনসভা শেষে বেগম খালেদা জিয়া ১০ই এপ্রিলের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম লোগাং পরিদর্শনে যান। সেখানে তাকে জানান হয় যে, ঐ ঘটনায় ৫৮৭ টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং এতে ৫৪৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন। তিনি লোগাং গ্রামে সংঘটিত হত্যাকান্ডের নিন্দা করেন (সংবাদ, ১৪ই মে, ১৯৯২ইং)।

৮: লোগাং হত্যাকান্ডে তদন্ত কমিশন গঠনঃ

লোগাং-এ সংঘটিত হত্যাকান্ড তদন্তের জন্য সরকার ১০ই মে ১৯৯২ইং ১-সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। বিচারপতি সুলতান হোসেন খান (প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার) এই কমিশনের সদস্য নির্বচিত হন। ঘটনা কোথায় সংঘটিত হয় তা নির্ণয় করা, ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা, ঘটনার জন্য কে বা কারা দায়ী তা নির্ধারণ করা, ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় ইত্যাদি কমিশনের কার্য পরিধি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে (সংবাদ, ১১ই মে ১৯৯২ইং)।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কয়েকটি বিরোধী দল, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠন এরূপ একটি তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য বার বার দাবী জানিয়ে আসছিল।

৯: ২০শে মে ১৯৯২ইং তারিখের সাম্প্রদায়িক সহিংসতাঃ

কয়েকদিন আগে সংঘটিত একটি নারীঘটিত ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯শে মে তারিখে কয়েকজন উপজাতীয় ছাত্র এক বাঙালী ছাত্রকে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের সামনের রাস্তায় মারধর করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের বাঙালী ছাত্ররা চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি সড়ক অবরোধ করে। এতে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে যানবাহন চলাচল কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাঙালী ছাত্ররা অবরোধ তুলে নেয়।

বাঙালী ছাত্ররা বিকালে কতিপয় উপজাতীয় ছাত্র কর্তৃক একজন বাঙালী ছাত্রকে মারধর করার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিচার ও দোষীদের শাস্তি প্রদান এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে বেআইনী ঘোষণা করে এর তৎপরতা বন্ধ করার দাবী জানিয়ে "বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির" পক্ষ থেকে স্বাক্ষর বিহীন একটি স্মারকলিপি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান, রিজিয়ন কমান্ডার এবং জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবী পূরণ করা না হলে পরদিন ২০শে মে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করা হবে বলে স্মারক লিপিতে ঘোষণা দেওয়া হয়।

এদিকে পরদিন ২০শে মে রাঙ্গামাটি কলেজ চত্বরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। একজন বাঙালী ছাত্রকে মারধর করার প্রতিবাদ স্বরূপ "বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি" ২০শে মে সকাল ৯টায় রাঙ্গামাটি কলেজ চত্বরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের কথা ঘোষণা করে। সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ২০শে মে থেকে এক সপ্তাহের জন্য কলেজ চত্বরে সবধরণের সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

কলেজ অধ্যক্ষের নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে এবং কলেজ চত্বরে বাঙালী ছাত্রদের সাথে বিরোধ এবং সংঘর্ষ এড়ানোর লক্ষ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ২০শে মে সকালে স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান চলাকালে সকাল ১০টার দিকে বাঙালী ছাত্র-জনতার একটি মিছিল বনরূপা থেকে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা হলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রানী দয়াময়ী স্কুলের সামনে মিছিল আটকে রাখে। ইতিমধ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান কিছুক্ষনের জন্য বন্ধ রাখার অনুরোধ করা হয়। সেই অবসরে বাঙালী ছাত্র-জনতার মিছিল পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠান স্থল অতিক্রম করে কলেজের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষনের মধ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাদের অনুষ্ঠান শেষ করে মিছিল সহকারে বনরূপার দিকে চলে যায় এবং বনরূপা পেট্রোল পাম্প থেকে যার যার বাড়ী ঘরে চলে যেতে থাকে। এদিকে রাঙ্গামাটি কলেজ প্রাঙ্গন থেকে বাঙালী ছাত্র-জনতার মিছিলটি দ্রুত বেগে বনরূপার দিকে অগ্রসর হয়। বাঙালী ছাত্র-জনতার একটি অংশ প্রথমে বনরূপা ফরেষ্ট অফিসের উত্তর পার্শ্বের উপজাতীয় বাড়ীগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। সেখান থেকে গিয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্পের আশে পাশের দোকান ও উপজাতীয় পাড়ায় বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় একই সময়ে প্রেট্রোল পাম্পের অদূরে অবস্থিত টাইবেল আদামের বাড়ী ঘরেও অগ্নি সংযোগ করা হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতার এই হামলায় বনরূপা, টাইবেল আদাম ও দেওয়ান পাড়া এলাকায় প্রায় ৯০টি উপজাতীয় অউপজাতীয় বসত বাড়ী ও দোকান গৃহ পুড়ে যায়। এতে মোট ১২জন আহত হয়, যাদের প্রায় সবাই উপজাতীয়। (সংবাদ ২১শে মে, ১৯৯২)

৯.ক: স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের পদত্যাগঃ

মারামারির একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান প্রতিহত করার প্রচেষ্ঠার পরিনতিতে রাঙ্গামাটিতে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে যায়, তার প্রতিবাদ স্বরূপ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব গৌতম দেওয়ান ২০শে মে সন্ধ্যায় তার নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ১৯শে মে তারিখের মারামারির ঘটনার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিচার দাবী করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি" কর্তৃক পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থলে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজনের প্রেক্ষিতে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিয়েছেন বলে জনাব গৌতম দেওয়ান সাংবাদিকদের জানান। গৌতম দেওয়ানের পদত্যাগের ফলে রাঙ্গামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ভবিষ্যৎ অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তার পদত্যাগের ঘটনাকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তাদের একটি বিজয় হিসাবে চিহ্নিত করে। জনাব গৌতম দেওয়ানের পদত্যাগকে তারা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিলুপ্তির পথে একটা বড় পদক্ষেপ বলে গণ্য করে।

পরিষদ সদস্যদের অনুরোধ সত্বেও জনাব গৌতম দেওয়ান তার পদত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তবে স্থানীয় সরকার পরিষদকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি সদস্যদেরকে পরামর্শ দেন। তিনি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তাঁর পদত্যাগের মাধ্যমে তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদকে ধ্বংস বা এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে চাননি। তার পদত্যাগের অর্থ স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। তিনি বরং একটি অধিকতর শক্তিশালী পরিষদ দেখতে চান। পরবর্তীতে সরকার জনাব পারিজাত কুসুম চাকমাকে পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন।

১০: পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানকল্পে নূতনভাবে উদ্যোগ গ্রহণঃ

১০ই এপ্রিলের লোগাং হত্যাকান্ড এবং ২০শে মে তারিখে রাঙ্গামাটিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে একটি সংসদীয় টিম গঠনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবী জানান হচ্ছিল। এসব দাবীর প্রেক্ষিতে হোক বা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থেকে হোক, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে সরকার নূতনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আসন্ন ভারত সফরের প্রাক্কালে ২৩শে মে বিকালে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান আশা প্রকাশ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার অমীমাংসিত বিষয়ং মীমাংসার পথ সুগম করবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, পানি বন্টন, ত্রিপুরা থেকে চাকমা শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা, দুদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং অর্থনৈতিক বিষয়সহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনা হবে। (সংবাদ, ২৪শে মে ১৯৯২ইং)।

www.pathagar.com

১০.ক: প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে চাকমা শরণার্থীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর গুরুত্ববহ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৬শে মে ১৯৯২ইং তিনদিনব্যাপী ভারত সফর শুরু করেন। বেগম জিয়া তার সফরের শেষ পর্যায়ে ২৭শে মে তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনে সিনিয়র সম্পাদকদের সাথে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বলেন যে, তার ভারত সফরের প্রথম দিন ২৬শে মে তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত প্রধানত পানি বন্টন ও চাকমা শরণার্থী সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছে (সংবাদ ২৮শে মে ১৯৯২ইং)।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর পরই দৈনিক সংবাদ এর ৩০শে মে ১৯৯২ইং তারিখের সংখ্যায় "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে নূতন করে আলোচনার উদ্যোগ" শীর্ষক এক সংবাদ নিবন্ধে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির সাথে নূতন করে সংলাপ শুরু করার লক্ষ্যে সরকার এ সম্পর্কিত কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে একজন সদস্য মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উক্ত সংবাদ নিবন্ধে বলা হয় যে, কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে একজন সংসদ সদস্যের নাম প্রস্তাব করার জন্য বিশেষ কার্যাদি বিভাগকে বলা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির বৈঠকেই উপরোক্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০.খ: প্রধান নির্বাচন কমিশনারের তিন পার্বত্য জেলা সফরঃ

তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে অনুষ্ঠান এবং বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে জনমত যাচাই এর লক্ষ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা, বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিবসহ ২৬শে মে ১৯৯২ইং একইদিন রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি সফর করেন। পরদিন তিনি তার দলবল নিয়ে বান্দরবান সফরে যান। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান সফরকালে তিনি জুলাই মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাব্যতা এবং বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের জনগণের সাথে মত বিনিময় করেন (দৈনিক পূর্বকোণ ২৭শে মে, ১৯৯২ইং)।

১১: তদন্ত কমিশনের লোগাং হত্যাকান্ডের তদন্ত শুরুঃ

লোগাং হত্যাকান্ড তদন্তের জন্য গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন ১লা জুন, ১৯৯২ইং খাগড়াছড়ি যান এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সকলের সহযোগিতা

www.pathagar.com

কামনা করেন। যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানেন, তাদেরকে তিনি কমিশনকে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে, সাক্ষী এবং সাহায্যকারীদের নাম গোপন রাখা হবে। খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা হাকিম জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিচারপতি সুলতান হোসেন খান এ সহযোগিতা কামনা করেন। (দৈনিক পূর্বকোণ ২রা জুন, ১৯৯২ইং)।

১২: পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি কল্পে আইনের সংশোধনঃ

১৯৯২ইং সালের জুলাই মাসের পরিবর্তে ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধনের জন্য তিনটি বিল ৮ই জুলাই ১৯৯২ইং তারিখে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত তিন পার্বত্য জেলার সাংসদ যথা- জনাব দীপংকর তালুকদার, জনাব কল্প রঞ্জন চাকমা ও জনাব বীর বাহাদুর বিলগুলি উত্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান, যদিও তাদের আপত্তি ধ্বনি ভোটে নাকচ হয়ে যায়। উপরোক্ত তিনটি সংশোধনী বিল যথাসময়ে সংসদে পাশ হয়ে যায়। আইনের এই সংশোধনী বলে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ ১৮০ দিন অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় (সংবাদ, ৯ই জুলাই'৯২ইং)।

১৩: পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে ৯ সদস্যের কমিটি গঠনঃ

সরকার পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে পরবর্তী দুমাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়। বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিবকে কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে বলা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন, শাহজাহান চৌধুরী এমপি, সৈয়দ অহিদুল আলম এমপি, মোঃ শাহজাহান এমপি, বরকত উল্লাহ (ভুলু) এমপি, শাহজাহান এমপি, মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী এমপি, রাশেদ খান মেনন এমপি এবং আব্দুল মতিন খসরু এমপি (সংবাদ ১০ই জুলাই ১৯৯২ইং এবং একই তারিখে দৈনিক পূর্বকোণ)।

১৩.ক: পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে পার্বত্য অঞ্চলের তিন এমপি,পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদঃ

১০ই জুলাই, ১৯৯২ইং তারিখে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে তিন পার্বত্য জেলা থেকে নির্বাচিত সাংসদ জনাব দীপংকর তালুকদার, জনাব

www.pathagar.com

কল্প রঞ্জন চাকমা ও জনাব বীর বাহাদুর পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তারা তাদের বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সংসদে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংসদদের এতে অন্তর্ভূক্ত করে সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠনের দাবী জানান। পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি গঠন করায় পাহাড়ী গণ পরিষদ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অপর পৃথক বিবৃতিতে পার্বত্য অঞ্চলের সংসদ সদস্যদের বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি গঠন করায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এর প্রতিবাদ করেছে (সংবাদ ১১ই জুলাই ১৯৯২ইং)।

পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার পরে খাগড়াছড়ি জেলা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব কল্প রঞ্জন চাকমাকে অন্তর্ভূক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন করেন।

১৪: চাকমা শরণার্থী নিয়ে দিল্লীতে পুনরায় আলোচনাঃ

বাংলাদেশের বানিজ্য মন্ত্রী জনাব এম. কে. আনোয়ার ভারত সফরকালে ৪ঠা আগষ্ট ১৯৯২ইং নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে তিনি দু'দেশের মধ্যকার বাকী সমস্যাসমূহ বিশেষতঃ গঙ্গার পানি বন্টন ও চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। চাকমা শরণার্থী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও তাকে বলেন যে, ভারত তার ভূখন্ডে একজনও শরণার্থী রাখতে চায় না। (সংবাদ, ৫ই আগষ্ট ১৯৯২ইং)।

১৫: জনসংহতি সমিতির একতরফা অস্ত্র বিরতি ঘোষণাঃ

১লা আগষ্ট, ১৯৯২ইং সালে প্রচারিত এক প্রচার পত্রের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১০ই আগষ্ট থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র বিরতি পালনের ঘোষণা দেয়। জনসংহতি সমিতির উল্লিখিত বিবৃতিতে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানান হয়েছে। জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্রে অস্ত্রবিরতিকালে পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয় বা অন্যদের আগমন বা চলে যাওয়া বন্ধেও সহায়ক হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে (সংবাদ ১১ই আগষ্ট, ১৯৯২ইং)।

www.pathagar.com

১৫.ক: জনসংহতি সমিতির অস্ত্রবিরতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়াঃ

১০ই আগষ্ট থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র বিরতি পালনের ঘোষণা দিয়ে জনসংহতি সমিতি যে প্রচারপত্র বিলি করে তৎপ্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তারা জনসংহতি সমিতির এই অস্ত্র বিরতির ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান জনাব পারিজাত কুসুম চাকমা জনসংহতি সমিতির এক তরফা অস্ত্র বিরতির ঘোষণা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সুষ্ঠু ও চূড়ান্ত সমাধানের জন্য যদি জনসংহতি সমিতি এই ঘোষণা দিয়ে থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের স্বাগত জানাবেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব সমীরণ দেওয়ান তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, শান্তিবাহিনী যদি সত্যি তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ রাখে তাহলে তা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। আরও যারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তারা হলেন, স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য জনাব রুহুল আমিন এবং বর্তমান লেখক, এডভোকেট আহম্মদুল হক, খাগড়াছড়ি জেলা জাতীয় পার্টির সম্পাদক জনাব সাহাজ উদ্দীন, জেলা বিএনপির সভাপতি জনাব আবুল কাশেম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জাহেদুল আলম এবং যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক জনাব হংসধ্বজ চাকমা (সংবাদ, ১৩ই আগষ্ট ১৯৯২ইং)।

১৬: প্রধানমন্ত্রীর রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান সফরঃ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৫শে আগষ্ট ১৯৯২ইং একই দিনে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি সফর করেন। তিনি প্রথমে বান্দরবান সফর করেন। তিনি সেখানে বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দসহ জনপ্রতিনিধি, উপজাতীয় প্রধান, মৌজা হেডম্যান, গ্রাম প্রধান, ইউপি চেয়ারম্যান, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

জনাব সাচিং প্রু জেরি, বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী ও আরো কয়েকজন বান্দরবানের সমাবেশে ভাষণ দেন। বান্দরবানের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উপজাতীয় রাজাদের মাসিক ভাতা ২৫০০ টাকার স্থলে ৫০০০ টাকা, মৌজা হেডম্যানদের ভাতা ২০০ টাকার স্থলে ৩০০ ও কার্বারীদের ২০০টাকা হারে ভাতা প্রদানের তার সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বান্দরবান সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা ও থানচির মাতামুহুরী উচ্চ বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করেন।

বান্দরবান থেকে রাঙ্গামাটি এসে বেগম জিয়া ঐ দিনই রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট অডিটরিয়ামে স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান, পরিষদের সদস্য, উপজাতীয় রাজা, মৌজা হেডম্যান, কার্বারী, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব পারিজাত কুসুম চাকমা, চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, হেডম্যান সমিতির সভাপতি ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব বিনয় কুমার দেওয়ান, স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য জনাব এ এস এম শহীদুল্লাহ ও যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ এই সমাবেশে ভাষণ দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী জেলা বিএনপির উদ্যোগে পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে আয়োজিত এ ক জনসভায় ভাষণ দেন। স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব পারিজাত কুসুম চাকমা, যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ ও জেলা বিএনপি সভাপতি জনাব নাজিম উদ্দীন জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

বেগম খালেদা জিয়া বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে ও সাফল্যের সাথে সমাধান করা যেতে পারে। তিনি বলেন, অস্ত্রের মাধ্যমে কখনো এসব সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না। বেগম জিয়া বলেন, বনবিভাগের জমিতেই বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন জমিতে বনায়ন করা হবে না। তিনি বলেন যে, জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা। আগামী শুষ্ক মৌসুমে জরিপ চালিয়ে (ক্যাডেষ্ট্রাল সার্ভে) এই সমস্যার সমাধান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলিকে ১২টি বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার সরকার এসব পরিষদকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে চায়, যাতে এগুলো আরও কার্যকরভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান সরকার দেশের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলো বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত সমান অগ্রাধিকার পাবে (সংবাদ, ২৬শে আগষ্ট১৯৯২ইং)।

১৭.ক: পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির খাগড়াছড়ি সফরঃ

যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি ২৬শে আগষ্ট, ১৯৯২ইং থেকে খাগড়াছড়িতে দুদিন ব্যাপী মত বিনিময় সফর শুরু করেন। কমিটি ঐদিন খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, জেলা বিএনপি ও জেলা জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হয়ে মত বিনিময় করে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ কমিটির সাথে বৈঠক বর্জন করে।

কমিটির সাথে বৈঠক বর্জন সম্পর্কে জেলা আওয়ামী লীগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সংসদে আলোচনা না করায় এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন না করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ বৈঠক বর্জন করেছে। অন্য দিকে জেলা জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিশেষ কমিটিতে জাতীয় পার্টির কোন প্রতিনিধি না থাকায় পার্টির নেতৃবৃন্দ বৈঠক বর্জন করেছেন।

খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সমীরণ দেওয়ান এবং সদস্যদের সাথে ঐদিন বেলা সাড়ে ৩টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে বিশেষ কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যার সমাধান, সংবিধানের আলোকে স্থানীয় সরকার পরিষদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পূর্ণ মর্যাদায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং ভারতে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় (সংবাদ, ২৮শে আগষ্ট ১৯৯২ইং)।

এ ছাড়া পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণপরিষদ, ত্রিপুরা সংসদ, মারমা সংসদ, বাঙালী কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,

www.pathagar.com

ইউপি চেয়ারম্যান সমিতি, জেলা কল্যাণ পরিষদ, প্রত্যাগত শান্তিবাহিনী কল্যাণ ট্রাষ্ট ও হেডম্যান কার্বারী সমিতিও বিশেষ কমিটির সাথে মত বিনিময় ও সুপারিশ মালা পেশ করে।

পাহাড়ী গণ ও ছাত্র পরিষদ যথাক্রমে তাদের ৭ দফা ও ৫ দফা দাবী বাস্তবায়ন, জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠক, রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে। জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে হিলট্রাক্ট ম্যানুয়েল বাতিল, ভূমি জরিপ শুরু করা, স্থানীয় সরকার পরিষদকে গণমুখী করা ইত্যাদি সুপারিশ পেশ করা হয়।

ফটিকছড়ি থেকে আগত জামাতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধি দল খাগড়াছড়িতে বিশেষ কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করে শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেয়।

ত্রিপুরা সংসদের নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকার পরিষদকে প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্বশীল করা, শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনা করা, উপজাতীয়দের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে সংবিধানের আলোকে তিন পার্বত্য জেলাকে বিশেষ এলাকা ঘোষণার দাবী জানান।

মারমা সংসদের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ভূমি জরিপ শুরু করা, জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার সময় মারমা সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি রাখা, পার্বত্য এলাকার সমস্যাকে চাকমা সমস্যা হিসাবে না দেখা এবং মংচীফ নিয়োগ বিষয়ক জটিলতা নিরসনের দাবী জানান।

বাঙালী শ্রমিক কৃষক কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ ভারতের সাথে আলোচনাক্রমে উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা, ভূমিহীন পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান পদ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং জনসংখ্যার অনুপাতে পরিষদের সদস্য কোটা নির্ধারণ ইত্যাদি দাবী পেশ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতৃবৃন্দ একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা, হিল ট্রাক্ট ম্যানুয়েল সংশোধন, লেখা পড়া ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ দেয়া ইত্যাদি দাবী পেশ করেন (সংবাদ ১লা সেপ্টম্বর ১৯৯২ইং)।

জনাব রাশেদ খান মেনন বাদে কমিটির বাকী ৮ জন সদস্যের সবাই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জনাব রাশেদ খান মেনন তখন ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

www.pathagar.com

১৭.খ: রাঙ্গামাটি সফর (২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ইং)ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ইং রাঙ্গামাটি সফরে আসে এবং ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনগণের সাথে মত বিনিময় করে। রাঙ্গামাটি অবস্থানকালে কমিটির সদস্যবৃন্দ রাঙ্গামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য গণ পরিষদ, জেলা বিএনপি, জেলা আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, ইউপি চেয়ারম্যান সমিতি, পাংকো ও লুসাই সম্প্রদায়, হেডম্যান সমিতি, যুব ইউনিয়ন, ইসলামী ফ্রন্ট ও রাঙ্গামাটি সাংবাদিক সমিতির সাথে খোলামেলাভাবে মত বিনিময় করে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, গণ সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে সুপারিশ পেশ করা হয়। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন ছাড়াও চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন সহকারী উপদেষ্টা জনাব সুবিমল দেওয়ান ও স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব গৌতম দেওয়ান কমিটির সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে নিজস্ব সুপারিশমালা পেশ করেন।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য সব রাজনৈতিক দল, পেশাজীবি সংগঠন, গনসংগঠনের পক্ষ থেকে কমিটির কাছে সুপারিশ করা হয়। প্রায় সব রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও পেশাজীবি সংগঠনের সুপারিশমালার মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এসব সাধারণ সুপারিশগুলি হল, সমস্যা সমাধান কল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থাসমূহের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা, জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামরিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখা, পুণর্বাসিত বাঙালীদের দখলকৃত উপজাতীয়দের জমি ফেরত প্রদান, উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা, গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম ও শান্তিগ্রামে বসবাসরত উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

এছাড়া ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন, গুর্খা ও অহমিয়া কল্যাণ ফাউন্ডেশান, প্রত্যাগত পুনর্বাসিত শান্তিবাহিনী কল্যাণ পরিষদ, বিশিষ্ট উপজাতীয়দের তিনটি ও অউপজাতীয়দের চারটি দল পৃথক পৃথক ভাবে বিশেষ কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করে সুপারিশমালা পেশ করে। পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলসহ তাদের যথাক্রমে ৭ দফা ও ৫ দফা দাবীনামা বাস্তবায়নের দাবী জানিয়েছে (দৈনিক পূর্বকোণ, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং)।

www.pathagar.com

১৭.গ: বান্দরবান জেলা সফরঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবি ও ছাত্র সংগঠনের ৫ শতাধিক প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা আওয়ামী লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, বি.এন.পি, জামাতে ইসলামী, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হেডম্যান সমিতি, প্রত্যাগত শান্তিবাহিনী কল্যাণ সংস্থা, ছাত্র ইউনিয়ন, জেলা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ কমিটির সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করে নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে সুপারিশমালা পেশ করেন।

বিশেষ কমিটি একই দিন বিকালে বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে আলাদাভাবে বৈঠকে মিলিত হন (সংবাদ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং)।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষ কমিটির কাছে দাখিলকৃত সুপারিশমালার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

১৮.ক: লোগাং তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশঃ

বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে নিয়ে গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট লোগাং হত্যাকান্ড তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ৭ই অক্টোবর ১৯৯২ ইং তারিখে সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, লোগাং ঘটনা তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সুপরিকল্পিত আচরণের দুঃখজনক বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যার পরিনতিতে কবির হোসেন নামক একজন বাঙালী ছেলেসহ ১৩ জন নিহত ও দু'জন আহত হয়েছে। তদন্ত কমিশন পার্বত্য জেলাগুলোর পরিস্থিতি সার্বিকভাবে পর্য্যালোচনা করে সরকারের কাছে কিছু সুপারিশমালা পেশ করেছে। কমিশনের রিপোর্টে পার্বত্য অঞ্চলে কর্মরত সেনা ইউনিটগুলোকে বেসামরিক প্রশাসনে না জড়ানো, উপজাতীয়দের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে বেসামরিক প্রশাসনকে সেনাবাহিনীর প্রভাবমুক্ত রাখা, শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হয়ে শান্তিবাহিনীকে নিষক্রীয় করা এবং পার্বত্য অঞ্চল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য পাহাড়ী ও বাঙালীদের দাবীর প্রেক্ষিতে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করার সুপারিশ করা হয়। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সরকার কমিশনের

www.pathagar.com

সুপারিশগুলি বিবেচনা করে দেখেছেন বলে ঘোষনা করা হয় (সংবাদ, ৮ই ও ৯ই অক্টোবর ১৯৯২ ইং)।

১৮.খ: কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আপত্তিঃ

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ লোগাং হত্যাকান্ড তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তথ্য নির্ভর ও নিরপেক্ষ নয় বলে দাবী করেছে। অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব দীপংকর তালুকদারও তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনিও এই রিপোর্ট নিরপেক্ষ এবং তথ্যনির্ভর নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি কমিশনের এই রিপোর্ট বাতিল করে পূনঃ তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছেন।

১৯.ক: জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠকঃ

সকল মহলের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গত ৫ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক শুরু এবং বিকাল সাড়ে ৫টায় শেষ হয়। মাঝখানে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিসহ মোট ৬ঘন্টা পর্যন্ত আলোচনা স্থায়ী হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন সমিতির প্রধান জনাব জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন বোধি প্রিয় লার্মা। তার সাথে ছিলেন জন সংহতি সমিতির শীর্ষ স্থানীয় নেতা জনাব সুধাসিন্ধু খীসা, জনাব রূপায়ন দেওয়ান, জনাব গৌতম চাকমা এবং জনাব রক্তোৎপল ত্রিপুরা। অন্য দিকে বিশেষ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ। কমিটির সদস্যদের মধ্যে তার সাথে ছিলেন, আওয়ামী লীগের জনাব কল্প রঞ্জন চাক্‌মা এম. পি, জনাব মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী এম. পি, বিন.এন.পির সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এম.পি, জনাব আবদুল মতিন খসরু এম.পি, জনাব বরকত উল্লাহ (ভুলু) এম.পি, এবং জনাব মোঃ শাহজাহান এম.পি।

বৈঠকে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা পরবর্তী বৈঠকের স্বার্থে প্রকাশ করা হয়নি। তবে জনসংহতি সমিতি তাদের অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং পর্যন্ত বাড়াতে সম্মত হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা যায় (সংবাদ, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯২ ইং।

www.pathagar.com

১৯.খ: দ্বিতীয় বৈঠকঃ

গত ২৬শে ডিসেম্বর, জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকের ন্যায় এবারের বৈঠক ও দীর্ঘ ৬ঘন্টা স্থায়ী হয়। বৈঠকের ফলাফল এবার ও প্রকাশ করা হয়নি। জনসংহতি সমিতির প্রধান জনাব জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন বোধি প্রিয় লার্মার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকের টিমই এবারের বৈঠকে সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেয়। অন্যদিকে, বিশেষ কমিটির পক্ষে ছিলেন, যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ, জনাব কল্প রঞ্জন চাক্মা এম.পি, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এম.পি, মোঃ শাহজাহান এম.পি, জনাব বরকত উল্লাহ (ভুলু) এম.পি, এবং জনাব মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী এম.পি।

বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে বিশেষ কমিটির প্রধান যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ আশাবাদী। তিনি বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির প্রধান জোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লার্মা (সন্তু) সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সাংবাদিকদের বলেছেন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে যে, জনসংহতি সমিতির মূল দাবী সম্পর্কে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলাপ হয়নি। শুধুমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের ভবিষ্যৎ বিচার ব্যবস্থা এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয় বৈঠকে প্রাধান্য লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বৈঠকের পূর্বেই জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে ব্যাখ্যাসহ তাদের ৫দফা দাবীনামা বিশেষ কমিটির কাছে পেশ করেছেন। এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের অস্ত্র-বিরতি ৩১শে মার্চ ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত বাড়িয়েছে (সংবাদ, ২৭শে ডিসেম্বর'৯২ ইং)।

১৯.গ: ধুদুকছড়ায় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাংবাদিক সম্মেলনঃ

গত ২৭শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার অর্ন্তগত সীমান্তবর্তী লোগাং ইউনিয়নের ধুদুকছড়া গ্রামের কামিনী কার্বারী পাড়ায় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ১৪টি জাতীয় দৈনিকের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক জনাব হংসধ্বজ চাকমা ও কমিটির সদস্য জনাব মোঃ শফি এবং পানছড়ি থানার নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ শাহাবুদ্দীন পর্যবেক্ষক হিসাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

জনসংহতি সমিতির প্রধান জনাব জোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লার্মা ছাড়া শীর্ষ স্থানীয় নেতা জনাব রূপায়ন দেওয়ান, জনাব রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং জনাব হীরালাল দেওয়ান সমিতির পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন বোধি প্রিয় লার্মাই সমিতির পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সমিতি প্রধান জনাব লার্মা সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, জনসংহতি সমিতি কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০টি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্বার জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যেই জনসংহতি সমিতি দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল জনসংহতি সমিতির এই আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ খুঁজে পায়।

জনাব লার্মা বলেন, আমরা পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতি। তবে উপজাতি নই। জনসংহতি সমিতির আন্দোলন মাটি, মানুষ, বনজঙ্গল ও পাহাড় ফিরে পাওয়ার আন্দোলন। এক প্রশ্নের জবাবে জনাব লার্মা বলেন যে, সরকারের সাথে চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সংশোধিত ৫দফা দাবীনামা আদায়ই এ মুহূর্ত পর্যন্ত সমিতির চূড়ান্ত লক্ষ্য (সংবাদ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং)।

২০.ক: প্রধানমন্ত্রীর পুনরায় খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সফরঃ

গত ২৯শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বারের মত খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান সফরে আসেন। ঐদিন তিনি প্রথমে খাগড়াছড়ি যান এবং স্থানীয় খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় ভাষন দেন। বেগম জিয়া তার ভাষনে বলেন যে, সকল বিভেদ ভুলে এ অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের একত্রে বসতে হবে এবং কার্যকরভাবে সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন যে, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই এ অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করতে হবে। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ধ্বংসাত্বক তৎপরতা কোন সমস্যার সমাধান করবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় বের করার জন্য সরকার একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য তিনি সকলের সাহায্য

www.pathagar.com

কামনা করেন। তিনি বলেন যে, তার সরকার দেশের সুষম উন্নয়নে বিশ্বাস করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকার বহু উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বেগম জিয়ার খাগড়াছড়ি সফর কালে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সমীরন দেওয়ানের নেতৃত্বে কয়েক'শ উপজাতীয় লোক বি.এন.পিতে যোগদান করেন।

২০.খ: বান্দরবানে রাত্রিযাপনঃ তাঁর সাথে উপজাতীয় ও অউপজাতীয় প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৯শে ডিসেম্বর বান্দরবানে রাত্রি যাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীর বান্দরবান অবস্থানকালে উপজাতীয় ও অউপজাতীয়দের একটি প্রতিনিধিদল রাত্রে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা জানার জন্য তিনি এখানে এসেছেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন সমস্যা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বোমাং রাজা মংশৈ প্রু চৌধুরী, বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাচিং প্রু জেরি, জনাব বীর বাহাদুর এম.পি, জনাব মং ক্যচিং চৌধুরী, রংলাই মুরুং, হাজী আলী মিয়া এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ওসমান গনি (সংবাদ,৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং)।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—ক

পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে আলোচনাকারী তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের তালিকা।

বান্দরবান পার্বত্য জেলাঃ

১। বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী (দল নেতা)
২। জনাব অং শৈ প্রু চৌধুরী (প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী)
৩। জনাব কে. এস. প্রু
৪। জনাব সাচিং প্রু জেরী
(বর্তমান বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান)
৫। জনাব হ্লা চিং মং
৬। জনাব ক্য শৈ অং
৭। জনাব এল. ডলিয়ান বম
৮। জনাব লাল নাগ বম
৯। জনাব অনিল ত্রিপুরা
১০। জনাব মং ছা থোয়াই চাক
১১। জনাব পূর্ণচন্দ্র মো
১২। জনাব অংলাই মো

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাঃ

১। জনাব উপেন্দ্র লাল চাক্‌মা (দল নেতা)
২। জনাব সমীরণ দেওয়ান
(বর্তমান খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান)
৩। জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা
৪। জনাব নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা
৫। জনাব পীযুষ কান্তি চাক্‌মা
৬। জনাব নবীন কুমার ত্রিপুরা
৭। জনাব জগদীশ চন্দ্র চাক্‌মা
৮। জনাব নলেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
৯। জনাব অনন্ত বিহারী খীসা
১০। জনাব মুনীন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা
১১। জনাব বকুল চন্দ্র চাক্‌মা

www.pathagar.com

১২। জনাব পুরুষোত্তম চাক্‌মা
১৩। জনাব কংজরী চৌধুরী
১৪। জনাব পাইহ্লা প্রু চৌধুরী
১৫। জনাব রনবিক্রম ত্রিপুরা
১৬। জনাব রূপম দেওয়ান
১৭। জনাব মংহ্লাপ্রু চৌধুরী
১৮। জনাব মংসাজাই চৌধুরী
১৯। জনাব চাই থোয়াই অং
২০। জনাব রেম্রাচাই মারমা
২১। জনাব রামাচাই চৌধুরী

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

১। জনাব শান্তিময় দেওয়ান (দল নেতা)
২। ডাঃ এস, এম, চৌধুরী
৩। জনাব সুবিমল দেওয়ান
৪। জনাব চারু বিকাশ চাক্‌মা
৫। জনাব গৌতম দেওয়ান
(প্রাক্তন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান)
৬। ডাঃ এ, কে, দেওয়ান
৭। জনাব তিলক চন্দ্র চাক্‌মা
৮। জনাব ক্যজ চাই মারমা
৯। জনাব লাল এ্যাথলিয়ানা
১০। জনাব লাল দৌয়া
১১। জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা
১২। জনাব অংথোয়াইচিং চৌধুরী
১৩। জনাব পরিমল তালুকদার
১৪। জনাব মনিস্বপন দেওয়ান
১৫। জনাব রূপক খীসা

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশঃ

১। Bangladesh District Gazetteer, Chittagong Hill Tracts, 1975.

২। মোঃ মহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী 'বাংলাদেশের জাতিসত্বা সংকটঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম', "লোক" কার্তিক ১৩৯২/নভেম্বর ১৯৮৫।

৩। ৪/৭/৭৭ ইং রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমাবেশে 'উপজাতীয় সম্মেলন' বা ট্রাইবেল কন্‌ভেনশন গঠন ও পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানকল্পে গৃহীত কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত।

৪। ২১/৭/৭৭ ইং ট্রাইবেল কনভেনশনের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক জনসংহতি সমিতির কাছে লেখা "খোলা চিঠি"।

৫। (ক) মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার হত্যার ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির "লার্মা গ্রুপ" কর্তৃক প্রচারিত ৩১-১২-৮৩ ইং তারিখের বিবৃতি।

(খ) একই বিষয়ে জনসংহতি সমিতির 'প্রীতি গ্রুপ' কর্তৃক প্রচারিত ২৩-০১-৮৪ ইং তারিখের বিবৃতি।

৬। যোগাযোগ উপ-কমিটির আহ্‌বায়ক উপেন্দ্র লাল চাক্‌মার কাছে ৯-১০-৮২ ইং লিখিত জনসংহতি সমিতির চিঠি ও একই তারিখে স্বাক্ষরিত বিবৃতি।

৭। "বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিপ্রেক্ষিতে জুম্ম জনগণের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি জরুরী ঘোষণা" (১০-০২-৮৬)।

৮। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীনামা।

৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহের প্রেক্ষাপটে "জনসংহতি সমিতির বিবৃতি", ২৮-০৩-৮৮ ইং।

১০। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নয়দফা রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি, ১৯-১১-৮৮ ইং।

১১। যোগাযোগ কমিটির আহ্‌বায়ক, "উপেন্দ্র লাল চাক্‌মার বক্তব্য" নামক পুস্তিকা, ২রা এপ্রিল, ১৯৮৯ ইং।

www.pathagar.com

১২। পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি, ১লা মে, ১৯৮৯।

১৩। রাঙ্গামাটি জেলার উপজাতীয় নেতাদের কাছে জনসংহতি সমিতির পক্ষে সমীরণ চাক্‌মা কর্তৃক লিখিত ১৭-০৮-৮৮ ইং এর চিঠি।

১৪। ১৯৬১, ১৯৭৪ ও ১৯৮১ ইং সালের আদমশুমারী রিপোর্ট।

১৫। CHITTAGONG HILL TRACTS DISTRICT STATISTICS-1983, BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS.

১৬। ১৯৮২ সালের ৩০শে অক্টোবর পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নেতাদের সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ।

১৭। Referendum order, 1977 (order No.1 of 1977)

১৮। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন; "পার্বত্য চট্টগ্রামঃ সমস্যাও সমাধান", একতা, ১লা মার্চ, ১৯৯১ ইং (১০ই ফেব্রুয়ারী ডাকসু ও গণতান্ত্রিক ফোরাম আয়োজিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির ভাষণ হিসাবে পঠিত)।

১৯। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭২ ইং

২০। Socio-Political History of Bengal by Kamruddin Ahmed

২১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংবিধান- আবদুল মোতালিব।

২২। Pakistan Affairs by Mizanur Rahman Shelly and Khairuzzaman Chowdhury.

২৩। Proceedings of East Pakistan Provincial Assembly, First Session,1962

২৪। Collections From the Correspondence on the Revenue History of Chittagong Hill Tracts (From 1868-1887).

২৫। Karnafully Multipurpose project (1952) by Khaja Azimuddin.

২৬। Agriculture and Horticulture in Chittagong Hill Tracts by B.Grimwood.

www.pathagar.com

২৭। Kaptai Dam and Hydro-Electricity by Prof: M.I. Chowdhury Bangladesh observer, May,27.1974

২৮। দৈনিক সংবাদ, ১৩ই মে ১৯৮৬ইং Bangladesh Times,13th May,1986

২৯। দৈনিক সংবাদ, ১৯শে মে, ১৯৮৭ইং

৩০। Soil and Land use Survey by Forestal Forestry and Engineering International Limited, 1966.

৩১। পূর্বদেশ, ১লা মে ১৯৭৩ইং।

৩১। Morning News, June 17, 1973 দৈনিক ইত্তেফাক ৭ই জুন, এবং ১৭ই জুন, ১৯৭৩ইং এবং পূর্বদেশ, ১৮ই জুন, ১৯৭৩ইং

৩১। দৈনিক স্বাধীনতা, ১লা আগষ্ট, ১৯৭৩ এবং বাংলাদেশ সংবাদ, ১০ই আগষ্ট, ১৯৭৩ইং।

৩২। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৪, বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবতকে জেলার জনগনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকলিপি, ১১ই আগষ্ট ১৯৭৪ইং

৩৩। বাংলার বাণী, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং এবং দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ই আগষ্ট ১৯৭৫ ইং।

৩৪। Chittagong Hill Tracts Development Project Final Field report by AGRAR-UND Hydrotekhnik GMBH(2) ULG-Consultants Limited(3) Halcrow Fox and Associates.

৩৫। Chittagong Hill Tracts Development Board ordinance, 1976 (Ordinance NO. Lxxvii)

৩৬। বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৮-৮৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

৩৭। ১-১-৯০ ইং রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন পার্বত্য অঞ্চল ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি" শীর্ষক প্রচারপত্র।

www.pathagar.com

৩৮। অর্থ-উইং, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার ঋণ গৃহীতাদের নাম, তাহাদের ঋণের পরিমাণ (৩১-১২-৮৮ইং পর্যন্ত) সংক্রান্ত বিবরনী।

৩৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের "১৯৮৫-৮৬ সালে পার্বত্য জেলা সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম" শীর্ষক প্রচারপত্র।

৪০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের "পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ উন্নয়ন তৎপরতা" শীর্ষক প্রচারপত্র।

৪১। বিশেষ পঞ্চ বার্ষিকী সমন্বয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২৯-১১-৯০ইং তারিখের সভার কার্যবিবরনী।

৪২। বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯০-৯১, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।

৪৩। Chittagong Hill Tracts Development Study: socio-Economic Impact of Roads and Economic Appraisals, August,1977.

৪৪। Monthly Progress Report (Report No.1to33) by Snowy Mountain Engineering Corporation, Australia.

৪৫। Assembly Proceedings, East Pakistan Provincial Assembly, Budget Session, 1965-66.

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সদয় নির্দেশক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় ও দফায় অনুষ্ঠিত আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিম্ন বর্ণিত সমঝোতায় উপণীত হইয়াছেনঃ

ক) বিশেষ এলাকা ঃ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন উপজাতীয় অধিবাসীদের সযত্নে লালিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, মর্যাদাবোধ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষন তথা জাতীয় প্রগতি ও উন্নয়নের সার্বিক কর্মকান্ডে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ ও ২৮(৪) ধারার আলোকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ কর্তৃক অধ্যুষিত বিধায় উহাকে বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করতঃ উহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

খ) জেলা পরিষদঃ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন যে পরিষদ গঠন করা হইবে তাহাতে উপজাতীয় অধিবাসীদের প্রাধান্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে উপজাতীয় ও অনুপজাতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা স্থিরকৃত অনুপাতে নির্ধারিত হইবে এবং প্রস্তাবিত জেলা পরিষদে জনসংখ্যা নির্বিশেষে সকল উপজাতীয় প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। সর্বোপরি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। এই পরিষদ মূল আইনের অধীনে অর্পিত বিষয় সমূহে প্রবিধান (Regulation) প্রনয়নকারী ও কার্য্যকর করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখিবে। আলোচনার মাধ্যমে অর্পিত বিষয়সমূহ নির্ধারিত হইবে।

গ) ভূমিস্বত্বঃ

সংরক্ষিত ও রক্ষিত (Reserved and protected) বনাঞ্চল, কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা

www.pathagar.com

বন্দোবস্তকৃত জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এমন জমি/বন ব্যতিত অন্য কোন জমি বা সম্পত্তি জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিত এই জেলার কোন জমি এই জেলার বাহিরে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত সম্মত সিদ্ধান্ত সমূহের সত্বর বাস্তবায়নের লক্ষে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৩৯৫ শতাব্দের ৩১শে ভাদ্র মোতাবেক ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ইং তারিখে ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ,কে, খন্দকার ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এই সমঝোতা স্মারকের দুইটি মূল ভাষ্যে স্বাক্ষর দান করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিঃ

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ,কে, খন্দকার
মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম
ফারুক চৌধুরী
মোহাম্মদ মোহসীন
আলী হায়দার খান
মোহাম্মদ জমির

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দঃ

১. জনাব শান্তিময় দেওয়ান (দল নেতা)
২. জনাব সুবিমল দেওয়ান
৩. জনাব তিলক চন্দ্র চাকমা
৪. ডাঃ এস, এম, চৌধুরী
৫. জনাব ক্যজ চাই মারমা
৬. জনাব অংথোয়াইচিং চৌধুরী
৭. জনাব চারু বিকাশ চাকমা
৮. ডাঃ এ, কে, দেওয়ান
৯. জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা
১০. জনাব গৌতম দেওয়ান
১১. জনাব লাল দৌয়া
১২. জনাব রূপক খীসা
১৩. জনাব লাল এ্যাংলিয়ানা
১৪. জনাব পরিমল তালুকদার
১৫. জনাব মনিস্বপন দেওয়ান

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আজ ৫ই অক্টোবর ৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহঃ

বৈঠকের প্রারম্ভে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ হতে প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব শান্তিময় দেওয়ান জানান যে তাদের দলের নেতা চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের অনুপস্থিতিতে নেতৃবৃন্দ তাঁকে নতুন নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন এবং উপনেতা হিসাবে মনোনীত হয়েছেন ডঃ এস, এম, চৌধুরী।

আলোচনার সূত্রপাত করে জনাব শান্তিময় দেওয়ান জাতীয় কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজিত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সরকারের সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ একটা অসহনীয় অবস্থায় আছে এবং এটা তাদের বিশ্বাস যে বর্তমান প্রচেষ্টায় এর একটা সমাধান নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় প্রত্যুত্তরে রাঙ্গামাটি জেলা দলের নতুন দল নেতাকে অভিনন্দন এবং অন্যান্য সবাইকে ধন্যবাদ জানায়ে সমস্যা সমাধান লক্ষে সরকারের সদিচ্ছা ও বাস্তব পদক্ষেপসমূহের পুনরোক্তি করে বলেন যে, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সমাধান সহজতর হবে।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বলেন যে ১৫ই সেপ্টেম্বর' ৮৮ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত স্বশাসন ব্যবস্থায় জেলা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা এবং বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠি ও অউপজাতীয়দের মধ্যে আসন বন্টন সম্পর্কে তাদের একাধিক প্রস্তাব বৈঠকে আলোচিত হয়। সরকার পক্ষ হতে কাউন্সিল এর আকার ও ভিত্তি সম্পর্কে বলা হয় যেঃ

১) জেলা কাউন্সিলের একজন সদস্য যে কোন স্থান হতে নির্বাচিত হউক না কেন তাকে সে জেলার অধিবাসী হতে হবে।

www.pathagar.com

২) যে কোন ক্ষুদ্র উপজাতীর প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

৩) উপজাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত থাকবে।

৪) চেয়ারম্যান অবশ্যই উপজাতীয় হবে।

৫) প্রত্যেক ভোটার চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যকে ভোট দিতে পারিবেন।

৬) কাউন্সিলে প্রতিনিধির সংখ্যা যুক্তিসংগত হওয়া দরকার।

৭) আসন বন্টনে জনসংখ্যা ও উপজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি।

বিষয়টির উপর বিশদ আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রস্তাবিত জেলা কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে অউপজাতি ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে উপজাতি এবং অউপজাতীয়দের সম্মত আসন নিম্নরুপ হবেঃ

ক)	চেয়ারম্যান –	১
খ)	চাকমা –	১০
গ)	মারমা –	৪
ঘ)	তঞ্চঙ্গা –	২
ঙ)	ত্রিপুরা –	১
চ)	লুসাই –	১
ছ)	পাংখু –	১
জ)	খেয়াং –	১
ঝ)	অউপজাতি –	১০
		৩১

বিষয় বিভক্তিকরন

বিষয় বিভক্তিকরন সম্পর্কে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জেলা কাউন্সিলের অধীনে পূর্ন/আংশিক ভাবে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেনঃ-

১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা

২। প্রাইমারী শিক্ষা

৩। ইউ এস এফ (Unclassed State Forest)

৪। মৎস্য ও পশু পালন

www.pathagar.com

৫। কৃষি
৬। সমবায়
৭। পুলিশ
৮। লাইসেন্স/পারমিট (স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কিত)
৯ উপজাতীয় সামাজিক আইন
১০। জেলার মধ্যে ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কিত
১১। সংস্কৃতি ও খেলাধূলা
১২। বাজার ফান্ড/হাট বাজার

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত আইনের সম্ভাব্য তাৎপর্য্যের উপর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা রাখা হয়। বিষয়সমূহের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ডিসপেনসারী বা ছোট হাসপাতাল কাউন্সিল চালাতে পারেন। প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম এর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ/বদলী/পদোন্নতি ইত্যাদি করা যাবে। মৎস্য ও পশু পালন অর্থাৎ মাছের চাষ বৃদ্ধি, মৎস্য খামার সৃষ্টি, লিজ, সেলামী ইত্যাদি এবং পশুপালনের জন্য দুগ্ধ খামার, হাঁস মুরগীর চাষ ইত্যাদি করা যাইতে পারে। কৃষি, সমবায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচলিত জাতীয় আইনের সাথে সংগতিপূর্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রম গ্রহন করতে পারেন। স্থানীয় পুলিশ সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে একটা পর্যায়ে অর্থাৎ কনষ্টেবল হতে সহকারী সাব ইনস্পেক্টর পর্যন্ত কাউন্সিল নিয়োগ করতে পারবেন। তাদের বেতন প্রদান, বদলী, পদোন্নতি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করতে পারবেন। সাব ইনস্পেক্টর এবং এর উপরি পুলিশ কর্মকর্তা কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের অধীনস্থ হবেন। কিন্তু তাদের নিয়োগ/বদলী জাতীয় সরকারই করবেন।

জেলার মধ্যে স্থানীয় ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে লাইসেন্স/পারমিট জেলা কাউন্সিল দিতে পারবেন। উপজাতীয় সামাজিক আইন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও উন্নয়ন এবং খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য কাউন্সিল কার্যক্রম গ্রহন করতে পারেন। জেলার মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও চাকুরীর সংস্থান এবং শিল্প বিকাশে কাউন্সিল অবদান রাখতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে বর্তমানে প্রচলিত বাজার

www.pathagar.com

ফান্ড প্রশাসনের পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহা কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

বৈঠকে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে মত বিনিময় হয় এবং পরবর্তী বৈঠকে আজকের আলোচনার আলোকে খসড়া আইন প্রনয়ন করা হবে এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ:

১. জনাব শান্তিময় দেওয়ান (দল নেতা)
২. ডাঃ এস, এম, চৌধুরী
৩. জনাব সুবিমল দেওয়ান
৪. জনাব জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা
৫. জনাব লাল এ্যাংলিয়ানা
৬. জনাব অংথোয়াইচিং চৌধুরী
৭. জনাব ক্যজ চাই মারমা
৮. জনাব লাল দৌয়া
৯. জনাব তিলক চন্দ্র চাকমা
১০. জনাব গৌতম দেওয়ান
১১. জনাব মনিস্বপন দেওয়ান
১২. জনাব পরিমল তালুকদার

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির পক্ষে–

মোহাম্মদ জমির
সদস্য সচিব

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দঃ

১। জনাব কামিনী মোহন দেওয়ান (বর্তমানে প্রয়াত)

২। জনাব বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা (বর্তমানে প্রয়াত)

১৯৬২ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণঃ

এই নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন আলাদা আসন বরাদ্ধ করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে চট্টগ্রাম জেলার একটা অংশের সাথে যুক্ত করে একটি আসন বরাদ্ধ করা হয়।

আসন নং		**নির্বাচিত সদস্য**
১। পিই – ১৫০ – চট্টগ্রাম –১০	–	রাজা ত্রিদিব রায় (চাকমা রাজা) (স্বতন্ত্র)

১৯৬২ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন

আসন সংখ্যা (১)		**নির্বাচিত সদস্য**
(চট্টগ্রামের অংশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম)	–	জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী (মুসলিম লীগ)

১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		**নির্বাচিত সদস্য**
১। পিই –১৫০ – চট্টগ্রাম –১০	–	বোমাং রাজা মংশৈ প্রু চৌধুরী (তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর তাহার আসন শূন্য হয়)। (স্বতন্ত্র)
পিই –১৫০ – চট্টগ্রাম –১০	–	রাজা ত্রিদিব রায় (চাকমা রাজা) মংশৈ প্রু চৌধুরী শূন্য আসনে উপ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। (স্বতন্ত্র)

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন

আসন সংখ্যা (১)		নির্বাচিত সদস্য
১। (চট্টগ্রামের অংশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম)	–	জনাব গিয়াসুদ্দীন আহম্মদ (মুসলিম লীগ)

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন

আসন সংখ্যা (১)		নির্বাচিত সদস্য
১। (শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা দ্বারা গঠিত)	–	রাজা ত্রিদিব রায় (চাকমা রাজা) (স্বতন্ত্র)

১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		নির্বাচিত সদস্য
১। পিই –২৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম –১	–	জনাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা (স্বতন্ত্র)
২। পিই –৩০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম –২	–	জনাব অংশৈ প্রু চৌধুরী (স্বতন্ত্র)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		নির্বাচিত সদস্য
১। ২৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম –১	–	জনাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা (স্বতন্ত্র)
২। ৩০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম –২	–	জনাব চাই থোয়াই রোয়াজা (স্বতন্ত্র)

১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		নির্বাচিত সদস্য
১। ২৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম –১	–	জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমা (জাসদ)
২। ৩০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম –২	–	জনাব অংশৈ প্রু চৌধুরী (স্বতন্ত্র পরে বি.এন.পি.)

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		নির্বাচিত সদস্য
১। ২৯৮ খাগড়াছড়ি –১	–	জনাব আলীম উল্লাহ (জাতীয় পার্টি)
২। ২৯৯ রাঙ্গামাটি –১	–	জনাব বিনয় কুমার দেওয়ান (জাতীয় পার্টি)
৩। ৩০০ বান্দরবান –১	–	জনাব মংশৈ প্রু চৌধুরী (জাতীয় পার্টি)

১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		নির্বাচিত সদস্য
১। ২৯৮ খাগড়াছড়ি –১	–	জনাব আলীম উল্লাহ (জাতীয় পার্টি)
২। ২৯৯ রাঙ্গামাটি –১	–	জনাব বিনয় কুমার দেওয়ান (জাতীয় পার্টি)
৩। ৩০০ বান্দরবান –১	–	জনাব মংশৈ প্রু চৌধুরী (জাতীয় পার্টি)

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আসন সংখ্যা ও নম্বর		নির্বাচিত সদস্য
১। ২৯৮ খাগড়াছড়ি –১	–	জনাব কল্পরঞ্জন চাকমা
২। ২৯৯ রাঙ্গামাটি –১	–	জনাব দীপংকর তালুকদার
৩। ৩০০ বান্দরবান –১	–	জনাব বীর বাহাদুর।

www.pathagar.com

১৫ ফেব্রুয়ারী,১৯৭২ ইং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশ করার জন্য প্রণীত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের দাবীনামা

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষনের জন্য ১৯০০ সালের "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির" অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩। উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না করা হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নিকট সরকার প্রদত্ত প্রস্তাবের রূপরেখা

১। সংবিধানের ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাকে বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করন।

২। সংবিধানের ৯ ও ২৮ ধারা আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন পৃথক পৃথক জেলা পরিষদ গঠন।

৩। বিষয় বিভক্তি (Division of Subjects) স্থিরকরণ।

৪। সংবিধানের ৬৫ ধারার আলোকে জেলা পরিষদ সমূহকে মূল আইনের অধীন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে উপ-আইন, আদেশ, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন, জারী এবং কার্য্যকরী করার ক্ষমতা অর্পন।

৫। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন, জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব এলাকার জন্য আপত্তিকর বিবেচিত হলে সংসদে পুনর্বিবেচনার দাবী সরকারকে অবগত করার জন্য আইনগত ক্ষমতা অর্পণ।

৬। জেলা ও উপজাতীয় সার্কেলের এলাকা একত্রিকরনার্থে সীমানা পুনঃনির্ধারণ।

৭। জেলা প্রধান এবং উপজাতীয় প্রধানের (Circle Chief) সমন্বিত অবস্থান নির্ণয়ন।

৮। প্রতি সার্কেলে পুলিশ বাহিনী গঠন।

৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের যথাযথ সংশোধন, বাস্তবায়ন অথবা বাতিল করন।

[বিঃদ্রঃ উপরোক্ত রূপরেখা নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হলে যে আইনের অধীন স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে সেই আইনকে সংরক্ষণ (Protect) করার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে]।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—ছ

তিন পার্বত্য জেলায় সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনা এবং এসকল ঘটনার শিকার হয়ে নিহত, আহত এবং অপহৃত ব্যক্তিগণের খতিয়ান

সরকারী সূত্র বিশেষতঃ নিরাপত্তাবাহিনীর বিভিন্ন গোয়েন্দা শাখা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে শান্তিবাহিনী নামে সমধিক পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন ১৯৭৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৯২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান জেলায় মোট ২১০ টি সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের গ্রামে, বিভিন্ন সরকারী সংস্থার নির্মান কাজে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ, বাঁশ আহরণে নিযুক্ত শ্রমিক, যাত্রীবাহী লঞ্চ, দেশী নৌকা ইত্যাদির উপর সশস্ত্র হামলা এসব সন্ত্রাসী ঘটনার অংশ। এছাড়া নিরাপত্তাবাহিনীর ছাউনি এবং নিরাপত্তাবাহিনীর টহলদানরত সদস্যদের উপর হামলা, বাঙ্গালীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, যাত্রীবাহী লঞ্চে এবং বাসে বোমা পুঁতে রেখে বিস্ফোরণ ঘটানো ইত্যাদি ঘটনার জন্যও শান্তিবাহিনীই দায়ী।

শান্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত এসব সন্ত্রাসী ঘটনার শিকার হয়ে যেসব লোক নিহত, আহত বা অপহৃত হয়ে পরবর্তীকালে নিহত হয়েছে তাদের সম্পূর্ন হিসাব সরকারী সূত্রে পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত একটা তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট পাওয়া গেছে (সাপ্তাহিক বনভূমি, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৯২ ইং। মানবাধিকার কমিশনের উক্ত প্রতিবেদন মূলতঃ সরকারী তথ্যের উপর ভিত্তি করে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রনীত হয়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১৬ বছর সময়ে শান্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহত, আহত এবং অপহৃত ব্যক্তিদের হিসাব উক্ত রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। আমাদের জানা মতে, মানবাধিকার কমিশনের উল্লিখিত রিপোর্টও সম্পূর্ন নয়। সামাজিক শত্রু, সরকারী দালাল এবং এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করে শান্তিবাহিনী যে সকল উপজাতীয় লোককে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করেছে তাদের কোন হিসাব এই রিপোর্টে আসেনি। এমনকি এসব নিহত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের কোন হিসাবও সরকারীভাবে সংগ্রহ বা সংরক্ষন করা হয়নি। নিহত উপজাতীয়দের সংখ্যা কমিশনের রিপোর্টে অত্যন্ত কম দেখান হয়েছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে উল্লিখিত হিসাব ব্যতিত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য এবং সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ণ তথ্য বর্তমানে আমাদের হাতে নেই। মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টকেই আপাততঃ নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্র হিসাবে ধরে নিয়ে তা নীচে তুলে ধরা হল(প্রদত্ত ছক অনুসারে)ঃ-

সন	হত্যা		আহত		অপহরণ ও গুম		অগ্নিসংযোগ
	বাঙ্গালী	উপজাতি	বাঙ্গালী	উপজাতি	বাঙ্গালী	উপজাতি	
১৯৭৬	১০	-	৯০	-	১০	৮	১০টি
১০৭৭	২০	-	১০০	-	২০	১৫	২৫টি
১৯৭৮	২৫	-	৮০	-	২৫	২০	২০টি
১৯৭৯	৩০	-	৭৫	-	২৭	২১	২১টি
১৯৮০	১৭৫	২	২৫	১৫	১৮০	২৮	৩৮টি
১৯৮১	১৫০	-	৭৯	১২	৩৫	৩২	৪০টি
১৯৮২	১১০	৪	৮৫	১৭	৭৫	৪০	২৫টি
১৯৮৩	২২০	-	১০০	২	১২৫	৩৫	২০টি
১৯৮৪	২০০০	-	২২৫	৮	২৭৭	৩৭	৮০টি
১৯৮৫	২৫০	১০	১১২	৭	৩১২	২৫	৭৫টি
১৯৮৬	৭০০	-	৮০	২	১০৫	৩২	২২টি
১৯৮৭	৮১৬	-	১০০	৫	৪৩	৪০	১৬টি
১৯৮৮	৯৫০	৫	২১০	৭	১৮৫	৫১	৪০টি
১৯৮৯	১০০০	২	৫৫০	৭৫	৭৬	৩৫	৩০টি
১৯৯০	৫০০	৪	২০৭	১২	৭৫	৩৯	৫০টি
১৯৯১	২৫০	১২	১৭৮	১৪	২২০	২৫	২৯
১৯৯২	১১৬	১৬	২৮১	২১	১০৭	৯	৩৮টি
মোট	**৭৩২২**	**৫৫**	**২৪৭৭**	**১৯৭**	**১৮৯৭**	**৪৯২**	**৫৭৯টি**

www.pathagar.com

পার্বত্য অঞ্চল

(রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা)

www.pathagar.com